স্রোতের দীপ

গোপাল হালদার

ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম্. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

সাড়ে তিন টাকা মাত্র

৪৬।১, বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা কালী-গঙ্গা প্রেস হইতে
কে, কে, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্বর্গীয় অগ্রজ সুরেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের

উদ্দেশ্যে

নিবেদন

এ গ্রন্থের ঘটনাকাল মোটামুটি ভাবে ১৯২৪ থেকে ১৯২৭এর মধ্যে। এর পরবর্তীকাল, ১৯২৭ থেকে ১৯৩০-১, পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে 'উজান গঙ্গা' নামে (যন্ত্রস্থ) গ্রন্থে, এর পূর্ববর্তী কাল যেমন বর্ণিত হয়েছে 'ভাঙন' নামে পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাঙালী ভদ্রলোকের জীবনের এই সংকটমুখী কালটির একটি চিত্র এই সব গ্রন্থে আমি আঁকবার চেষ্টা করেছি। আজ যা স্পষ্ট, পনের বৎসর পূর্বে ১৯৩৪-৩৫এ এগ্রন্থের রচনাকালে, বাঙালীর ভদ্রলোকের জীবন-যাত্রায় সেই ভাঙনের আভাস তখনই দেখা দিয়েছিল। এ গ্রন্থে আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল তখনকার মধ্যবিত্ত পিতামাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাঁদের কালকে বোঝা, উপস্থিত করা। কারণ, নবীনদের দৃষ্টিভঙ্গি তো সুপরিচিত, তা বুঝতে ততটা বেগ পেতে হয় না; তা নানা হাতে নানা ভাবে অঙ্কিত হচ্ছে। কিন্তু প্রবীণরা তখনই ছিলেন অস্তোন্মুখ; আজ তাঁরা অস্তমিত। কে মনে রাখে আর তাঁদের কথা?

সেদিনের সেই অস্তগামী দিনের কথা যদি এগ্রন্থের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে তা হলেই আমার প্রয়াস সার্থক হয়েছে, বুঝব।

৫ই জুন, ১৯৫০ লেখক

লেখকের অন্যান্য বই

কথা-সাহিত্য : উজান-গঙ্গা (যন্ত্রস্থ); ভাঙন ; একদা, অন্যদিন, পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী, তেরশ' পঞ্চাশ ; ধূলিকণা।

প্রবন্ধ-সাহিত্য : সংস্কৃতির রূপান্তর, বাজেলেখা, এ যুগের যুদ্ধ।

স্রোতের দীপ

১

অমর বিদেশে কাজ করে, ইন্দিরাও গেল কলিকাতায় পড়িতে,—কাদম্বিনীর কেমন আর ভালো লাগিতেছিল না। চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়িতে এবার তাহার নিজেকে মনে হইল একা।

একটা অস্বস্তিও কাদম্বিনীর মনে জাগিতেছিল। ছোটকর্ত্তা জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী মুখ ফুটিয়া আপত্তি জানান নাই, কিন্তু সর্বান্তঃকরণে সম্মতি তিনি দিয়াছেন কি? "অমর তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর লেখাপড়া শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছে, ইহাতে বাধা কি?" মধুখালি হইতে জ্ঞানশঙ্কর জানাইয়াছেন তাঁহার পরম পূজনীয়া বধূঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী দেবীকে। আর সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছেন, "অবশ্য চিত্রিসারের চৌধুরীদের ইতিহাসে শিক্ষার জন্য কন্যাকে কলিকাতায় প্রেরণ করা নূতন কার্য। গ্রামের সমাজেও সম্ভবত এই জন্য কিছু কথা উঠিতে পারে।" তাহার পর জ্ঞানশঙ্কর অন্যপ্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন, "নীলমাধবের মন্দিরের ফাটল দিয়া বর্ষায় জল পড়ে। মন্দিরের হাতে-লেখা পুঁথিপত্রেরও কিছু কিছু ক্ষতি হইতেছে শুনিয়া অতিশয় বেদনা বোধ করিলাম। মন্দিরের সংস্কার প্রয়োজন উহার ব্যবস্থা করিবেন।

ব্যয় আমি নিজেই বহন করিতে পারিব।" ইত্যাদি। ইন্দিরা জ্ঞান চৌধুরীর নিকট থাকিয়াই মধুখালিতে পড়িয়াছে; পড়াশুনায় আগ্রহ ও শিষ্ট সহজ আচরণের জন্য তাহাকে কাকাবাবু ও কাকীমা যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কই?—কাদাম্বনী ভাবিতেছিলেন—ইন্দিরার প্রস্তাবে তো জ্ঞান চৌধুরী বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। অবশ্য বাধাও দেন নাই।

ইন্দিরার পিতা বিভূতিশঙ্কর থাকিলে আজ কি বলিতেন? কিংবা কাদম্বিনীর শ্বাশুড়ী মহেশ্বরী?—ঐখানে, ঐ শঙ্কর দীঘির পাড়ে যাহার দেহাবশেষের উপরে মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র বিভূতিশঙ্কর। ফাটল ধরিতেছে সে মঠেও, ফাটল ধরিয়াছে যেমন চৌধুরী বাড়ির এই নীলমাধবের মন্দিরে। কিন্তু কাদম্বিনী জানেন,—মহেশ্বরী পরলোকে গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না তাঁহার বিভূতিশঙ্করের পুত্র ও কন্যার সম্বন্ধে, জ্ঞানশঙ্করের সন্তান-সন্ততির বিষয়ে। নীলমাধবের এই হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি সনাতন চৌধুরীর বংশধরদের ইষ্টানিষ্ট, ন্যায়ান্যায় ধর্মাধর্ম কি উপেক্ষা করিতে পারিবে? বেদনায় কালো হইয়া উঠিবে না?···কাদম্বিনী যেন ভাবিয়া পান না—কি করিতেছেন তিনি—চৌধুরী-দের গৃহকর্ত্রী তিনি, চৌধুরী ভদ্রাসন-রক্ষার দায়িত্বও আজ তাঁহারই। এই গৃহের শুভাশুভের জন্য মহেশ্বরীর নিকটে, শ্বশুরকুলের বহু বহু পূর্বগামিনী গৃহকর্ত্রীদের নিকটে কাদম্বিনীই তো দায়ী।

অনেক দিনের আভিজাত্য চিত্রিশারের চৌধুরীদের। গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শঙ্কর চৌধুরী। কিন্তু তাহার আমলের চিহ্ন আর কি আছে? শঙ্কর দীঘি হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে—কাদম্বিনী তাহা

দেখিয়াছেন। এখন কচুরী পানায় তাহা ঢাকা। অন্য সাক্ষী সিংহবাহিনীর' বিগ্রহ। তাঁহারও পুরাতন মন্দির কবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাদম্বিনীও তাহা দেখেন নাই। সেবায়েৎ ভট্টচাজ্জিরা এখন তাঁহার কর্তা। কিন্তু চৌধুরীদের ব্রহ্মোত্তর ভোগী ভট্টচাজ্জিরা এখনও দেবীর পূজায় সর্বাগ্রে চৌধুরীদের নামে পূজা না দিয়া পারেন না। অন্য ভূ-সম্পত্তি চৌধুরীদের যাহা ছিল দশশালা বন্দোবস্তের পরে সূর্যাস্তের নিলামেই তাহা শেষ হইতেছিল; নিঃশেষ হইল পদ্মার ভাঙনে আর কালচিতার সেনেদের সঙ্গে এই অঞ্চলের আধিপত্য লইয়া দাঙ্গায় খুনে। সেনেরাই সেই আধিপত্য লাভ করিয়াছে শেষ পর্যন্ত। "পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর শ্রীল শ্রীযুক্ত হেভিফুট সাহেব ম্যাজিষ্ট্রব কলেক্‌টার বাহাদুর" ও "মাতাঠাকুরাণী শ্রীল শ্রীযুক্তা হেভিফুট মেম সাহেব বাহাদুর" দ্বয় তাঁহাদের পুত্র গিরিশ সেনের বংশধরদিগকে মহারাণীব রাজসরকারে রাজকার্য্যে বহাল না করিয়া বিলাতে ফিবিতে পারিলেন না। তাই সেন বংশীয়রা দারোগা ডিপুটি সবডিপুটিরূপে ভাগ্যার্জ্জন কবিলেন, দেশ-বিদেশে তালুক-মুলুক ক্রয় করিলেন, বিদেশে বাড়িঘর করিয়া বাস করিতে আরম্ভ কবিলেন, আবার জমি-জমা ক্রয় করিলেন, কালচিতায় দালান চকমিলান তুলিলেন, চণ্ডীমণ্ডপ নূতন করিয়া নির্মাণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রিসার কালচিতার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সমাজও তাঁহাদের সামাজিক প্রাধান্য মানিয়া লইতে বিলম্ব করিল না। রাজানুগ্রহ যে ভগবদনুগ্রহেরই নামান্তর ইহা কি তাহারা জানে না?

জীবিকা সন্ধানে পরে একদিন চৌধুরীরাও অবশ্য বিদেশে বাহির হইল—ভূ-সম্পর্ক-হীন আভিজাত্য আঁকড়াইয়া তো আর প্রাণ রক্ষা চলে না। রাজানুগ্রহও চাকরির সৌভাগ্য বিশেষ না জুটিলেও মোটামুটি অর্থার্জনও তাহারা করিল। সেই সূত্রে আবার নিজেদের ভদ্রাসনে

সুপ্রতিষ্ঠিত ও হইতেছিল—কিন্তু সামাজিক প্রাধান্য আর তাহারা ফিরিয়া পায় নাই। কেমন একটা অদ্ভুত ঝোঁক এক-একবার তাহাদের দেশ ছাড়া, গাঁ ছাড়া সমাজ ছাড়া করিয়া লইয়া যাইতে থাকে; কেহ ছোটে পশ্চিমে কেহ পূর্বে, কেহ উত্তরে কেহ দক্ষিণে। রাজীব চৌধুরী পৈতা ছিঁড়িয়া ব্রাহ্ম হইয়া যায়। রাঘব চৌধুরী তাহাকে গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা করে। এমনি ইহাদের কাণ্ড। বিভূতিশঙ্কর চৌধুরী পর্যন্ত কলেজ ছাড়িয়া নিখোঁজ হইয়া গিয়াছিলেন। কাদম্বিনী জানেন—সে তাঁহার প্রথমা পত্নীর শোকে নয়, বরং বিদেশের জীবনের বিচিত্র আকর্ষণে। ফিরিয়া আসিয়া তাই আবার তিনি সংসার করিলেন, মধুখালিতে ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আসিলেন, শেষে চিত্রিসারের চৌধুরী হইয়াও হইলেন ব্যবসায়ী ঠিকাদার;—সেদিনে উহাই কি ছিল কম সাহসের কথা? কিন্তু ব্যবসায়েই কি তিনি স্থির হইতে পারিয়াছিলেন? কখনো স্বদেশী আন্দোলনে কখনো শ্রীরামকৃষ্ণের নামে আবার তিনি মাতিয়া উঠিতেন। ব্যবসাপত্রও আর তখন মনে থাকিত না;—হাজার হউক, তিনি তো জাত ব্যবসায়ী নহেন; চিত্রিসারের চৌধুরী। তাই তিনি যেখানে সেখানেই প্রধান। আপনার সহজ অমায়িকতার ও সামাজিকতার বশে স্বদেশে বিদেশে দশজনকে খাওইয়া পরাইয়া বিভূতি শঙ্কর ভাগ্যবান লোকের মত হঠাৎ একদিন সংসারের মায়া কাটাইয়া গেলেন। তখন অমর বালক, ইন্দি' শিশু, আর জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী ওকালতিতে পশার জমাইয়া বসিতেছেন। কাদম্বিনী চিত্রিসারের গৃহভার গ্রহণ করিলেন, আর জ্ঞান চৌধুরী মধুখালিতে পশার লইয়া ব্যস্ত। সেখানে তাঁহার প্রচুর প্রতিষ্ঠা। তথাপি তাঁহার নিকটও চৌধুরীদের নাম ও চিত্রিসারের ভদ্রাসন একটা বড় গর্ব আর বড় স্বপ্ন। কাদম্বিনী জানেন, উহার ভবিষ্যৎ চিন্তায় জ্ঞান চৌধুরী এখন একটু উদ্বিগ্নও হইয়া উঠিয়াছেন—সুরেশ্বর অতুল চিত্রিসারের

সম্পর্ক প্রায় ত্যাগ করিয়াছে; অমর অশোকও চৌধুরীদের ঐতিহ্যে আভিজাত্যে কোনো আস্থা রাখে না।

অমর কাকার সহিত তর্ক করিত—চৌধুরীদের এই আভিজাত্যটা আসলে কি? দু'দশজন লোক লইয়া এথানে ওথানে ডাকাতি করা, দু'একজন গুরু পুরোহিতকে এক আধটাকা প্রণামী দান এবং এক আধটা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।

জ্ঞান চৌধুরী হাসিতেন। এসব সত্য। কিন্তু আরও বড় সত্য তাঁহাদের আভিজাত্য। তাহা কি?—ধর্মবোধ, মর্যাদাবোধ, তেজস্বিতা।

অমর ইহা মানিবে কেন?—রিনেইসেন্সের বার্তা লইয়া ইউরোপের মানুষ দেশ-বিদেশে ছুটিয়াছে, গ্যালিলিও ও বেকন হার্ভে বৈজ্ঞানিক যুগের পত্তন করিতেছেন। আর সমস্তটা সময় বসিয়া এখানকার টোলে আমাদের পণ্ডিতেরা তখন করিতেছেন 'তোট-তোট-তোটয়।' উহারা চীন জাপান ভারতে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া যন্ত্রশিল্পের যুগারম্ভ করিতেছে, আর আমাদের চৌধুরী কর্তারা তখন মনসা তলায় বসিয়া শুনিতেছেন ভাসান গান, নাটমন্দিরে বসিয়া শুনিতেছেন কথকতা। নিতান্ত গ্রাম্য মানুষের গ্রাম্য সভ্যতা আমাদের। পূর্ব-বাঙলায় তাহার উপকরণ দৈন্য ছিল আরও সুস্পষ্ট, প্রায় প্রিমিটিভ্।

জ্ঞান চৌধুরী হাসিতে চেষ্টা করেন। অমর সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক, উপকরণ দিয়াই ইহারা সভ্যতা বিচার করে। তাঁহারাও এক দিন এমনি বিজ্ঞান বলিতে অজ্ঞান হইতেন। তাঁহারাও মাতিয়াছিলেন মিল বেন্থাম লইয়া ত্রিশ বৎসর পূর্বে। কিন্তু তাঁহার পুত্র অশোক মাতিয়া গিয়াছে পলিটিকসের নেশায়, 'এক বৎসরে স্বরাজের' মন্ত্রেও সে বিশ্বাস করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সভ্যতায় সে বিশ্বাসী; কিন্তু তাই বলিয়া এই 'আভিজাত্যটা' অশোক মানিবে কেন?—দেশ চলিয়া গেল ইংরেজের

পায়ের তলায়, আর এখানে বসিয়া সনাতন চৌধুরী তখন করিতেছেন ভাগবতের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের মহাত্ম্য রচনা। চোখের উপর দিয়া সিপাহী বিদ্রোহ গেল, আর আমাদের অভিজাতরা তখন করিতেছেন সেনেদের মত' গোলামী, নয় রাঘব চৌধুরীর মত' ভুয়া তালুকদারী! সাহসটা ছিল কোথায় ইহাদের? কোথায় ছিল মর্য্যাদাবোধ?

কাদম্বিনী ইহাদের কথা শুনিয়া বুঝিতেন না। এমনিতর দৃষ্টি ও এমনিতর উৎসাহ তিনিও দেখিয়াছেন তাঁহার যৌবনে জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর। তাঁহার অপেক্ষা বেশি বিদ্যাবুদ্ধি, বেশি পাণ্ডিত্য-মহত্ব কি ইহাদের কাহারও হইবে! ইহারা তর্ক করিতেই ভালোবাসে, কিন্তু জ্ঞানশঙ্কর জানেন সংযম নীতি সদাচারের মূল্য। আর অমন হাসিয়া গল্প করিয়া স্বচ্ছন্দ পরিহাসে সকলকে স্নেহ প্রীতিতে অভিষিক্ত করিয়া দিতে পারিবে কি অমর বা অশোক? তাই জ্ঞান চৌধুরী আর উৎসাহ বোধ করেন না ইহাদের নূতন কথায়,—তাহা কাদম্বিনীও জানেন, কাদম্বিনীও বোঝেন।

ইন্দিরার কলিকাতায় স্কুলে-কলেজে পড়ার প্রস্তাবে কোন দিনই জ্ঞানশঙ্কর স্পষ্ট করিয়া কোন কথা প্রকাশ করেন নাই।

সেবার পূজার সময়ে অমর জ্ঞানশঙ্করকে বলিয়াছিল: গ্রামে বাড়ি বসে থেকে ইন্দি কি করবে? আসছে বৎসর তা হলে ওকে স্কুলে ভরতি করিয়ে দিই।

জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন, বাড়িতে বউঠান যে একা থাকবেন। তিনি রাজী হলে ইন্দি' চলুক আমার সঙ্গে মধুখালিতে।

অমর বুঝিল—কাদম্বিনীও বুঝিলেন—জ্ঞান আসল কথাটার উত্তর

দিলেন না। কিন্তু অমর তাঁহাকে ছাড়িল না। বলিল: সেখানে আর পড়বে কি? মেয়েদের হাইস্কুল তো নেই সেখানে।

আমরা নতুন দুটো ক্লাশ খুলছি—একজন বি·এ পাশ শিক্ষয়িত্রী এসেছেন। তিনিই অমিতাকেও বাড়ীতে পড়ান, ইন্দি'কেও পড়াবেন এখন।

অমিতা জ্ঞান চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা—ইন্দিরার বছর দুই তিনের ছোট।

কিন্তু অমব বলিল: বাড়িতে কিছু পড়া হয় না। স্কুলেই পড়তে হবে, আব কলকাতার স্কুলে ছাডা পড়া হয় কোথায়?—একটু গান বাজনা, ভদ্রতা সভ্যতা, এ সব না শিখলে কি শিখবে?

জ্ঞান হাসিলেন: কলকাতা ছাডা বুঝি কোথাও সভ্যতা ভদ্রতা নাই?—তিনি জানেন; সে সহবে ভদ্রতা তো শুধু পোষাকে আর কথায় গিয়া ঠেকিয়াছে। উহার মধ্যে মনুষ্যত্বেব বালাই না থাকিলেও চলে। কিন্তু আমাদের এই বাঙালীর ভদ্রসমাজ অত ফাঁকা নয়। সেই ভদ্র সমাজ টিকিয়া আছে এখনো ছোট ছোট শহরে, আর চিরদিনের গ্রামে—ভদ্রাসন আঁকডাইয়া। তাহা হারাইলে আর আমাদের থাকিবে কি? সেই সুস্থিব পারিপার্শ্বিকেব মধ্যেই আমাদের শিক্ষা দীক্ষারও নূতন আয়োজন কবিতে হইবে। তাহাই হইতেছে। আজকাল ছোট ছোট শহরেও মেয়েদেব উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মধুখালিতেও তাঁহারা আগামী বৎসর খুলিবেন নূতন দুইটি উচ্চ ক্লাশ।

কথাটা তখনো শেষ হয় নাই, কিছু স্থির হয় নাই। পূর্বেও অমর এইরূপ আলোচনা করিয়াছে। ইন্দি' স্কুলে পড়িবে, কলেজে পড়িবে; শুনিতে শুনিতে ইন্দিরাও তাহাই বুঝিয়াছে। পড়াশুনায় তাহার আগ্রহ প্রবল: অনেক সে পড়িবে ইহাই সে জানে। কাদম্বিনীও কথাটা

একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই। সেই তাঁহার প্রথমা কন্যা পার্বতীর তিনি অত করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, তারপর সন্তান জন্মকালে পার্বতীর মৃত্যু ঘটিল। তাহা বৎসর দশ পূর্বের কথা। সকলে পার্বতীকে ভুলিয়াছে, কিন্তু কাদম্বিনী ভুলিবেন কিরূপে? তাই ইন্দিরার বিবাহ সম্ভাবনার পরিবর্তে ইন্দিরার পড়াশুনার কথা তাঁহার নিকট বেশি আরামদায়ক। আর অমরের মুখে মুখে শুনিতে শুনিতে সেই কারণেই তিনিও ভাবিতে অভ্যস্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন—ইন্দিরা স্কুলে পড়িবে, কলেজে পড়িবে, শিক্ষিতা হইবে। পোষাকে পরিচ্ছদে, কথায় আচরণে সপ্রতিভা সেই ইন্দিরার কল্পনায় তিনি গোপনে গোপনে এক এক সময়ে পুলকিতাও হইয়া উঠিতেন। আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে ইন্দিরার বিবাহের বিষয়ে কথা উঠিলে কাদম্বিনীও তাই বলিতে দ্বিধা করিতেন না:

না, ইন্দিরার এখনো বিয়ে দোব না। ইন্দি' পড়াশুনা করতে চায় এখনো, অমরের ইচ্ছা ওকে পড়াবে।

কথাটা অনেকেই শুনিয়াছেন। পাড়ার মেয়েরা 'নতুনদির' কাছে আসিয়া জুটিত, তিনি না হইলে তাহাদের চলে না। কিন্তু তবু সেকালের কোন গৃহিনী বলিত: তা মেয়ে ছেলে, কতটা আর পড়বে, নতুন বউ?'

কাদম্বিনী বলিতেন, পড়াশুনার আবার সীমা আছে নাকি?

সে কথা ঠিক। কিন্তু বিদ্যা দিয়ে কি হবে মেয়ের?

বিদ্যা না থাকলেই কি মেয়ের কিছু বেশি লাভ হয়?

প্রতিবেশিনীরা বলিত, সে যার যেমন অদৃষ্ট! কিন্তু পড়ে কি হবে। ঘর সংসার যখন করবেই।

ঘর-সংসার ছেলেও করে, মেয়েও করে। মেয়ে তো আর একা ঘর-সংসার করে না। তা বলে মেয়েরা দু' অক্ষর লেখাপড়া শিখলেই ঘর সংসার করতে পারবে না?

কাদম্বিনী দৃষ্টান্ত দিতে পারিবেন। মধুখালিতে সেই শিক্ষয়িত্রী মেয়েটিকে সেবারও তিনি দেখিয়াছেন—মালিনী শান্ত, সভ্য মেয়ে। অমিতা ইন্দিরাকে সে পড়াইত। বিধবা মা ও বালক ছোট ভাইএর ভার লইয়া নিজেও পড়িতে চেষ্টা করিত আই-এ, না, বি-এ। এমন আরও দুই এক জনকেও কাদম্বিনী দেখিয়াছেন—তিনি শহরে থাকিতেন, —তাহাদের তুলনায় কি সংসারের কাজে বেশি নিপুণা ভট্টচাজ্জি বাড়ির কোন মেয়ে কিংবা জ্ঞানের প্রথমা কন্যা সরযূ? সংসারের প্রতি বেশি মমতাসম্পন্না কি চৌধুরী বাড়ীর এই পর্যায়ের বড় বৌ সুরেশ্বরের স্ত্রী যামিনী কিংবা অতুলের স্ত্রী?

তর্ক স্থলে অবশ্য কাদম্বিনীর জয় ছিল অনিবার্য: তিনি বলিতেন: দেখছ তো একালের ছেলেদের ঝোঁক। বিয়ের কথা উঠলেই বলে—ইংরেজি জানা বউ চাই।

কথাটা কঠিন সত্য—বিবাহযোগ্য পুত্রকন্যার পিতামাতাদের পক্ষে, মর্মন্তুদ সত্য তাহাদের বিবাহিতা ভগ্নী ভ্রাতৃবধূদের পক্ষেও। তাহারাই কি লেখাপড়া কম জানে? না, কম বুদ্ধি ছিল তাহাদের? তবু ইতিমধ্যেই কিনা দেবর ভ্রাতাদের চক্ষে তাহারা 'অশিক্ষিতা' বলিয়া গণ্য হইতেছে। তাহাদের দিন কি গিয়াছে—ইতিমধ্যেই গিয়াছে?

কেহই কাদম্বিনীর কথায় তর্কে বেশি আশ্চর্য হইত না। কাদম্বিনী শহরের হাব-ভাব ছাড়িলেও কাজকর্মে কথাবার্তায় নিপুণা। নিজে শিক্ষিতা বলিয়া অভিমান না করিলেও সকলেই আপনা হইতে বুঝিয়াছে —নতুন দি' জানেন-বুঝেন। বাড়িতেও অমর তাঁহার জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে বাঙলা কাগজের ব্যবস্থা করিয়াছে, মাসে মাসে দুই একখানা গল্পের কাগজও কাদম্বিনীর আসে। আবার কাদম্বিনী সেই অশোকের স্বরাজ আন্দোলনের সময় হইতে চৌধুরীদের নাট-মন্দিরে মাঝে মাঝে গ্রামের মেয়েদের লইয়া

বলেন—'পাঠশালা' চালাইবেন। তাঁহার এই সব নূতন কথা শুধু 'শিক্ষার অহঙ্কার' নয়। তবে দেখা যাইবে—কাজের বেলায় কে কি হয়, কি পড়ে। আসল কথা, একটি ভালো পাত্রের অপেক্ষাতেই কাদম্বিনীও হয়ত বসিয়া আছেন। না হইলে চৌধুরীদের কোন মেয়েটার বিবাহ হয় নাই? জ্ঞান চৌধুরীর মেয়ে সরযুর বিবাহ হইয়াছিল দশ বৎসরে—বাবুর হাটের গাঙ্গুলীদের বাড়ি। কমলারও বিবাহ হইয়াছে—সেও তো কম তুখোর মেয়ে ছিল না,—কবিরাজ চক্রবর্ত্তীর ছেলে মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তার হইয়াছে।

এইরূপই বুঝিয়াছিলেন গ্রামের মহেশ মাষ্টারও। দশটাকা বেতনে এই কয় মাস ইন্দিরা তাঁহার নিকট পড়িতেছিল, মাহিয়ানা বাকীও থাকে না। তিমি অমরকে একবার বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন: স্কুলে কলেজে কী পড়া হয় তা-তো জানো তুমি। কিছু হলে, বড় লোকের গাধা পিটে আমরা মাষ্টাররাই সেখানে ঘোড়া করতে পারতাম।

অমর কিন্তু শুনবে না। বলিল: বরং মানুষ পিটিয়ে গাধা করতে পারি বলেই তো আমরা মাষ্টার। তবে কি জানেন? স্কুলে দশটা ছেলের সঙ্গে মিশে ছেলেগুলো মারামারি খেলাধুলো করে তবু মানুষ হয়ে যায়।

তাই মহেশ মাষ্টার কাদম্বিনীকেই শেষ কথা শুনাইলেন: আপনাদের পাঁঠা আপনারা ল্যাজ দিয়ে কাটুন। কিন্তু কাজটা কি ভালো হচ্ছে? ভেবে দেখবেন। অমর সমাজও জানে না, গ্রামেও থাকে না, সে বোঝে কি? কিন্তু আপনি হলেন বাড়ির কর্ত্রী। বিদেশে রাজীব চৌধুরীর মত শেষ পর্য্যন্ত মেয়ে একটা কিছু করে বসলে আপনাকেই তো লোকে দুষবে।

ভয় না পাইয়া অমর উৎসাহিত হয়। রাজীব চৌধুরী পুরুষ সিংহ ছিলেন—ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

চরিত্র-বলে উদ্যোগ-শক্তিতে যেখানে গিয়াছেন সেখানেই নাম রাখিয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহার নামে চৌধুরীরা গর্বই বোধ করেন। কাদম্বিনীও ভয় পাইলেন না।

ইন্দিরা পড়িতে চলিয়া গেল।

এতদিন অমর ছিল, গত কয় মাস ইন্দিরাও বাড়ি ছিল; এইবার যেন, কাদম্বিনীর কাজ নাই। অথচ কাজ কি কম? সেই বিগ্রহের ভোগ পূজা, ঘর দুয়ার, পাঠশালা; সেই পাড়া প্রতিবেশীদের কাজকর্ম্ম,—সকলের কাজেই নতুন দি'কে চাই,—সব কাজই তাঁহার আছে। কিন্তু তবু কেন তাঁহার মনে হয় তিনি একা? কাদম্বিনী আপনাকে শাসন করিলেন—বরাবর মা'য়ের নিকটে থাকিবে নাকি ইন্দিরা? মেয়ে সে,—ছেলেও নয়;—একটু বড় হইতে না হইতেই তাহার পক্ষে অজ্ঞাত অপরিচিত শ্বশুর কুলে যাইবার কথা। তারপর—পার্বতী কোথায় চলিয়া গেল, কে রাখিতে পারিল তাহাকে? ইন্দিরাও যখন বড় হইয়াছে তখন মায়ের কোল জুড়িয়া আর কি করিয়া থাকিবে? না, তাহা থাকাই ভালো? কাদম্বিনী হৈমবতীকে এই কথাটা বুঝাইতে পারেন নাই। অশোককে হৈম আপনার কাছটিতে বাঁধিয়া রাখিতে চায়—আপনার চোখে-চোখে রাখিতে চায়। অশোকও তাই মায়ের কাছে স্বস্তি পায় না, সেও মায়ের নিকট হইতে কেবলি দূরে পালায়। অমর বলে—'অশোক যে একটা স্বতন্ত্র মানুষ।' সত্যই, অশোক তো হৈমবতী নয়, জ্ঞানশঙ্করও নয়,—'একটা স্বতন্ত্র মানুষ।' স্বতন্ত্র মানুষ অমরও;—কাদম্বিনীরও তাহা মানিয়া লইতে কষ্ট হইয়াছিল। এই কথা মানিতে কষ্ট হয়,—তাঁহারও হৈমবতীর মত কষ্ট হইয়াছিল। আরও অধিক কষ্টই হইয়াছিল। কারণ, কাদম্বিনীর সন্তানের মধ্যে জীবিত আছে এই অমর

আর ইন্দিরাই। কিন্তু তিনি দেখিলেন—অমর বড় হইল। বই, পত্র, কথা-গল্প, বন্ধু-বান্ধব—কত কিছুর দিকে তাহার মন দিনের পর দিন পরম স্ফুর্তিতে ছুটিয়া গেল; আঁকড়াইয়া ধরিল। এমনি হয়—ছেলে হউক, মেয়ে হউক, তাহারা বড় হয়, আপনার নিয়মেই লাভ করে বন্ধু-বান্ধব। কত নূতন মানুষ, নূতন ভাবনা, নূতন কর্ম উদ্যোগ লইয়া তাহারা মাতিয়া উঠে,—অ'ব মায়েরা একা পড়িয়া যায়। তাই বলিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া ছেলে মেয়েকে ঘরের মধ্যে মায়ের বুকের কাছাকাছি রাখিতে চাহিলে চলিবে কেন? কাদম্বিনী তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই বুঝিয়াছিলেন—অমর স্বতন্ত্র মানুষ। এখনও তাই তিনি ইন্দিরাকে আপনার আঁচলে ঘিরিয়া রাখিতে চাহিলেন না। ইন্দিরাও স্বতন্ত্র মানুষ। সেও পড়া শুনা করিতে যাইবে বৈ কি। তথাপি একা মনে হইতেছে কেন কাদম্বিনীর নিজেকে? অনেক দিন হইতেই তো চৌধুরী বাড়ির এই অবস্থা। কিন্তু আবার কাদম্বিনীর মনে পড়ে সেই দ্বিধাটা—কি বলিতেন আজ বিভূতিশঙ্কর বাঁচিয়া থাকিলে? কি বলিতেন তাঁহার শ্বাশুড়ী মহেশ্বরী?

বিভূতিশঙ্কর সম্ভবত আপত্তি করিতেন না। তিনি ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। নিজেরই ঝোঁকে তিনি নিজের লেখাপড়া শেষ করিতে পারেন নাই; বিদেশ দেখিবার আগ্রহে কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাই তাঁহার মনের মধ্যে লেখাপড়ার জন্য একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা রহিয়া গিয়াছিল। জ্ঞানশঙ্করকে পাশ করিতে দেখিয়া তাঁহার গর্ব্ব ও আনন্দের সীমা ছিল না। অমরকে এম-এ পাশ করিতে দেখিলে তিনি কত আনন্দিত হইতেন, তাহা কাদম্বিনী জানেন। ইন্দিরাকে স্কুলে পড়িতে দেখিলেও তিনি আপত্তি করিতেন না। কাদম্বিনী এই সত্য জোর করিয়াই বলিতে পারেন।

আর মহেশ্বরী? দুঃখের মধ্যেই তিনি মানুষ। বৃহৎ পরিবারের

তিনি ছিলেন ছোট বউ। অনেকটা অকালেই বিধবা হন। সকলের শাসনই তাঁহার উপব খাটিবে, কাহারও উপর উহার কথা বলিবার অধিকার নাই। সেই দুঃখেব দিনের কথা তিনি বিভূতিশঙ্করের সৌভাগ্যের দিনেও ভুলিতে পারেন নাই। কি বলিতেন সেই মহেশ্বরী আজ যদি দেখিতেন তাঁহার পৌত্রী ইন্দিবা নূতন জুতা পরিয়া অমরের সহিত গিয়া নদীর ঘাটে নৌকায় উঠিল—সে পড়িতে চলিয়াছে কলিকাতায়? হয়ত পরিহাস করিয়া বলিতেন 'সাহেব জামাই নিয়ে অসিস, বিবি-দিদি।'

কাদম্বিনীর মনে পড়ে—অমর তখন প্রথম পাততাড়ি লইয়া বসিয়াছে। মহেশ্বরীব কোলেব কাছটিতে সে বসিত। স্বল্পদৃষ্টি মহেশ্বরী লেখাপড়া জানিতেন কি? জানিতেন না বলিয়াই কাদম্বিনীদের বিশ্বাস। তবু তাঁহার কোলের কাছটিতে বসিয়া একদিনেই মুখে-মুখে অমর শিখিয়া ফেলিয়াছিল অ-আ, ক-খ। সাধ্য কি অমরের বা অন্য কাহারও যে বুঝিবে মহেশ্বরী ছিলেন নিরক্ষরা?

আপনার বুদ্ধিব বলে তিনি জ্ঞানশঙ্করকে পড়াইতে পড়াইতে বাঙলা অক্ষর শিখিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সেও শিখিলেন ইংরেজি এ, বি, সি, ডি—অমরের হাতের লেখার ভুল ধরিতে ধরিতে। শিখিবার এমন স্বভাবিক ইচ্ছা ও শক্তি ছিল যাঁহার তিনি কি ইন্দিরার শিক্ষার ইচ্ছায় বাধা দিতেন? না, কিছুতেই না। কোনদিন কাদম্বিনীর বা হৈমবতীর মনে হয় নাই—মহেশ্বরী বউদের লেখাপড়া জানায় ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট।...বৃদ্ধা সেই মেম সাহেব আসিতেন সেদিন মধুখালিতে তাঁহাদের বাড়িতে। নানা গল্প সল্প তিনি করিতেন বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে, মহেশ্বরীর সঙ্গেও। মহেশ্বরীর দেশী রূপকথা ও গল্পও শুনিতেন, অমরকে বলিতেন দেশ বিদেশের গল্প। তাঁহাকে দেখাইয়া মহেশ্বরী অমরকে পরিহাস করিতেন, 'তোকে এমনি লাল টুকটুকে মেম বউ এনে দোব।' কে শিখাইয়া দিয়াছিল, অমরও

তাই বলিত, 'মেম বউ নোব না। আমি তোমাকে বিয়ে করব, ঠাকুমা।' মহেশ্বরী হাসিতেন, বলিতেন, 'মেম বউ গল্প বলবে—বিলেতি গল্প।'...

কাদম্বিনীর মন একটা স্নিগ্ধতায় ভরিয়া যায়, মুখেও একটা প্রসন্ন হাসি ফোটে—'মেম বউ আর বিলিতি গল্প'...কী দিনই গিয়াছে! স্বপ্নের মত সেই দিনগুলি—এই তো সেদিনের কথা! অথচ পঁচিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে ইহার মধ্যে। মহেশ্বরী কবেই স্বর্গে গিয়াছেন, বিভূতি শঙ্করও নাই আজ দশ বৎসরের উপরে, আর অমরের এখনো বিবাহই হয় নাই। মহেশ্বরী বাঁচিয়া থাকিলে কি এতদিন বউ আসিত না? এই ঘরে আজ তাহা হইলে কাদম্বিনীর কি নিজেকে মনে হইত একা?... এতক্ষণ হয়ত তাঁহারও কোলের কাছে ঘেঁসিয়ে বসিত অমরের ছেলে। হয়ত কাদম্বিনীর মুখে মুখে সেও শিখিত বাঙলা বর্ণমালা। হয়ত তাহাকেও কাদম্বিনী পরিহাস করিতেন, 'তোমাকে মেম বউ এনে দোব, দাদু।' বউ থাকিলে ঘর দুয়ারে কাদম্বিনীর সাহায্য করিবার মানুষও জুটিত। তিনি হয়ত একটু স্বচ্ছন্দ-চিত্তে ভ্রাতা রজনীর নিকট, আত্মীয় কুটুম্বের গৃহে দুই একদিন গিয়া বিশ্রাম করিতে পারিতেন। ততক্ষণ তাঁহার বউমা নীলমাধবের পূজা আর সেবা করিতেন, ঘর দুয়ার ঝাড়িয়া পুছিয়া পরিচ্ছন্ন রাখিতেন, সিন্দুকের পুরানো জামা কাপড়, তৈজসপত্র ঝাড়িয়া পুছিয়া ঠিক রাখিতেন। পূজার দিনে হৈমবতীর সঙ্গে একসঙ্গে মণ্ডপে গিয়া হাত পাতিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেবীর সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতেন—আর অবশেষে কাদম্বিনীর মত শাশুড়ী হাত হইতে,—হৈমবতীর হাত হইতে, সিন্দুরের কৌটার মত, গ্রহণ করিতেন লক্ষ্মীর ঝাঁপি ও সিন্দুকের চাবি, গ্রহণ করিতেন চৌধুরী বংশের উত্তরাধিকার, চিত্রিসারের চৌধুরীর ভদ্রাসনের এই গৃহ-লক্ষ্মীর দায়িত্ব।...

কিন্তু ওকি ভাবিতেছেন কাদম্বিনী? কাদম্বিনী চমকিত হইয়া উঠিলেন। বউ আসিলেই কি আর এই গৃহের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারিত? তাহা হইলে সুরেশ্বরের বধূ বিদেশে বাসা বাঁধিল কেন? অমর তো আরও দূরে থাকে, আরও সে বিদ্বান। শিক্ষা দীক্ষাই তাহার স্বপ্ন। সে লেখাপড়া জানা মানুষ। গল্প আড্ডা মজলিশ ছাড়া তাহার চলে না। সে বিবাহ করিতে চাহে না; কিন্তু বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই সেই বউ মাও অমরের সঙ্গে বিদেশেই থাকিবেন—তাহাই স্বাভাবিক। কাদম্বিনীও তেমনি ছিলেন বিদেশে যতদিন বিভূতিশঙ্কর জীবিত ছিলেন। হৈমবতীও তেমনি আছেন বিদেশে, জ্ঞান শঙ্করের সঙ্গে আপনার সংসার লইয়া। অবশ্য কাদম্বিনীর সংসার হইয়া উঠিয়াছে আজ চিত্রিসারের এই ভদ্রাসন; সেই যে জ্যেষ্ঠা আজ এই সংসারে। কিন্তু ইহার পরে তাঁহারা এই ঘর দুয়ারের ভার কে গ্রহণ করিতে আসিবে?

কাদম্বিনী এই গৃহের কর্ত্রী—তাঁহাকে এখানেই থাকিতে হইবে, পুত্রবধূর হাতে দিয়া যাইতে হইবে সংসারের ভার। কোথায় তাঁহার সেই পুত্রবধূ? লোকে কাদম্বিনীকে দোষ দেয়, জ্ঞানশঙ্করকেও অপরাধী করে—কেন তাঁহারা বিদ্বান উপার্জ্জনক্ষম অমরের বিবাহ দিতেছেন না। যেন তাঁহারাই অমরের বিবাহ পথ আগলাইয়া আছেন। লোকের কথায় কাদম্বিনী মনে মনে বিরক্ত হন, মুখে হাসেন। কিন্তু একটুও বেদনা বোধ করেন না। আত্মীয়রা তাঁহাকে জানায়, অমরের যে রকম নানা সমাজে গতিবিধি, ইহার পরে—আবার রাজীব চৌধুরীর কথা উঠে। এই সব কথায় কাদম্বিনী এখন কিছু মাত্র চমকিতা হন না। বহু দিন এইরূপ কথা তিনি অমরের সম্বন্ধে শুনিয়াছেন। কতটুকু জানে ইহারা তাঁহার অমরকে? জানিলে কি মনে করিতে পারিত—অমর বিবাহ দিয়া আনিবার মত মানুষ? তেমনি ছোট, শিশুটি। কিংবা

বিবাহ ব্যাপারে অন্ত ছেলেদের মত একেবারে পিতৃভক্ত রামচন্দ্র। হাস্য পরিহাসে যে মানুষ—এমন আড্ডায় মজলিসে—সকলকে টানিয়া লইয়া ফিরিতে পারে, সে কি তাহাদের পাশ-করা 'ভালো ছেলে' মাত্র—বাপ মা বলিলেই বিবাহের আসরে বসিয়া গেল। বাঁটথাড়ায় মাপিয়া পিতা লইবেন সোনারূপা; সে গ্রহণ করিবে কন্যারত্ন: পিতৃভক্ত রামচন্দ্র।

তবু কাদম্বিনী দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেন—যদি অমর বিবাহ করিত! শিক্ষিতা উপযুক্ত বধূই কাদম্বিনী তাহার জন্য খুঁজিয়া বাহির করিতেন। তেমন মেয়ে কি আর নাই? সেই তো ছিল সেই ললিতা—তবে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে কবে! আর বড় বেশী চঞ্চল অস্থির-গতি ছিল সেই ললিতা। কেমন যেন একটু পায়ে পড়িয়া কথা বলিত সে। কিন্তু শিক্ষিতা স্থির ধীর শান্ত বুদ্ধিমতী মেয়েও কি কাদম্বিনী দেখেন নাই? সেই মালিনীকে তো দেখিয়াছেন। অবশ্য তাহারা ব্রাহ্ম। কিন্তু হিন্দু ঘরেই কি তেমন মেয়ে নাই? ব্রাহ্মণের ঘরেই বা অভাব কি? না হয়, আরও একটু কম পাশ করা হইবে। হউক, পরে পড়িয়া সে বউ পাশ করিয়া লইবে। ইন্দিরাও যেমন পড়িয়া পাশ করিবে তেমনি না হয় সেও পড়িবে বিদেশে, অমরের নিকটে। বউ বলিয়া কি পড়াশুনা করিতে নাই? পড়াশুনার ভড়ং না থাকিলেই হইল। না হইলে বৃদ্ধা মহেশ্বরী কি সকলের অগোচরে আপনার চেষ্টায় শিখিয়া ফেলেন নাই বাংলা লেখা, ইংরাজি বর্ণমালা? আপনার পুত্র পৌত্রদের জন্য, পুত্রবধূ, পৌত্রবধূদের জন্য এই তো তিনি নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন,—আপনারই অজ্ঞাতে আপনার জীবনের এই অনাড়ম্বর দৃষ্টান্ত,—চোখে পড়িয়াও তাহা কাহারও চোখে পড়ে নাই;—কাদম্বিনীর, হৈমবতীর পর্যন্ত অসাধারণ ঠেকে নাই। এই তো মহেশ্বরীর নির্দেশ।

কাদম্বিনী আপনার মনে একটা গভীর বিশ্বাস খুঁজিয়া পাইলেন।

ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী ভ্রাতৃগৃহে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। দূর সম্পর্কে সে বউমা'র ভাগ্নে বউ। ভাগ্নে ছিল ভবঘুরে—কিছুই সে করিত না। বাজারে বসিয়া আড্ডা দিত। কিন্তু তাই বলিয়া বিবাহে তাহার আপত্তি ছিল না। সে তো আর একালের ছেলে নয়, অমর চৌধুরী নয়, অশোক চৌধুরী নয়। মাতুলালয়ের অনাথা মেয়ে ইন্দুমতীকে অনায়াসে সে বিবাহ করিল; অভিভাবকেরাও একশ এক' টাকা নগদ পণ লাভ করিয়াছিল। তারপর বাজারে গাঁজা আফিমএর আড্ডা হইতে কোথায় সেই স্বামী অল্পদিন পরেই নিরুদ্দেশ হইল। বৎসর দুই পরে ঢাকায় রজনীর বাড়ীতে ফিরিয়া নানা রোগে সে প্রাণত্যাগ করে। আর সেই গৃহে রজনীর স্ত্রীর নিকটে ছাড়া অন্য কোথাও বিধবা ইন্দুমতী আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল না। সংসারে লোকের বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও রজনীর স্ত্রী তাহাকে ফেলিয়া দিতে পারিল না—বাধ্য হইয়া রজনীও সহরের বিধবাশ্রমে ইন্দুমতীকে সামান্য লেখাপড়া ও শিল্পকর্ম শিখাইবার ব্যবস্থা করিল। সেইবার রজনী আসিয়া বলিয়া গিয়াছিল—প্রয়োজন হইলে কাদম্বিনী তাহাকে আপন সাহায্যার্থ চিত্রিসারেও আনিতে পারেন। ইন্দুমতী কাজের মেয়ে হইবে, এক আধটুকু লেখাপড়া, শিল্পকর্মও শিখিয়াছে। নাটমন্দিরের পাঠশালার কাজ সে ভালোই চালাইতে পারিবে।

কাদম্বিনী ইন্দুমতীকে এবার চিত্রিসারে লইয়া আসিলেন—পাঠশালাটায় নূতন উৎসাহে তিনিও কাজে লাগিবেন। বাধা যাহারা

দিবার দিক। কিন্তু মেয়েগুলিকে চৌধুরী বাড়িতে পাঠাইয়া দিলে মায়েরা অনেকে যখন একটু নিরুপদ্রব হইতে পারে, তখন ছাত্রীর অভাব হইবে না। লেখাপড়া তাহাদের কতটা হইবে, তাহা অবশ্য মায়েরা জানিতে চায় না। কাদম্বিনীও এতদিন সে বিষয়ে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না। কিন্তু এবার উৎসাহ লইয়া কাজে লাগিলেন। ইন্দুমতী মেয়েটারও একটা করিবার মত কিছু হইল।

মাদুর পাতিয়া স্কুল করিতে বসেন ইন্দুমতী ও কাদম্বিনী। গুটি পনের'র বেশি মেয়ে নয়। তাহাতে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ ঘরের মেয়েরা আবার অন্য মেয়েদের সঙ্গে এক মাদুরে বসিতে চাহে না। ইন্দুমতীরও কেমন একসঙ্গে বসিতে আপত্তি। অবশ্য তত গোঁড়া সে নয়। সে শহরে কিছু দিন কাটাইয়াছে, রজনীর বাড়ীতে ছিল। তাহা ছাড়া গান্ধীজীর যুগে অস্পৃশ্যতা যে অন্যায় ইহা কে না মনে মনে বোঝে? তবু ইন্দুমতী ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, অনাচার সে করিবে কিরূপে? লোক গঞ্জনার ভয় আছে, নিজের মনেও সে স্বস্তি পায় না। সে বিধবা,—দরিদ্রা হউক, অনাথা হউক, পরের আশ্রিতা হউক, ব্রাহ্মণের বিধবা। ইহার উপযুক্ত আচার আচরণ পালন করিবার মত মর্যাদাবোধ তাহার থাকিবে না কেন? ইন্দুমতী সেই আচার এত দিন একটু বাড়াবাড়ি করিয়াই পালন করিত, রজনীর বাড়িতেও পালন করিয়াছে। সেই বাড়াবাড়িতে সে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহা অভ্যাসে দাঁড়াইবার পূর্বেই কাদম্বিনী তাহাকে আপনার কাছে পাইলেন।

না হয় অন্য মেয়েরা ঐ মাদুরে না বসিল, কিন্তু ইন্দুমতী বারুই বাড়ির মেয়েটিকে দূরে রাখিবে কেন? আচার নিয়মে এই বারুই যোগী প্রভৃতি জাতিরা বরং ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অনেকের অপেক্ষা বেশি সাবধান। নমঃশূদ্র কৈবর্তরা তত শুচিশুদ্ধ থাকিতে পারে না, তাহা ঠিক।

তাহাদের মেয়েরা এখনো পড়িতে আসে না। কিন্তু একদিন তাহারাও আসিবে। ছেলেদের পাঠশালায় তাহাদের ছেলেরা পড়িতে আসিতেছে; ইহার পরে উহাদের মেয়েরাও আসিবে, তবে এখনো দেরী আছে। কিন্তু তাহাদেরই অনাচারটা এমন বেশি কি? মাছ খাইবে ব্রাহ্মণেরা সকলে; কিন্তু মাছ ধরে বলিয়া জেলেদের দোষ? যে ধরিবে তাহাকে অনেক কষ্টেই ধরিতে হয়, ধোপদুরস্ত থাকিবে কি করিয়া সে? আর নমশূদ্র, হেলে কৈবর্তদেরই বা সাধ্য কি বাবুদের মত অত আচার বিচার পালন করে? আচার বিচারের অর্থ কি? পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যের নিয়ম? হয়ত তাহাই। কিন্তু সেই স্বাস্থ্যবিধি উহাদের শিখায় কে? না হইলে সেই ভোলা মিস্ত্রির নাতি সুমন্ত্রকে দেখিতে হয়। সে এবার কলেজে পড়িবে। মধুখালিতে তাহাদের কাঠের ভালো কারবার—বড় ভাই তাহা দেখে। উহাদের দেখিয়া চিনিতে পারিবে কি ইহারাও ছুতার? বিভূতিশঙ্কর সুরথ মিস্ত্রিকে কাঠের কাজের জন্য মধুখালিতে লইয়া যান, বাসাবাড়ি করিয়া দেন। কাদম্বিনীকে মা ডাকিত সুরথ। এখন তাহার ছেলেরা দেখিতে শুনিতে যে কোন ব্রহ্মণ কায়স্থ পরিবারের মত, বিদেশে কে-ই বা তাহাদের 'ছোট জাত' বলিবে? তাহারা কি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন আছে আর?

পাঠশালার শেষে না হয় স্নান করিয়া ধোতবস্ত্র পরিবে—ইন্দুমতী। কাদম্বিনী তাহা মানেন। কিন্তু সব সময়ে অত স্নান, অত শুচি নিয়মের বাড়াবাড়িই বা কেন ইন্দুমতীর? এখনই এই বয়সেই ইন্দুমতীকে শুচিবাইতে পাইতেছে যে! বকিয়া বকিয়া ইন্দুমতীর হাতের গোবর-ন্যাতা কাদম্বিনী কাড়িয়া লন। যেখানে মেয়েরা বসিয়াছিল সেখানটা গোবর জলে ধুইতে হইবে নাকি?

কিন্তু ইন্দুমতী বিধবা যে।

—বিধবা বলেই বাড়াবাড়ি করতে হবে, একথা বলে কোন্ শাস্ত্রে?

কাদম্বিনী তারপর নিজের মনে মনে তর্ক করেন: বিধবাই বা এমন কি ইন্দুমতী? স্বামীর মুখ দেখিয়াছিল সে কবে? কয়দিন? জানিল কি সে স্বামীর? এই তো তাহার বয়স—কেমন আবার পার্ব্বতীকে মনে পড়ে কাদম্বিনীর। সেই সূত্রে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি মানিয়া লন—অদৃষ্ট! অদৃষ্ট মানেন কাদম্বিনী,—অমর অশোক তাহা না মানিলে হইবে কি? পার্ব্বতীকে না হারাইতেও তিনি পারিতেন যদি গ্রামে থাকিত একটি ভালো ধাত্রী। কিন্তু ছিল না যে ইহাই তো অদৃষ্ট! ইন্দুমতীরও এমনি যে বৈধব্য ঘটিল ইহাও অদৃষ্টের বিধান ছাড়া আর কি?

হিন্দু বিধবার কথা উঠিলে অমরেরা তর্ক করিত। অদৃষ্টটা কি কেবল এই দেশের হিন্দু বিধবাদের জন্য? বিপত্নীক পুরুষদের জন্য নয়, অন্য সমাজের বিধবাদের জন্যও নয়?

জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী অমরকে বলিতেন: আইন করে তোমরা চাও জাত্যন্তরে বিয়ে চালাতে? বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত শক্তি দিয়ে পারলেন না দেশের মানুষকে বুঝাতে। আইন করলেই কি হয়? সমাজের প্রাণশক্তির সঙ্গে যোগ না থাকলে আইনও অচল হ'য়ে থাকে।

জ্ঞান চৌধুরীর আইনজীবী। আইন তাঁহাকে দিনে দিনে এই সমাজের নীতি-শৃঙ্খলার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিতেছে।

অমর তাঁহাকে বুঝাইত: সমাজ বেঁচে থাকলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাড়া দিত। মড়ার আবার সাড়া দেবে কি?

জ্ঞান শঙ্কর হাসিতেন: হাজার হাজার বছরেও মরেনি এ সমাজ।

অমর যাহাই বলুক, কাদম্বিনী বিশ্বাস করেন জ্ঞানশঙ্করকে। অবশ্য তিনিও যে আসলে বিধবাদের বিবাহেরই পক্ষে, তাহাও কাদম্বিনী

জানেন। কিন্তু যে সমাজে মেয়েরই বিয়ে দুর্ঘট, সেখানে বিধবা-বিবাহ করবে কে ?

তথাপি একাদশীর দিন ইন্দুমতীর নিয়ম-ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকাইয়া কাদম্বিনীর মমতা বাড়িয়া যায়। ইন্দুমতী তাঁহার পার্বতীরই মত মাথায় দেখিতে। এখনো ইন্দুর দেহ রূপযৌবন হারায় নাই, অযত্নে তাহার লাবণ্য বিনষ্ট হয় নাই। স্বাভাবিক স্বাস্থ্য তাহার ছিল, কালো রঙে সে শ্রীময়ী। শরীরে বাঁধন আছে, মুখশ্রীতে স্বাতন্ত্র্য আছে। নিশ্চয়ই উপবাসে, নিয়ম পালনে এই স্বাস্থ্যবতী মেয়ের ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বাল বাড়ে বৈ কমে না। বাড়ে বলিয়াই তাহা দমনের জন্য এত বাঁধাবাঁধি, কাদম্বিনী কি তাহা জানেন না ? তাই তো শাস্ত্র ব্যবস্থা—বিনষ্ট করুক সে তাঁহার যৌবনের স্বাস্থ্য, শ্রীসম্পদ, দেহ। কাদম্বিনী জানেন স্বাস্থ্য পরম সম্পদ,—আর যৌবনই কি এত ভয়াবহ ? যৌবনকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া মরিবার চেষ্টা না করিলে সেও হয় ত উপযুক্ত আবেষ্টনে শিক্ষাদীক্ষায়, কল্যাণের অনুগামী হইতে পারে।

ইন্দুমতীর মনের ঝোঁক আত্মপীড়নের দিক হইতে ফিরাইয়া তাহা কল্যাণকর শ্রীসৌন্দর্য্যের দিকে নিয়োজিত করিলে হয় না ?

ইন্দিরার চিঠিপত্রের জন্য কাদম্বিনী উন্মুখ হইয়া থাকেন। সপ্তাহে দুইখানা করিয়া পত্র ইন্দিরাকেও লিখিতে হইবে। সপ্তাহে না হোক্, দশ দিনে একখানা পত্র অমরেরও চাই অমরকেও লিখিতে হয়। গৃহ কর্ম্ম আছে, পাঠশালা আছে, প্রতিবেশিনীদের কোন কাজেই তিনি না গিয়া পারেন না। কিন্তু কাদম্বিনীর তাহাতেও কুলাইত না। একটা কাজ তিনি পাইয়া গেলেন—ইন্দুমতী—পার্ব্বতীর মত যে দেখিতে।

সংসারের দশজনের সেবার আনন্দের মধ্য দিয়াই মানুষকে আত্ম-কল্যাণের পথ আবিষ্কার করিতে হয়। ইহাই হিন্দু সংসারের সকল মেয়ের পথ—জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর এই কথা বিশ্বাস করেন কাদম্বিনী। ইহাই নিয়ম। তাই তো এই ভদ্রাসন সেই নিয়মেই তিনিও আগলাইয়া আছেন। কিন্তু এই সংসার তাঁহার আপন সংসার; ইন্দুমতীর তাহা কি? ইন্দুমতীরও সংসার চাই, আপনজন চাই; সেই সংসার হইবে—এই পাঠশালা। উহারই মধ্যে ইন্দুমতীকে তাহার আপন সংসার সৃজন করিতে হইবে—পাইতে হইবে মায়া-মমতাভরা মানুষের স্পর্শ; আর উহার সঙ্গে মানুষকে জানিবার বুঝিবার আনন্দ; বই পত্র হইতে পৃথিবীকে দেখিবার সুযোগ, পড়াশুনার মধ্য দিয়া নিজেকে চিনিবার আনন্দ।—কাদম্বিনী বুঝিলেন, ইহাই ইন্দুমতীর পথ।

বাড়িতে পড়িবার মত বইও আছে। হাতে লেখা পুরাতন পুঁথি অবশ্য কেহ পড়ে না, নীলমাধবের মন্দিরেই থাকে। কিন্তু কাঠের ভাঙা পেটরায়, তাকে, আলমিরায় সিন্ধুকে পুরাতন বই পত্র আছে। কৃত্তিবাস কালিদাস ছিল, ভাগবত পূর্বেই ছিল, কালীসিংহীর মহাভারতও ছিল। বিভূতি শঙ্কর জ্ঞানশঙ্করের দিনে আসিয়াছিল বঙ্কিম রমেশ; দীনবন্ধু, সঞ্জীব, মধুসূদনের গ্রন্থাবলী। অশোক গান্ধী সাহিত্য ও বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সাহিত্য আনিয়া তাহার 'স্বরাজ গ্রন্থাগার, গঠন করিয়াছিল। কাদম্বিনীর বাঁধানো অবাঁধানো প্রবাসী ভারতবর্ষও সেই সঙ্গে এখন যোগ হইতেছে। সপ্তাহে সপ্তাহে সংবাদপত্রও কাদম্বিনীর আসে। পড়ুক ইন্দুমতী চলন্ত পৃথিবীর এই আশ্চর্য গতিময়তার কথা, পড়ুক মহাভারত হইতে, ভাগবত হইতে পৃথিবীর যুগযুগান্তরের সঞ্চিত পুণ্যকাহিনী।

বই পড়িতে ইন্দুমতী অভ্যস্তা ছিল না; গৃহকর্মেই তাহার যোগ্যতা

সে জানিত। কিন্তু পাঠশালা চালাইতে হইবে, মাসীমাকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে বই। তাই পড়াও অভ্যাস করিতে হইবে। পড়িতে পড়িতে সে অভ্যাস তাহার গড়িয়া উঠিতে লাগিল—আর একবার বাধা ঘুচিতেই সে আস্বাদন করিল পুঁথি পত্রের সঞ্চিত সুধা।

নেশা লাগিয়া গেল ইন্দুমতীর মনে—কী আনন্দ, কী অকল্পিত বিস্ময়ের রাজ্য ইহার মধ্যে! মাসিক পত্রের এক একটা তুচ্ছ গল্পও তাহার নিকট অদ্ভুত। অন্যদিকে বঙ্কিম সঞ্জীব রমেশচন্দ্র আবিষ্কার করিয়া যেন সে আর বিস্ময়ের অবধি পায় না। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র পড়িয়াও সে এখন বুঝিতে পারে। হাঁ, এই সব কথাই তো সে শুনিত, নানা সূত্রে; গান্ধী দেশবন্ধু, আলি ভাই'র নাম তাহার কানে আসিত। এখন নিজেই সে পড়িতেছে সেই কথা! কাদম্বিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতেছে। আবার এই সব সংবাদ মেয়েদের নিকট বসিয়া ইন্দুকে গল্প করিয়া বলিতেও হইতেছে। কাদম্বিনী না হইলে তাহাকে ছাড়িবেন না। বলিবেন—না হইলে শিখিল কি?—বলতো গান্ধীজীর কথা কি আছে। এখনো তিনি জেলে, কিন্তু তাঁহার কথা তো জানা দরকার। শোনাও দেশবন্ধুর কথা। আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান্ পুরুষের অদ্ভুত ত্যাগের কথা না শুনিলে কি শুনিল দেশের মেয়েরা?

সব কথা বুঝিতে পারে না ইন্দুমতী;—সব কি কাদম্বিনী নিজেই বুঝিতে পারেন, না, কেহ বুঝিতে পারে? তাহা হইলে অমরে অশোকে তর্ক হয় কেন? তাহা হইলে অমন জ্ঞানী বুদ্ধিমান শান্ত উদার মানুষ জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী—তাঁহার সহিত তাঁহার পরম স্নেহের পুত্র অশোকের মতের মিল হয় না কেন? কেন বা তাঁহার অত আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র অমরের কথা শুনিয়াও জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী কৌতুকে অবিশ্বাসে হাসেন? সব বুঝা কি তাহা হইলে কাদম্বিনীর পক্ষেই সম্ভব? পৃথিবী

যে প্রকাণ্ড, বিচিত্র, বহু জটিলতাময় ;—আগেকাব মত দিন কি আর আছে ?

কোথা দিয়া বৎসরও ঘুরিয়া যায়। সেই ঘর, সেই সংসার, নীলমাধবের সেই ভোগ আরতি, সবই আছে। সযত্নে তেমনি করিয়া সিন্ধুকের শাল দোশালা খুলিয়া রৌদ্রে দিয়া তুলিয়া রাখেন নিজ হাতে কাদম্বিনী—ইন্দুমতীকেও হাত দিতে দেন না চৌধুরী বংশের এই উত্তরাধিকারে। বড় বড় থালা পরাত কলস ইন্দুমতীকে লইয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখেন। গৃহাঙ্গনও গোবর ন্যাতায় লেপিয়া পুঁছিয়া ঝকঝকে তকৃতকে করিয়া তোলেন দুইজনে মিলিয়া। বাগনের জীর্ণ আমগাছটার যত্ন করেন। পঞ্চবটি তলার বকুলের নূতন চাড়াটার দিকেও আবার সস্নেহ দৃষ্টি রাখেন। ইন্দুমতীও লক্ষ্য রাখে—জল পাইতেছে কিনা চাড়াটা, তিনটি ছাড়িয়া কবে চারাটি পাতার আভাস দেখা দিল উহার কোন শাখার কোন ডগায়। কাসুন্দী তৈয়ারী করিতে হইবে, আমসত্বের দিন আসিতে দেরী আছে। দুইজনে বসিয়া রাত্রি জাগিয়া চিরাকুটা ও নাড়ু তৈয়ারী করেন,—ছুটিতে ইন্দিরা আসিবে, অমর আসিবে, হয়ত আসিবে সেই ক্যাপা ছেলে অশোক, ইন্দিরার বোর্ডিংএ এইবার মধুখালি হইতে অমিতা পড়িতে গিয়াছে সে পাগলীও আসিতে পারে। মুড়ি ও খই ভাজিয়া কাদম্বিনী ও ইন্দুমতী কাড়ের মট্কীতে কলসীতে পুরিয়া রাখেন—হঠাৎ কখন আসিয়া পড়িবে বাবুরহাটের কুটুম্ববাড়ি হইতে সরযু। তাহাদের মাঝি মাল্লা পাল্কী বেয়ারাদেরও ভারী গর্ব ; জলপান ঠিকমত না পাইলে আর নিন্দার অবধি থাকিবে না। কমলার শ্বশুর বাড়ির লোকেরাও কেহ আসিতে পারেন। তবে তাঁহারা সেকেলে নিয়মে চলেন, চিরাকুটা, নাড়ু সন্দেশ না হইলেই তাঁহারা আপত্তি করেন। তারপরে আসিবে পূজার দিন—কত লোকজন আসিবে।—ঘুড়ি মোয়া, গুড়ও কি আর

চৌধুরী ঠাকুরাণীরা দিবেন না সেই কাজের বাড়ির মজুর, মাঝি, অনুগতদের ?—রাত্রি দিনে কাদম্বিনী ও ইন্দুমতীর আর সময় কোথায় ?

আর ইহার মধ্য দিয়াই—এই ঠাকুর সেবা গৃহকর্ম, পাড়া-প্রতিবেশীর শত আয়োজন, নিজেদের নিয়মিত কর্তব্য ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে—চৌধুরী ভদ্রাসনের এই শান্ত পরিমিত পরিধির মধ্যে—বাহিরের জাগ্রত জীবন্ত বৃহৎ পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনও দিনের পর দিন অতি সহজে অতি স্বভাবিক ভাবেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কাদম্বিনী তাহাতে চমকিত হন না; কিন্তু সচকিত হইয়া উঠে ইন্দু। কাদম্বিনীর মত দীর্ঘ জীবন ধরিয়া সে বিভূতিশঙ্কর জ্ঞানশঙ্করেব মত শিক্ষিত মানুষদের জীবন-যাত্রার স্পর্শে আসে নাই। অমর অশোকের অবিশ্বাস উৎসাহ তর্ক আলোচনা-মুখর অদ্ভুত মতামত শুনিয়া শুনিয়াও সে অভ্যস্তা হইয়া উঠে নাই। তাই তাহাব নিকট মনে হয় এ বাড়ির ভাবনা ধারণাই নূতন, মনে হয় পৃথিবী অস্থির, অথচ অদ্ভুত।...কী অদ্ভুত মানুষ এই অমর চৌধুরী! সর্বদা বাক্য মুখর, তর্ক মুখর, হাস্যমুখর! আব কেমন অদ্ভুত ছেলেই না তাঁহার জুরী এই অশোক। সমস্ত বাড়িকে গল্প তর্কে হাস্যে তাঁহারাই যেন ভরিয়া জমাইয়া রাখিয়াছে। সাধ্য আছে তাহাদের কথা উৎকর্ণ হইয়া না শুনিবে কেহ ?—যত দূরে থাকুক সে গৃহাভ্যন্তরে, থাকুক হাতে পূজার বাড়ির যত কাজ। সেই কথা গল্প শুনিতে শুনিতে ইন্দুমতীর মনে হয় যেন একটা বৃহৎ সম্ভাবনা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত বান ডাকিয়া আসিতেছে। নদী নালা খাল বিলের জলও আর স্থির থাকিতে পারে না। নদী পারের কাশগাছটির মত—খালের জলের ঝরাপাতাটির মত, ইন্দুমতীর প্রাণও তাই আনন্দে আশঙ্কায় কাঁপিতে থাকে। আর মনের অগোচরে দেহের স্নায়ুতন্ত্রী দিয়া সে বুঝি সেই দিগন্ত সীমায় সাগ্রহে চক্ষু মেলিয়া থাকে—কোথায় সেই জল-রেখা! কোথায় ?

কাদম্বিনী সহজ ভাবে খামখানা তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, অমরের পত্র বুঝি। পড়তো ইন্দু—চশমা রয়েছে ঘরের ঝাঁপিতে।

ইন্দুমতী জানে মাসীমা এই কথাই বলিবেন। ভয়ে ভয়ে ভাবে ইন্দুমতী—কিন্তু মাসীমা কি জানেন সেও ইহাই চায়? অসম্ভব নয়। কারণ, কাদম্বিনীর দৃষ্টি এড়াইবার মত সাধ্য হইবে কি ইন্দুমতীর? কিংবা অন্য কাহারও?

ইন্দুমতী পড়িতে লাগিল। সংযত স্বাভাবিক কণ্ঠেই পড়িতে পারে সে অমরের পত্রও। কিন্তু পড়িতে পড়িতে একি হইল? আর পড়িতে পারে না যে। থামিয়া গেল ইন্দুমতী। কাদম্বিনীর তাহা বুঝিবার মত অবকাশ কোথায়?

নিশ্চল প্রতিমার মত কাদম্বিনী বসিয়া আছেন।

শুনিয়াছেন, অমর লিখিয়াছিল:

অশোককে বিলাত পাঠাবার চেষ্টা করে ফল হল না। সে যাবে না। গেলে কাকাই টাকা দিতেন, আমিও না হয় সাহায্য করতাম। কিছু টাকা আমি তাই জমিয়ে রাখছিলাম। আগে ভেবেছিলাম—নিজে যাব। পরে ভাবছিলাম অশোক যখন এখানকার কলেজ বয়কট করেছে, তখন সেই যাক বিলাত। সেখানে তো গোলামখানা নেই, সেখানকার বিদ্যা হবে 'স্বাধীন দেশের' বিদ্যা। তা ছাড়া, সেখানে গেলে ওর এই গান্ধীবাদী গোঁড়ামি দু'দিনেই উড়ে যেত। বিদেশে না গেলে এদেশের মানুষের চোখ ফোটে না। এখন অবশ্য আর সে পাগলামো অশোকের নেই। কিন্তু তবু সে জানিয়েছে, কিছুতেই সে বিলাত যাবে না। সংবাদপত্রে এক শ' টাকা মাইনেতে চাকরি করছে—আর মজুরোদ্ধার করবে। কি আর করা ওকে দিয়ে? এদিকে আমি দেখছি—এখন জার্মাণি বা ইংলণ্ডে গিয়ে একটা কিছু না করে এলে আমারও

সুবিধা হবে না। দেরী করে আর লাভ কি? অবশ্য খরচ-পত্রের কথা ভাবতে হয়, খুব বেশি টাকা আমার হাতে নেই। ইন্দি'র পড়া খরচ চলে যাবে—দরকার হলে তা এখানেও নয় তোমরা জোগাড় করে দেবে। আর আমারও বছর দুয়েকের খরচ চালাবার মত ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আমার একজন বন্ধু আছে; সেও যাবে বিলাত। তবে সে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিজের খরচের মত টাকা পাবে। কাজেই দরকার হলে আমাকেই সে সাহায্য করতে পারবে।

তাই ঠিক করলাম—এ বৎসরই বিলেত যাব। সবই প্রায় ঠিক করেছি। ইংলণ্ডে পড়ব, তবে জার্ম্মাণীতে ক' মাস না গেলেই নয়। সে সব কথা আগেই জানো; গিয়ে দেখি এখন। ফিরে এলে কি হবে জানি না, তবে এর অপেক্ষা ভালো সুযোগই পাব, তাতে সন্দেহ নেই। আর না পেলেও—একবার ওদেশ আমার দেখতেই হবে।

যাব দু' এক মাসের মধ্যে, বেশী দেরী নেই। তার পূর্বে দেখা করতে আসব তোমাদের সঙ্গে। তোমরা ভাবছ বিলাত যাচ্ছি, সেখানে কীই না জানি করে বসি। অর্থাৎ মেম সাহেব নিয়ে সংসার বুঝি পেতে বসব। সে বড় শক্ত ঠাঁই—বিলাত দেশটা মাটির, কিন্তু সোনা রূপো না থাকলে ওখানে থাকা দায়। ঘরের ছেলেকে তাই ঘরে ফিরতেই হবে। কিন্তু যদি ছাঁদা বেঁধে সঙ্গে মেমসাহেব নিয়ে আসি? ব্রাহ্মণ সন্তান, ওরকম একটা ছাঁদা বয়েও আনতে পারি। তাতে এমন ভয়টাই বা কি? তোমাদের সঙ্গে না হয় সেই মেম-কন্যা বাঙলায় ঝগড়া করতে পারবে না। তাও কি পারবে না? এদেশে যদি আসে, দেখবে—এদেশী ভাষায় এদেশী নিয়মে সেই মেম-বউও শ্বাশুড়ী ঠাকরুনকে কথা শোনাতে কম পারবে না।

কিন্তু আশ্বস্ত হও। সে রকম মেম-বউকে তোমাদের ঘরে আনবার

জন্ত আমি বিলাত যাচ্ছি না! তোমরা বল্‌বে, বিশ্বাস কি? বেশ, তা হ'লে টাকা নিচ্ছি—বিলাত-যাত্রার আগেই একটা বিবাহের চেষ্টা করি। তা হলে বিশ্বাস করবে কি? কিন্তু তাতেই বা বিশ্বাস কি? ওখানে গিয়ে কিছু করে বসলে? তা যদি বলো—তা হ'লে ব্যবস্থা করতে হয় বউ-এর পাহারায় বিলাত-যাত্রার।

তবে তা'ই হোক। তেমন বউই সংগ্রহ করছি।

এখানে একটি মেয়ে আছে। তোমরা তার কথা শুনেছ কি? শান্তা নিজেও বিলাত যাচ্ছে। আসলে সে-ই বলছে আমাকে সময় মত বিলাতে সাহায্য করবে। ওর বাবা ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়; সারস্বত, না কি ব্রাহ্মণ, মা বরাবর খ্রীষ্টান। কাজেই খ্রীষ্টান মেয়ে বলে তাদের মিশন থেকে সে শিক্ষার বৃত্তি পাবে। হিন্দু বিয়ে করলেও তাতে বেশি কিছু গোলমাল হবে না। কিন্তু হিন্দুরা আমাকে নিয়ে দেশে গোলমাল করতে পারে। তা করুক। তুমি আর কাকা, আর আমাদের বাড়ির কেউ গোলমাল করবে না, আমি এ ভরসা রাখি।

কাকাকে ভিন্ন পত্র দিয়েছি। নিশ্চয়ই তাঁর আশীর্ব্বাদ শীঘ্রই লাভ করব। একটু তাড়াতাড়িই করতে চাই। যাত্রাব ব্যবস্থা করতে হলে অনেক কিছু করতে হবে। বিয়ে তো একটা সই করলেই হয়, কিন্তু বিলাত যাত্রা ও প্যাসপোর্ট অত সহজে হয় না। অনেক তার ফ্যাসাদ।

পত্র শেষ হয় নাই, কাদম্বিনী বুঝিতে পারেন নাই। কখন ইন্দুমতী উঠিয়া গিয়াছে, তাহাও তিনি জানেন না। কাদম্বিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন, বুঝি সম্বৎ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। যখন সচেতন হইলেন, তখন পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে সন্ধ্যার দীপ জ্বলিতেছে, শঙ্খ বাজিয়া

উঠিতেছে। দূরে অন্ধকার নদীস্রোত, তাহার বুকে মেয়েরা দীপ ভাসাইয়া দিয়াছে। সম্মুখে নীলমাধবের সেই পুরাতন মন্দির—ভিতরেও নিশ্চয়ই আছেন সেই পুরাতন বিগ্রহ।

না, কাদম্বিনী কিছুতেই অমরকে এমন অন্ধকারের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দিবেন না। বিভূতিশঙ্কর নাই, মহেশ্বরী নাই, কিন্তু জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী আছেন;—কাদম্বিনীর তিনি আকৈশোর সুহৃদ্, অমরের পিতৃতুল্য পিতৃব্য, চৌধুরী বংশের অটল ভরসা। ভয় কি কাদম্বিনীর? —সাধ্য কি অমরের আপনার ধর্ম, আপনার সমাজ, আপনার পিতৃ-পুরুষের সমস্ত সত্যকে বিস্মৃত হইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া যায়—যতক্ষণ জ্ঞানশঙ্কর রহিয়াছেন, রহিয়াছে এই চৌধুরী ভদ্রাসন—আর আছেন তাঁহাদের গৃহদেবতা নীলমাধব।

ইন্দুর বুঝি আজ মন্দিরের দীপও জ্বালাইতে মনে নাই।

কাদম্বিনী উঠিয়া পড়িলেন,—মন্দিরের পূজা আরতির সময় বহিয়া যাইতেছে যে!

৩

অশোক কলিকাতা গেল, মায়ের কোনো কথাই শুনিল না। জ্ঞান চৌধুরী বই লইয়া বসিয়াছেন। বইএর মধ্যেই তিনি ডুবিয়া যাইবেন, হয়ত এতক্ষণে ডুবিয়া গিয়াছেনও। কিন্তু হৈমবতী করিবে কি?

হৈম বারান্দায় গিয়া একাকী বসিল। বাড়ি ঘর শূন্য নিস্তব্ধ! জ্ঞানশঙ্কর পড়িতেছেন, তাঁহার বই আছে। কিন্তু হৈম'র আছে কে? অশোক...সরযূ...কমলা...অরুণ...অমিতা—কাহাকে হৈম আপনার বলিতে পারে? সরযূ? 'বাবুর হাটের' বাড়ির বউ বলিয়াই সে আপনার পরিচয় দেয়। কমলার সন্তান সম্ভাবনা, শীঘ্রই মায়ের নিকট আসিবে; কিন্তু সেও জানে সে কবিরাজ চক্রবর্তীর পুত্র-বধূ। এমনি হয়। মেয়ে সন্তান; নিজের ঘর দুয়ার লইয়াই তাহারা মগ্ন হয়। অমিতারও একদিন বিবাহ হইবে—এখনো দেরী আছে, সে কলিকাতায় ইন্দিরাদের বর্ডিংএ থাকিয়া পড়ে। হয় ত' ম্যাট্রিক পাশ করা পর্য্যন্ত জ্ঞান চৌধুরী অপেক্ষা করিবেন—অমি, তাঁহার আদরের মেয়ে। কিন্তু তবু সে মেয়ে, কত দিন আর মায়ের নিকট থাকিবে? তাই হৈম চাহিয়াছিল অশোকের বউ। কিন্তু অশোক কি তাহার মায়ের আপনার হইবে—কোনো কালে? সে তাহার মায়ের সাধ বুঝিল না, পিতার স্বপ্ন গ্রাহ্য করিল না। জেল হইতে মুক্তি পাইয়া সেবারও রহিল না হৈমবতীর নিকটে; এবারও আবার চলিয়া গেল কলিকাতায়। হয়ত অমর লইয়া আসিয়াছিল বলিয়াই এই কয়দিনের জন্য মায়ের নিকটে আসিয়াছিল,—কেবলই বলিয়াছে, সে সংবাদ-পত্রে কাজ করিতেছে, তাহার ছুটি কোথায়?

নূতন সংবাদপত্র বাহির করিবার জন্য অশোক ব্যগ্র—জ্ঞান ও অমরের

সঙ্গে বরং সেই বিষয়ে এখানে পরামর্শ করিত, কিন্তু হৈমবতী কি বুঝিবে? তাহার এত অনুরোধ, এত পীড়াপীড়ি বিবাহের জন্য,—সব অশোক অগ্রাহ্য করিল, আবার কলিকাতা চলিয়া গেল। আবার হয়ত সে বিপদে জড়াইবে, পুলিশে তাহাকে আবার ধরিবে; কিন্তু অশোক তথাপি আপনার জিদ ছাড়িবে না। সৃষ্টি ছাড়া তাহার খেয়াল—সে স্বরাজ করিবে; গরীবের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে,—হৈমবতীর কথা শুনিবার বুঝিবার সময় তাহার কই? মায়ের কথা সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে—হৈমবতীর নিকটে দুই দিনও থাকিবে না।...কাহাকে লইয়া থাকিবে হৈম? অরুণ তো একটা বড় দুর্দান্ত বালক। সে নিতান্ত ছেলেমানুষ। মা তাহার কোনো কাজ না করিলে হইবে না, কিন্তু হৈমবতীর দিকে তাকাইবে সে কখন? আজ খেলা আছে—ম্যাচ্; কাল রাত্রি জাগিয়া যাত্রা গান শুনিবে; পরশু পালাইয়া চলিয়া যাইবে খেলার দলের সঙ্গে কোথাও খেলিতে। অশোক, সরযূ, কমলা, অরুণ, অমিতা—কে আছে হৈমর আপন? কে বুঝিবে হৈম'র বেদনা, সংশয়, ভীতি, আশঙ্কা?...

জ্ঞান চৌধুরী বইএর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন; তাঁহার বই আছে! কিন্তু হৈমর আছে কে?

একাকী অন্ধকারের দিকে চাহিয়া হৈমবতী বসিয়া রহিল।

অশোকের আনীত ছোট বইখানাই জ্ঞান চৌধুরী পড়িতেছেন বুঝি। হৈমবতী বুঝিতে পারে—আজ বইএর মধ্যেও তেমন করিয়া কিন্তু জ্ঞান নিমজ্জিত হইয়া যাইতে পারিবেন না। বারে বারে আজ মনে পড়িবে অশোককে। বারে বারে আজ তিনি চমকিয়া উঠিবেন—কই, অমি' আসিল না যে এখনো? অমনি মনে পড়িবে অমিতা কলিকাতায়—তাহার স্কুল খুলিয়া গিয়াছে। অমনি মনে পড়িবে অশোককে,—অশোক আবার কলিকাতায় চলিয়া গেল,—পুলিশের হাত হইতে মুক্তি

পাইতে না পাইতে আবার সে কলিকাতায় গেল!…তবু জ্ঞানের বই আছে, হৈম'র আছে কে?

নিস্তব্ধ বাড়ি-ঘর এখন। অশোক-অমি' চলিয়া যাওয়াতে মনে হয় যেন কেহ নাই। অরুণও বাড়িতে নাই নাকি? খেলিয়া ফিরে নাই এখনো? না, ইতিমধ্যেই খাওয়া-দাওয়া না করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে?

হৈমবতী দেখিল অরুণের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। অরুণ পড়িতেছে তো?

বিষণ্ণ মুখে হৈমবতী অরুণের গৃহে প্রবেশ করিল। কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল তাহার অরুণের ঘরে ঢুকিতে। এই কয় দিন অরুণের সে বেশি খোঁজ লয় নাই; অশোককে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অশোকের গ্রেপ্তার অবধি বাড়ি শুদ্ধ সকলেই তাহার চিন্তায় উদ্বিগ্ন ছিল, তখন হইতেই হৈমবতী অরুণের দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে পারে নাই। অরুণও সে সময়ে মাকে বরাবরের মত পীড়াপীড়ি করে নাই। কিন্তু তাহার পরে? অশোক মুক্তি পাইল, অমরের সঙ্গে মধুখালি আসিল, অমিতা ইন্দিরাও আসিল সঙ্গে,—তখনো অরুণের কাজ আপনার হাতে তুলিয়া লইবার কথা হৈমবতীর মনে পড়িল না, ইন্দিরা তাহা করিয়া যাইতেছিল। অথচ অরুণ অশোক নয়, একটু অবুঝ, একটু অবাধ্যও সে; মায়ের উপর আপনার দাবি না খাটাইয়া সে থাকিতে পারে না। হৈমবতী এই কথা এত দিন ভুলিয়া ছিল কি করিয়া?

হঠাৎ ঘরের মধ্যে হৈমবতীকে দেখিয়া অরুণ চমকিত হইল। হৈমবতী নিজের নিকটে আরও লজ্জা পাইল। তাড়াতাড়ি বলিল: কি রকম পড়া হ'চ্ছে এখন?

সহজ ভাবেই কথাটা কহিতে গেল হৈমবতী, কিন্তু অরুণ সহজ ভাবে তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। সে পড়াশুনায় মনোযোগী নয়, তাই বুঝি মায়ের এই খবরদারি?

আমার খোঁজে তোমার দরকার কি?

শুধু বিরুদ্ধ প্রতিবাদ নয়, একটা ক্ষুব্ধ অভিমান অরুণের কণ্ঠে। হৈমবতী তাহা বুঝিল; মনে মনে আরও কুণ্ঠিত বোধ করিল। তাই আরও সহজ ভাবে কহিতে চেষ্টা করিল: তোমার খোঁজে আমার দরকার নেই? কিসে দরকার আমার তবে?

তোমার দরকার কোন্ মেয়ে তোমার বিদুষী হল, কোন্ ছেলে তোমার স্বদেশী হচ্ছে, তাতে।

'স্বদেশী' ছেলে, 'বিদুষী' মেয়ে! হৈমবতী ইঙ্গিত বুঝিল। একজন তাহার পিতার আদরিণী, আর একজন তাহার মাতার দুলাল; ইহার মধ্যে তাহার স্থান কোথায়—এই অরুণের? অরুণের অভিমানী কণ্ঠ, আহত চক্ষু এই অভিযোগই জানাইতেছে।

হৈমবতী একটু আগাইয়া গিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, বলিল: স্বদেশী ছেলে, বিদুষী মেয়ে। আর তুমি?

আমি আবার কে?

হৈমবতী হাসিয়া বলিল: তুমিও একটি দস্যিতো। বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া হৈমবতী তাহার বিছানা গুছাইতে লাগিল। বলিতে লাগিল, দু'দিন দেখি নাই, ইন্দি'কে বলেছিলাম, কাজকর্ম করতে। কিন্তু সেও গিয়েছে আর এ ঘরের কি শ্রী হয়েছে। বিছানা-পত্র কি একটু নিজেও গুছিয়ে রাখতে পার না? পাশ করলে তো বিদেশে যাবে, তখন দেখবে কে? কিন্তু পাশ করবে তো? পড়াশুনা করছ, না, কি?

হৈমবতীই আগে অরুণের বিছানা করিত, মশারি টাঙাইয়া দিত, চাকরকে দিয়া গ্লাসে করিয়া রাত্রির জন্য জল পাঠাইয়া দিত,—না হইলে মাকে অরুণও নিষ্কৃতি দিত না। হৈমবতীরও তো তাহাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, অভ্যাস যাহাই হউক মন বুঝি অভ্যাসগত নয়; অভ্যস্ত কর্ম্মের সহিত না জড়াইয়াও তাহা স্বতন্ত্র থাকিতে পারে। কোথায় অশোক—কোন্ দূরে কে'ন্ স্বদেশী পাগলামিতে ঘুরিয়া বেড়ায়, হাজতে না জেলখানায় আবদ্ধ,—তাহাই যেন সর্ব্বক্ষণ হৈমবতীর মন ছাইয়া থাকিত। সে জানিত অরুণ খেলা লইয়া মাতিয়া থাকে; মায়ের কথা তাহার বুঝিবার মত বয়সও নয়, সময়ও নাই। ইহাই হৈমবতীর স্বাভাবিক ভাবে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল—অরুণের কাজকর্ম্ম কিন্তু অশোকের ভাবনা। সেই কাজকর্মে এইবার ফাঁক পড়িতে, উহার ভিতরকার ফাঁকটাই যে অরুণের চক্ষে ধরা পড়িবে, তাহা কি হৈমবতীই ভাবিতে পারিয়াছে? হৈমবতী নিজেই কি জানিত সেখানে কোনো ফাঁক আছে? না, এখনো স্বীকার করিবে?

পূর্ব্বে হৈম দিনে কতবার যাইত অরুণের ঘরে। কখনো সে দেখিত অরুণ ফুটবলে মাখন মাখাইতেছে। কখনো দেখিত অরুণ খেলায় চোট খাইয়া পায়ে তেল মালিশ করিতেছে। দেখিয়া কখনো বিরক্ত হইত—অরুণ মাথার উল্টানো লম্বা লম্বা চুলগুলিকে চিরুণী দিয়া অকারণে বারে বারে উল্টাইতেছে আর পালিশ করিতেছে—সামনে খোলা বই, কিন্তু বসিয়া বসিয়া সে দেখিতেছে টেবিলের আরশিতে তাহার চুলের বাহার। এমনি অরুণের যত খেয়াল, পড়াশুনা তাহার আর তাই হয় না। পড়াশুনায় সে মনোযোগীও নয়; স্কুলের মাষ্টাররা এই কথা জানাইয়াছেনও জ্ঞান চৌধুরীকে। জ্ঞান এক-একদিন রাগ করিতেন; আবার এক-একদিন কর্ত্তব্য বোধে অরুণকে পড়াইতেও বসিতেন। কিন্তু

লোকজন আসিয়া পড়িত, মক্কেলে ·মামলায় তাঁহার সময় থাকিত না। হৈমবতীকে তিনি বলিতেন,—তুমি দেখছ না ? হৈমবতী কিছু বলিলে অরুণ তাহা কানেই তুলিত না, হাসিয়া বলিত ঃ স্কুলে তো তুমি যাওনা, যাই আমি। তোমার অত ভাবনা কেন ?

তোমার ভাবনা নেই দেখে।

তা হলে এই পড়বার ঘরে গোল করছ কেন ? তোমার ঘরে গিয়ে তুমি ভাবো। বরং দেখো তোমার অমি'কে, ভেবো তোমার অশোকের কথা।

অরুণ বুঝি বরাবরই বুঝিয়াছে—বাড়িতে তাহার আদর কম। হৈম তাহা জানিতে পারে নাই। সে একটু নীরব থাকিয়া তখন বলিত ঃ ভাখো ফেল হও, যা হও,—নকল-টকল করতে যেয়ো না। কর্তা তা হলে খুন হবেন।

শুনিয়া অরুণ প্রথম প্রথম হাসিত। পরে রাগ করিত।

এসব কথা তোমার কাছে কে লাগায় ? সুমন্ত্র ?

সুমন্ত্র কোথায় ?—সে তো কলকাতায় কলেজে পড়ে।

তবে অমি' ?

অমি' তখনো পড়িতে কলিকাতা যায় নাই। সে শুনিবামাত্র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত ঃ কেন, মিথ্যা কথা নাকি ?

ক্রুদ্ধ অরুণ এই অপমানে লাফাইয়া উঠিত—অমি'কে শিক্ষা দিবার জন্য। হৈম তাহাকে বাধা দিত, শাসন করিত। অমি'কে শাসন করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহাতে লাভ নাই। অমি' তাহার পিতার 'নিকটে মায়ের বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানাইতে ছুটিবে।

রুদ্ধ অভিমানে অরুণ আপন ঘরে ফিরিয়া অমি'কে ভ্যাঙ্চাইয়া বলিত ঃ ছিঁচ-কাঁদুনী।

হৈম বলিত : তুমি ওর গায়ে হাত তুলতে যাচ্ছিলে কেন?

কেন, উনি এমন কোন্ রাজ-কন্যা?

ও মেয়ে।

তবে মেয়ের মত থাক, ও রান্না-বান্না করুক :—পড়াশুনোর কথায় আসে কেন? আমাদের পুরুষদের কথায় কথা বল্‌তে আসে কোন্ সাহসে?

হৈমবতীর শুনিয়া হাসি পাইত। অরুণও বলিতে শিখিয়াছে 'আমাদের পুরুষদের কথা।' তাহারও বড়াই—সে পুরুষ।

এই কথায় অপমানিত বোধ করিত অমিতা। সত্যই তো, সে তো পুরুষ নয়। আপনার তাচ্ছিল্যবোধে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত,—অরুণকেও যে কোন রূপে তুচ্ছ করিতে হইবে। সে বলিত, অরুণের আবার পড়াশুনার বড়াই। সে অমর, না অশোক? নকল না করিলে যে পরীক্ষায় পাশ করে না—।

এমনি করিয়াই দুইজনে কলহ প্রতি সময়েই লাগিয়া যাইত। হৈম জানে অমি'রই আসলে দোষ বেশি। কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী অমি'কে বিশেষ শাসন করিতে দেন না—'ও একটা পাগ্‌লী।' তাহা বুঝিয়াই অরুণের মনের ক্ষোভ আরও মনে জমিয়া উঠে। তাহাকে কেহই গণনীয় মনে করে না—মা অবশ্য তাহাকে দেখেন, তাহার কাজকর্ম করেন। অমরদা'ও তাহাকে খেলায় উৎসাহ দেন। কিন্তু আমরদা'র চক্ষে আসলে সে অগ্রগণ্য নয়, শুধু গণনীয়, এই মাত্র। ছোট্‌দা' অশোকের চক্ষেও অরুণ অবশ্য স্নেহভাজন। কিন্তু অরুণ জানে, অশোকের যত স্নেহ—শেখর দেবব্রত সুমন্ত্রদের জন্য; যত পরামর্শ তাহাদের সহিত। তাহারাই অশোকের 'স্বদেশীর' সাকরেদ্। বয়সে বেশি ছোট বলিয়া আগে এই মর্য্যাদা অরুণ পায় নাই। পরে সুমন্ত্ররা যখন মুরুব্বিয়ানা করিয়া

তাহাকে উপদেশ দিতে আসিল তখন তাই অরুণ অপমানিত বোধ করিল। —সে অরুণ, অশোকের যে কনিষ্ঠ,—তাহাকে হিতোপদেশ দিতে আসে সুমন্ত্র দাস,—অশোক চৌধুরী নয়, বিজয় ঘোষ নয়, সমস্ত স্বদেশী ছেলেদের উপর অরুণ ক্ষেপিয়া যায়। অশোকের উপরও একটা অভিমান তাহার মনে জমিয়া জমিয়া ক্ষোভে, বিরোধিতায় পরিণত হয়—অরুণকে বুঝি সে দয়া করিয়া 'ভালো' বলিতে চাহে। না, অরুণের তাহাতে প্রয়োজন নাই। সে অশোকের মত 'ভালো ছেলে' হইতে চায় না। গজুর খেলার দলেই বরং তাহার মর্য্যাদা পরিতৃপ্ত হইবে।

হৈমর মনে পড়ে—অমি' তখন কলিকাতা পড়িতে যাইবে। অরুণ রাগিয়া গেল। অমিতার অপেক্ষা অরুণ বয়সে বড়, পড়েও বেশি, কিন্তু অরুণ কলিকাতা পড়িতে যাইবে না, যাইবে অমি? অবশ্য অমিতাও কলিকাতায় পড়িতে যাইবে বলিয়া বাড়ি মাথায় করিয়া তুলিয়াছিল। অরুণকেও সে দুই বেলা না চটাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না।

তোমার আগে যাচ্ছি কলকাতায় পড়তে—

নিরুপায় বলিয়াই অরুণ একটা তাচ্ছিল্য দেখাইত, বলিত,—তোদের আবার পড়া! মেয়েছেলের আবার লেখাপড়া!

কেন শুনি? তারা পরীক্ষায় নকল করে পাশ করে না বলে?

নকলের দরকার কি? মুখ দেখেই পাশ করে দেয় একজামিনাররা।

অমনি দুইজনায় লাগিয়া যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অমিতা অরুণের বইপত্র সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া মায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। হৈম অবশ্য অমি'কে শাসন করিল। কিন্তু অমিতা তাহার পিতার আদরিণী, এই সত্যটা অরুণের সঙ্গে কলহের উপলক্ষেও আপনার আচরণে অমিতা প্রকাশ না করিয়া ছাড়ে না। সে কাঁদিয়া গিয়া জ্ঞানের নিকট উঠিত, আর পিতার সাদর পরিহাসে সহজেই সেই ক্রন্দন ত্যাগ করিত।

অরুণের কিন্তু প্রতি নিমেষেই বুঝিতে দেরী হইত না—সে অত সৌভাগ্য লাভ করে নাই; সে কাহারও আদরের নয়। তাই সে কলিকাতায়ও পড়িতে যাইবে—অমি'র পরে। সে বরাবরই তাহার পিতার মুখে শুনিয়াছে,—যা পর্য্যন্ত তাহা বলিয়াছেন,—সে পড়াশুনায় নির্বোধ। অমর বা অশোক না বলুক, সকলেই বলে অশোকের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। অরুণ বরাবরই দেখিয়াছে সে অশোকের মত সম্মান পায় না; অমি'র মত আদরও পায় না। তাই অমিতা যখন কলিকাতা পড়িতে গেল তখন অমিতা শুধু দশজন আত্মীয়ের নিকট প্রমাণ করিয়া গেল না চৌধুরী বাড়িতে,—জ্ঞান চৌধুরীর চক্ষেও—আজ মেয়েদের লেখাপড়া ছেলেদের লেখাপড়ার মতই সমান আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হয়; সে অরুণকেই বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গেল, এই বাড়িতে, তাহার পিতার চক্ষে ও তাহার মাতার দৃষ্টিতে অরুণের অপেক্ষাও অমিতার লেখাপড়ার মূল্য বেশি;—অরুণ কাহারও সমকক্ষ নয়, অশোকেরও নয়, অমিতারও নয়। এমন কি কাদম্বিনী অমরের নিকটও সে গণনীয় নয়, তাঁহাদের চক্ষে গণনীয় অশোক আর মেয়েদের মধ্যে কমলা।

অরুণ তাই বাড়ির বহিঃপ্রান্তে আপন স্থান খুঁজিয়া লইতেছে—আপনার নিয়মে, আপনার রীতিতে। সে অশোককে বোঝে না—স্বরাজ দিয়া কি হইবে? সুমন্ত্রদের ডন কুস্তির স্বদেশী দেখিলে তাহার গা জ্বালা করে—গায়ের জোরের কি বাহাদুরী তাহারা দেখায়? দেখাক তাহা মেয়েদের। বিজয়দা'র 'ভালো কথা' ও সে শুনিতে চায় না—কংগ্রেস স্বরাজ, গঠন মূলক কাজ,—এ সবে তাহার কোনো আগ্রহ জাগিল না।

তাহার উৎসাহ জাগিল খেলায়। খেলায় সুমন্ত্রদের কেহ তাহার সমতুল্য হইতে পারিবে নাকি? গজুদের বাড়িতে তাহাদের খেলার দল জোটে, অরুণ সেখানে সসম্মানে আপনার স্থান গ্রহণ করে। লেখাপড়া জানা ভালো ছেলেদের সেখানে জায়গা নাই। ডন কুস্তীওয়ালা স্বদেশী ছেলেদেরও তাহারা সহ্য করে না। তাহারা খেলে। বাড়িতে গানের আসর আছে, গজুরা এক আধটুকু গান-বাজনাও জানে; রাজু ভালো ফটো তুলিতেও পারে। অরুণও কোনো কিছুতে হার মানিবার মত ছেলে নয়। বাড়িতে আপন মূল্য হইতে বঞ্চিত হইলেও অরুণ আপনার মূল্য সম্বন্ধে তাই মোটেই অচেতন থাকে না; বাড়ির সম্বন্ধেই বরং ক্ষোভ পোষণ করে। খেলায় কৃতিত্বের জন্য প্রথম প্রথম সে মাষ্টারদের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। তারপর লেখাপড়ায় অমনোযোগী দেখিয়া তাঁহারা বিরক্ত হন—জ্ঞানাবাবুকেও জানানো উচিত।

জ্ঞান চৌধুরী কোন দিনই খেলার কৃতিত্বে উৎসাহ দেন নাই, তখন রীতিমত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। অরুণ মাকে বলিত,—সে বাবার জন্য বন্ধুদের নিকট পর্য্যন্ত অপদস্থ হয়। জ্ঞান চৌধুরী ফুটবল খেলায় ছেলেদের চাঁদা দিবেন না, উহা বিলাতী খেলা। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে তাঁহারা এই সব খেলা বয়কট করিয়াছিলেন—এখন তাহা চলিবে কেন? ছেলেরা অরুণকে যত না বলিত, জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়া নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাসা করিত বেশি—'খেল্‌বি নাকি, অরুণ, বিলিতী খেলা?' তাহার বাবা খেলার জন্য চাঁদাও দেন না, কিন্তু ছেলেরা চাঁদা তবু পাইত—মায়ের নিকট হইতে অরুণ সংগ্রহ করিত। অমর ছুটিতে আসিলে তাহা দ্বিগুণ করিরা দিত।

জীবনে অমর একদিনও সম্ভবত ফুটবল খেলে নাই—বিদেশে টেনিস খেলিতে শুরু করিয়াছিল, তাহাও হয়ত শান্তার সঙ্গগুণে।

কিন্তু খেলার নামে উৎসাহ তাহার কোনো দিনই কম নয়। অরুণকে সে বলিত,—'পাশটা করে নে, অরুণ, কলকাতায় আমি তোকে গোষ্ঠ কুমারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসব।' সোৎসাহে অমর অরুণকে শুনাইত—সেদিনের গোষ্ঠ কুমার সামেদের গল্প। শুনিতে শুনিতে অরুণের মন অমরের দিকে আকৃষ্ট হয়। ততক্ষণে শুরু হইয়াছে অন্যদের কথা, নাইট, বেনেট, গল্‌ব্রেথ,—'কিন্তু ফুটবল খেলে মিলিটারির ওরাই।'

শুনিতে শুনিতে অমরের নিকট অরুণ যেন এক একবার স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিতেছিল। সে দিনই একটা ভাল খেলা অরুণের, অমর চৌধুরী তাহা দেখিতে যাইবার কথা। সময় হইয়াছে, কিন্তু অরুণের মাষ্টার মশাই মনোজীবন ভট্টচাজকে পাইয়া অমর তাঁহার সহিত গল্পে আলোচনায় মাতিয়া যাইতেছে—কাইজারলিং না কাহার নতুন বই লইয়া। অরুণকে বলিল, 'তুই যা, আমি পরে যাচ্ছি।' তারপর আর অমরের মনেই রহিল না কিছু। রাত্রিতে যখন শুনিল অরুণেরা জিতিয়াছে, তখন অরুণকে উৎসাহ দিতে অমরের তেমনি আবার মুখ খুলিয়া যায়ঃ—চৌধুরী গোষ্টীতে ওরা গায়ের জোর দেখাতেন ডাকাতি করে। অরুণই তবু দেখাল মানুষের মত জোর। খেলা ম্যান্‌লি কাজ, একটা আর্ট। গ্রীকেরা বুঝেছিল তার খানিকটা—'জিম্‌নেসিয়াম্‌' ছিল তাদের কাল্‌চারের কেন্দ্র, শিক্ষালয়ের নাম।

হৈমও সেদিন মনে মনে আনন্দিত, অরুণ খেলায় জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু তবু সে বলিত, আর বেশী বলো না, অমর। খেলার নেশায় একেবারেই পড়তে চায় না।

অমর তাহা কানেই তুলিল না। খেলায় জিতিতে পারা কি সহজ কথা নাকি? কিন্তু পরে সস্নেহে অরুণকেও গোপনে গোপনে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, একটু পড়াশুনো কিন্তু দরকার, অরুণ। জিম্‌নেসিয়াম্‌ অর্থ

তো কুস্তীর আখড়া নয়—সুমন্তদের মত 'ভল্‌গার' গুণ্ডামি। জিমনেশিয়াম কালচারের কেন্দ্র। আর, আমাদের দেশে লেখাপড়া না জানলে খেলোয়াড়েরও পজিশ্যান্ নেই। বিলাতে স্পোর্টস্‌ম্যানদেরই সম্মান। লেখাপড়ায় ফার্স্টদের' কে চিনে? কিন্তু ভার্সিটি ব্ল্যুদের হ্যাণ্ড শেক্ করতে পেলে রাজা রাজড়াও ধন্য।

হৈমর বিশ্বাস খেলা মন্দ নয়। কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী কেন তবে বলেন—'গান-বাজনা আর খেলা,—একটা লোক দেখলাম ও সবে মাথা দিলে আর মানুষ থাক্‌তে পারে। গান-বাজনাই কি মন্দ কাজ? কিন্তু গানের সঙ্গেই জুটবে হৈ-চৈ, আড্ডা-ইয়ারকি। খেলার তো কথাই নেই। দুদিন পরেই হাত যাবে পা যাবে, চোখ যাবে মুখ যাবে, নাক যাবে দাঁ* যাবে। তখন আর কেউ ফিরেও তাকায় না খেলোয়াড়ের দিকে। খেলা আর গান-বাজনা মানুষকে নষ্ট করবেই করবে।'

অমর তাঁহাকে বলিত, আপনাদের কালে তা'ই ছিল। ব্রাহ্ম-মর্যালিটির গুণঃ গান বাজনা খেলা-ধুলা এসব ছুঁলে আপানাদের জাত যেত।

তোমরা বুঝি তা দিয়েই জাতে ওঠো, না?

নিশ্চয়ই। খেল্‌তে মানা, চল্‌তে মানা, নাটকে মানা গানে মানা, হাস্‌তে মানা, কাশতে মানা—এরই নাম ব্রহ্মপনা।

সেই চিরদিনের তর্ক উঠিত।—অমর বলিত জ্ঞান চৌধুরী ব্রাহ্ম না হইলেও বাঙলার ব্রাহ্মযুগের আওতায় মানুষ। জ্ঞানশঙ্কর শুনিয়া হাসিতেন। তাঁহারা কেশব সেনের বক্তৃতার যুগ দেখেন নাই। তাঁহারা শিবনাথ শাস্ত্রীর আওতায়ও মানুষ হন নাই। সে হইয়াছিলেন রাজীব চৌধুরী। জ্ঞান চৌধুরী মানুষ হইয়াছেন মধুসূদন বঙ্কিমের ছায়ায়, রবীন্দ্রনাথের উদয় চ্ছটায়। কিন্তু আসলে তাঁহারা মানুষ হইয়াছেন সেক্‌স্পীয়র-মিলটনের রাজত্বে। বার্ক—ফক্‌স-শেরিডনের, সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের

বাগ্মিতা ছিল তাঁহাদের খাদ্য। আর মিল-বেন্‌থাম-হর্বর্টস্পেন্সারের সঙ্গে গীতা বাইবেল মিলাইয়া তাঁহারা করিতেন সন্ধি। তারপর আসিল জীবনে তিলক অরবিন্দের যুগ :—জ্ঞান চৌধুরীর গা যেন এখনো কাঁটা দেয় তাহা ভাবিতে।

হৈম অত বিচার বিতর্ক বোঝে না—তখনকার দিন ভালো ছিল, না, এখনকার যুগ ভালো। সেই দিন ভালো ছিল নিশ্চয়ই—উহাঁরাই ছিলেন অন্য-প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু জ্ঞানশঙ্করও তো শুনিয়া আপত্তি করেন নাই যে, ইন্দিরা ভালো এস্রাজ বাজায়। তবে গজুদের বাড়িতে অরুণ গান শুনিতে যায়, বাঁশী বাজাইতে শিখে, কয় মাস পূর্বে তাহা শুনিয়া অত রাগ করিয়াছিলেন কেন জ্ঞান? অরুণ অভিমান-ক্ষুব্ধ চক্ষে দেখে—কলিকাতা হইতে অমিতাও হাতে এস্রাজ লইয়া কয় মাস পরে বাড়ি ফিরিল; তাহার এস্রাজ শিখিবার গল্প জ্ঞানও বেশ সচ্ছন্দে কৌতুকে শোনেন। কেবল কি অরুণ বাঁশী বাজাইতে শিখিলেই দোষ? অরুণ ভালো খেলিতে পারিলেই অপরাধ? না, অরুণের খেলা ধূলায় হৈম আপত্তি করে না। কিন্তু হৈম মনে করে—ওই গজুদের বাড়ির আড্ডটা অরুণের ছাড়া উচিত। বাড়িটাও ভালো নয়; ব্রজবাবুর একটা ছেলেও মানুষ হয় নাই। আর অরুণ পড়াশুনায় মাষ্টার মশায়দের খুশী করিলেই তো জ্ঞানের বলিবার মত কোনো কথা থাকে না।

পড়াশুনায় অবশ্য অরুণের সুনাম নাই—সে তাহার জন্য ব্যস্তও নয়। কিন্তু সে নির্বোধ না কি? অরুণ ক্লাশে বরাবর পাশ করিয়া এখন ম্যাট্রিকের দুয়ারে আসিয়া গিয়াছে। অথচ বরাবর সকলে তাহাকে শুনাইত, সে পরীক্ষায় পারিবে না। অরুণ অবশ্য তাহা শুনিয়াও শুনিত না; কিন্তু ফেলও সে করে নাই। হৈম জানে—সে অশোকের মত ভালো পাশ করে না। কিন্তু অশোকই বা ভালো পাশ

করিয়া কি করিতেছে? প্রথমে বি-এ পরীক্ষা না দিয়া 'এক বৎসরে স্বরাজ' লাভ করিতে গেল। এখন তাহাও ছাড়িয়াছে। বি-এ পাশ অবশ্য হঠাৎ করিয়া লইয়াছে; কিন্তু আর এম-এও পড়িল না, আইনও পড়িল না, করিবে সাংবাদিকতা। কি এমন হইল অশোক যাহার বিদ্যার এত খ্যাতি? অমর অবশ্য অশোকের কথা খাড়াইয়া না বলিয়া পারে না। তথাপি অমরও বলে হৈমবতীকে, কিন্তু অরুণই বা মন্দটা কি, তা বুঝিয়ে দিন। আপনারা তুলবেন অশোকের কথা। কিন্তু সবাই অশোকের মত হতে পারে নাকি? অশোকই কি পারে নাকি অরুণের মত এমন খেলতে? খেলুক দিকিন। ওরা দু'টা স্বতন্ত্র মানুষ

'হৈমর মনের চিন্তা অশোককেই ঘিরিয়া থাকে,—কিন্তু অরুণকে ঘিরিয়া চলে তাহার দিনের কাজ। অরুণেরও মাকে না হইলে চলে না; দাদাকেই কি সে পর মনে করে? কিন্তু লোকেই তাহাকে অশোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া দাদার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিতেছে। অশোকের গ্রেপ্তারের সংবাদে মা অরুণের কাজ কর্মেও আর দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। কিন্তু কি মা কি বাবা, কেহ তাঁহারা একবার দাদার কথাটা অরুণের সঙ্গে তবু আলোচনা করিলেন না? বরং বিজয়দা'র সঙ্গে বাবা পরামর্শ করিলনে। তারপর অশোক গৃহে আসিল। মায়ের সহিত তাহার তর্ক বাধিয়া গেল বিবাহের প্রস্তাবে। পিতার সহিত তর্ক লাগিয়া গেল বলশেভিজম লইয়া। সেই সব কথা অশোকও কি অরুণের সহিত আলোচনা করিতে পারিত না? কেন, অরুণের অপেক্ষা কি সুমন্ত্র-শেখর বেশি বোঝে? মায়েরও আর অরুণের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবসর হইল না। অশোকের বউ না আনিতে

পারিলে বুঝি মা অশোকের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবেন না। কেন? শেষে যদি অশোকও অমরদা'র মত বলিয়া বসে,—আমি খ্রীষ্টান বিবাহ করিব। এই অতি-ভালো ছেলেদের পক্ষে আশ্চর্য্য কিছুই নয়।

অরুণ কিছুই বলে নাই, কিন্তু বুঝিয়া লইয়াছে—কেহই এই বাড়িতে তাহাকে আপনার বলিয়াও মনে করে না—বাবা নন, মাও নয়, কেহ নয়।

হৈমবতীও আজ চক্ষু খুলিয়া দেখিল—তাইতো, অরুণের কাজকর্মটুকুও সে এতদিন অবহেলা করিয়াছে। বিছানাটার চাদর ময়লা না হইলেও আজ সে ধোয়া চাদর বাক্স হইতে বাহির করিয়া আনিল, ভালো করিয়া তাহা বিছানায় পাতিল। নানা ভাবে অরুণের বিছানাপত্র, টেবিল চেয়ার কাপড় চোপড় সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। অরুণ দেখিতেছিল। হঠাৎ হৈমবতীর আবার মনে পড়িয়া গেল—অশোক এখন কোথায়? অমনি সে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল অরুণকে। কেমন তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—যেন পলাইয়া যাইতেছে কোথাও।

হৈমবতী আবার অরুণের কাজ নিজের হাতে তুলিয়া লইল। বারে বারে হৈম অরুণের পড়ার ঘরে যায়। কি তাহার চাই, জানিতে চায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করে, খেলার কথাও তোলে। খালি বাড়িতে বড় একা হৈম, বড় একা অরুণও। অবশ্য কমলা আসিয়া গেল। বাবার সঙ্গেই কমলার বেশি কথা হয়; কিন্তু বাড়িতে কমলাকে পাইয়া হৈম আশ্বস্ত হইল—অরুণের সঙ্গে কথা বলিবার একটা নূতন সূত্র হৈম লাভ করিল। অরুণের আচরণ যেন কেমন অদ্ভুত হইয়া উঠিতেছিল এই সময়টুকুর ব্যবধানেই।

গম্ভীর রাত্রে হৈমবতী দেখে অরুণ পড়িতেছে, তখনও ঘুমায় নাই।

চুপে চুপে হৈম তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়ায়। অরুণ টের পায়, কিন্তু কথা বলে না। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া হৈম বলে, শুয়ে পড়ো, অরুণ। তারপর কি বলিবে হৈম জানে না। কিছু না ভাবিয়াই বলে: এখনো ঘুম পাচ্ছে না যে—আজ খেলো নি দেখছি।

বেশি খেলি নি। এখন তো ক্রিকেট চলছে।

আবার একটু নীরব থাকিয়া হৈমবতী বলে: এ ক'টা মাস আর খেলা নিয়ে মাতামাতি করো না। গজুদের সঙ্গে আর মিশো না তো অত।

গম্ভীর হইল অরুণ: কার সঙ্গে মিশতে হবে তবে?

হৈম বুঝিল সে ভুল করিয়াছে। কিন্তু কথাটাতো মিথ্যা নয়—গজুদের বাড়িটার নামও খারাপ। তাই সে বলিল: আরও কত ছেলে, আছে তুমিই জানো। শেখর আছে; সুমন্ত্র আসবে ক'দিন পরেই।

এবার সত্যই ভুল করিয়া ফেলিল হৈম। অরুণ অপমানিত বোধ করিল। রুষ্ট হইয়া উঠিল: আমার উপর এত জবরদস্তি কেন তোমাদের? সুমন্ত্র-শেখরদের ইন্দি' অমি' বাহাদুর মনে করে, করুক। কিন্তু আমার উপর এই জুলুম কেন?

হৈমবতী চমকিত হয়—একি হইল? এত রাগ কেন অরুণের? সুমন্ত্র-শেখরদের উপর এত ক্রুদ্ধ সে? তাহারা যে অশোকের ছোট ভাইএর মত; অরুণের মতই হৈমর নিকটেও। কমলা অরুণকে বুঝাইয়া বলে, জুলুম তো নয়, অরুণ। তোমার পরীক্ষা এবার—পরীক্ষায় তুমি যাতে ভালো করতে পার, সে জন্য মা কত পুজো মানত্ করছেন

কমলা মাকেও বুঝাইয়া বলে। নিজের উপরই হৈমর রাগ হয়। সে অরুণকে অপমানিত করিয়া ফেলিল কেন? মনে মনে হৈম মানে, না, না; অরুণকে আর তিরস্কার করা সাজে না, তাহাকে বরং এখন যত্ন করা দরকার। কমলা আসিয়াছে, তাহাতে ভালোই হইল।

কিন্তু হৈমও অরুণকে এবার ভুলিয়া থাকিবে না। বরাবর অরুণই তাহার আপনার, সেও অরুণকে আপনার করিয়া লইবে বরাবরের মত।

আরএকটু আগে যদি পড়ায় মন দিতে তা হলে অনায়াসে পাশ করে যেতে—রাত্রিতে হৈমবতী অরুণকে মনোযোগ দিয়া পড়িতে দেখিয়া সহাস্য আনন্দে বলে।

অরুণ একবার তাকায়। তারপর সেও হাসিয়া বলে: এখনই কি পাশ করব না নাকি?

হৈম আশ্বস্ত হয়। সকৌতুকে বলে: শুনি তো সন্দেহ আছে।

কমলা বাবার সহিত গল্প করিয়া এখন ঘুমাইতেছে, ঘুমাক। সেই বুঝি অরুণের মনকে এতখানি সুস্থ, এতখানি স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। তাই হৈমও আজ স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে পারে অরুণের নিকট। অরুণ মায়ের কথায় হাসিল, বলিল: পাশ না করা পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ হতে পারে কে?

তবু। অনুমান করা যায় তো। দৈবাৎ কিছু না ঘটলে বলাও যায় কে পরীক্ষায় কি রকম করবে।

বেশ দেখাই যাবে তা। কিন্তু পাশ করলে কি দেবে?

হৈম বলে: কি আবার দোব? পাশ কে না করে?

ওঃ। সে দিকে নাম নেই, ওদিকে বল্‌ছ তো খুব।

হৈমবতী বলিল: আচ্ছা, কি চাও তুমি?

একটা ক্যামেরা, আর একটা সাইকেল—ট্যুরিংএ যেরুপ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে।

হয়ত গজুদের ওখানেই ফটোগ্রাফির ঝোঁকে পাইয়াছে অরুণকে। তাহা মন্দ কিছু নয়। কিন্তু সাইকলে সে যাইবে কোথায়?

হৈমবতী বলিল: আচ্ছা দোব—কিন্তু কর্তাকে বলে যেতে হবে। আর, ভালো পাশ করো তো আগে।—

হৈম অরুণের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়ে; শুনিতে চায় অরুণ কোথায় যাইবে পরীক্ষার পরে। অরুণ জানায়—বেশি দূরে নয়। এই জিলার পথগুলি তো তাহার পরিচিত! তার পর নদী পার হইবে—ষ্টিমারে। হয়ত আরও দুই একটা নদীও পরে পার হইতে হইবে। তারপর—শিলেট, শিলং—সেখান হইতে আসাম—পথঘাট দেখিয়া লইতে হইবে। সেখানে না গেলে ঠিক বুঝা যাইবে না। কিন্তু সে জন্য ভাবনা কি?

কত সহজে তাহার অরুণ তাহার আপনার হইয়া উঠে; আর কত পর হইয়া যায় হৈমর শত প্রয়াসেও তাহার অশোক! হৈম বুঝিতে পারে—অরুণ সহজ মানুষ, সহজ তাহার দাবী। আর তাই সহজ ভাবেই সেও তাহার পিতামাতাকে স্বীকার করিতে পারে—অশোকের মত তাঁহাদের দূরে সরাইয়া দেয় না। অরুণ তাঁহাদের আপনার হইয়াই আছে, আপনার হইয়াই থাকিবে। শুধু হৈমর নয়, হয়ত জ্ঞান চৌধুরীরও সে আপনার। কিন্তু তিনি কি তাহা জানেন? অরুণ লিখিতে পড়িতে উৎসাহী নয়। 'স্বরাজ', গরীব, 'সর্বহারা' প্রভৃতির জন্য তাহার মাথা ব্যথা নাই। বড় কথা শুনিতে চায় না, বইও তাহার নেশা নয়।—তাহাই ভালো। হৈমবতী তাহাকে লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে—বুঝিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন জ্ঞানও। অশোককে লইয়া কি এই স্বস্তি এক মুহূর্তের জন্যও আছে তাহার পিতার বা মাতার?

হৈমবতী জ্ঞানকে বলিল: অরুণের এবার পরীক্ষা। তুমি একবার ফিরেও ত্যাখো না সে কি করে, কি পড়ে।

সত্য কথা। কিন্তু জ্ঞান চৌধুরীর সময় কোথায়? সকালবেলা চা পানের পরে, তিনি কমলার সহিত একটু গল্প করিতেছিলেন, এখনি মক্কেল আসিয়া যাইবে, হয়ত আসিয়া গিয়াছেও, উঠিতে হইবে। জ্ঞান কি করিয়া অরুণের পড়াশুনার খবরদারি করিবেন?

জ্ঞান বলিলেন; কেন? মনোজ তো পড়ায়। আর মাষ্টার মশায়রাও আছেন। আমি আবার কি করব?

তুমি না দেখ্‌লে হয়? মাষ্টার মশায়রা পড়ালেই তো হয় না শুধু; তোমারও একটু দেখা উচিত।

জ্ঞান চৌধুরী তাহা জানেন। পূর্বে এক-আধবার নিজেও এই বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই! তাই নিজের ত্রুটী তাঁহার মনে পড়িল। আর পরিহাস করিয়া অমনি হৈমকে বলিলেন: তুমিইতো দেখছ—বেশ তো রাত্রিতে গল্প করছিলে।

হৈম লজ্জিত হয়: গল্প করব না তো কি করব? আমি লেখাপড়ার কি বুঝি? সে হ'ল তোমাদের বিদ্বান্‌ লোকদের কাজ।

জ্ঞান হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—এই অনুযোগ হৈমর বহুদিনকার। হয়ত অনুযোগ নয়। একটু দুঃখও আছে,—হৈম বেশি লেখাপড়া জানে না। 'বোধোদয়' 'চারুপাঠ':—তাহাদের দিনে ইহার বেশি কেই বা জানিত লেখাপড়া?—এখনো কি ইহার বেশি জানিবার দরকার আছে কাহারও,—এদেশের কোনো মেয়ের? তাঁহার মেয়ে অমিতাও তো ইংরেজী

পড়ে—এই পাগলী অমিতা, অবশ্য এখনো সে বালিকা, কিছুই তাহার বুঝিবার মত বয়সও হয় নাই। হইলেও বা লেখাপড়া শিখিয়া অমিতা বা ইন্দিরা কি হৈমর অপেক্ষা, কাদম্বিনীর অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী হইবে? সত্যই কি তাহারা কেহ কমলার অপেক্ষাও বেশি বুদ্ধিমতী বা লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্না? ইংরেজী লেখাপড়া কমলাও কতকটা জানিত। অদ্ভুত ছিল তাহার ধী-শক্তি; কথায়, আচরণে, গতিতে সে ছিল সানন্দ উজ্জ্বল, আর বই পড়িতে সে কী ভালোবাসিত!—বিদ্যায় বুদ্ধিতে সে ছিল অমর অশোকের মতই। কিন্তু কোথায় অমর অশোক—আর কোথায় এই কমলা! কবিরাজ চক্রবর্তীদের বাড়ীর সেকেলে গৃহকর্ম, দেবসেবা, অতিথিসেবা, পূজা, ব্রত, উপবাস—সবই এখনো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সেই সুন্দর, সংযত, নিয়ম-পরিশুদ্ধ জীবন-যাত্রার মধ্যে কমলা কেমন আপনা হইতেই সেই বাড়ির কর্ম্মনিরত গৃহবধূ হইয়া উঠিয়াছে। হৈমর মত, কাদম্বিনীর মত সেও গ্রহণ করিয়াছে সংসারে গৃহ-লক্ষ্মীর সাধনা—নারীর আত্মদানের ব্রত। আর এই আত্মদানের মধ্য দিয়াই সেও আত্মাবিষ্কার করিয়াছে। বইপত্র সে আর চাহে না, গৃহ কর্ম্মের মধ্যেই তাহার বাঞ্ছিত কাম্য সে লাভ করিতেছে। চিরদিনের সেই গৃহ-সাধনাই সেও আপনার জীবন দিয়া হৈমর মত, কাদম্বিনীর মত, মহেশ্বরীর মত,—আরও কত কত পিতামহী মাতামহীর মত—সার্থক করিয়া রাখিয়া যাইবে।—আর কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে লেখাপড়া জানা অমর—যে বিজাতীয় কন্যাকে বিবাহে উদ্যত;—ভাসিয়া যাইতেছে তাহার অশোক—যে বিজাতীয় ভাবধারায় উন্মাদ।...

অমর অশোকের সঙ্গে কথা বলিলে কেবল তর্ক বাড়ে। আর বাড়ে নৈরাশ্য। কমলার সহিত কথা বলিলে বরং জ্ঞান চৌধুরীর মন

জুড়ায়। কিন্তু উহারই বা সময় কোথায়? মক্কেল বসিয়া আছে—দেরী হইতেছে। এমনি যাইতে হইবে।

জ্ঞান চৌধুরী পরিহাস করিয়া হৈমকে বলিলেন: বিদ্বান কি, তুমি যে বিদুষী মেয়ের মা:—তোমার মেয়ে পড়ে কলকাতার স্কুলে। যাচ্ছি অরুণকে বলে—সে তোমার কাছে যেন পড়া নেয়, পড়া দেয়।

হাসিতে হাসিতে জ্ঞান চৌধুরী উঠিয়া চলিলেন। অরুণের পড়ার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, অরুণ!

অরুণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল।

কি করছিলে? পড়া শুনছি না যে।

অরুণ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এইরূপ প্রশ্নে তাহার উত্তর বরাবরই তৈয়ারী থাকে। বলিবে, জিওমেট্রির একটা প্রোব্লেম কষিতেছিলাম। কিংবা সংস্কৃতে অনুবাদ করিতেছিলাম। অরুণ সেইরূপ উত্তর দিল। জ্ঞান চৌধুরী দাঁড়াইলেন,—দেখিবেন কি? না, এখন সময় নাই। মক্কেলদের গলা শোনা যাইতেছে পার্শ্বের ঘরে। অরুণকে বলিলেন, বেশ পড়ো। তারপর যাইবার উদ্যোগ করিয়া আবার বলিলেন, আচ্ছা, সন্ধ্যা বেলা আমাকে দেখাবে তো কি করেছ?

অরুণ জানে, বাবা ভুলিয়া যাইবেন না। না হইলেও, তাঁহার সময় হইবে না। সন্ধ্যাবেলা তাঁহার বৈঠকখানায় চিরদিনের আড্ডা-গল্প জমে। উকিল বন্ধুরা আসেন, দু'একজন অধ্যাপক, মাষ্টার ও অমরদা' থাকিলে আসিয়া পড়েন, কাহাকেও না পাইলে বাবা মনোজদা'কেই ডাকিয়া গল্প করিতে বসিবেন। অরুণকে তিনি দেখিবার সুযোগও বিশেষ পান না। তবে দুই-একদিন অরুণের একটু সাবধান থাকিতে হয়, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয়—এই মাত্র।

প্রতি বৎসরের পরীক্ষা শেষ হইলেই জ্ঞান চৌধুরীর এইরূপ

একবার করিয়া অরুণের প্রতি কর্তব্যের কথা মনে পড়িত।—তাই তো, পরীক্ষায় অরুণ মোটেই ভালো করে নাই যে। কেন? পড়ে না।

দুই এক সন্ধ্যায় অরুণকে তিনি পড়াইতে লইয়া বসিয়াছিলেন। বন্ধুরা বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতেন, গল্প বিশ্রামের সময় ইহা। কিন্তু কি করিতেছেন জ্ঞান চৌধুরী অরুণকে লইয়া?

—ছেলেটাকে দেখছি। একেবারে গাধা হয়ে যাচ্ছে যে। সাধারণ সিকোয়েন্স্ অব টেন্সেরও কিছু জানে না। ইংরেজিতে বেজায় কাঁচা।

শরৎ কহিতেন; নাও, নাও। তোমার ওকে এখন আর ডাঁসাতে হবে। সমস্ত দিন এসেছ আদালতে হাকিমকে ডাঁসিয়ে, তাতেও ঝাল মেটেনি।—যাতো, অরুণ, পড়গে তোর নিজের ঘরে বসে।—অরুণ উঠিয়া যাইতেই ডাকিয়া শরৎ জ্যেঠামশায় একবার বলিতেন, দেখিস রে, ঘুমোতে শুরু করিস্‌নে যেন।

শরৎকে জ্ঞান বুঝাইতে চাহেন: দেখতে বলেছেন হেড্‌মাষ্টার মশায়। পাশ করতে হবে তো। ভদ্র লোকের ছেলে, লেখাপড়া না শিখলে খাবে কি করে?

দেবেন্দ্র ততক্ষণে আসিয়া গিয়াছেন, বলিতেন: লেখাপড়া শিখলেই কি খেতে পায় নাকি? না শিখলেই বরং ভালো। খেলার জোরে পেয়ে যাবে পুলিশে চাকরি—অবশ্য মুসলমান প্রার্থী যদি না থাকে।

জ্ঞান চৌধুরীর অরুণকে দেখা-শোনা এইভাবেই শেষ হয়। হয় ত এই কারণেই নিজের ত্রুটী জ্ঞান আপনার নিকট ও দশজনের নিকট শোধরাইতে চেষ্টা করেন এই বলিয়া, ও পাশ করবে কি করে? ফুটবলের মাঠ যে কাঁদবে। অরুণ তাহা শুনিয়াও শুনিত না। কিন্তু অরুণ তাহা ভুলিতেও পারে নাই।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া সেদিনও বুঝি জ্ঞান ভুলিয়া যাইতেন অরুণের কথা, কিন্তু কমলাই বিশ্রামের পরে গল্প করিতে করিতে বেশ বুদ্ধি করিয়া মনে করাইয়া দিল; অরুণকেও সে তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিল। জ্ঞান চৌধুরীর মনে পড়িল, অরুণকে ডাকিলেন—সে আজ এখন সন্ধ্যা না হইতেই বই লইয়া বসিয়াছে।

জ্ঞান জিজ্ঞাসা করলেন, কি পড়ছিলে?

অরুণ প্রস্তুত ছিল: সংস্কৃত।

আচ্ছা পড়ো দেখি—শুনি আমি। জ্ঞান চাপিয়া বসিলেন।

সীতার পাতাল প্রবেশ পড়িতেছিল অরুণ। দেবনাগরী অক্ষরগুলি বড় বিদ্‌ঘুটে—তাহা কি রীডিং পড়িবার মত? পড়িতে আরম্ভ করিয়া ঠেকিয়া যাইতে হয়। চশমা খুলিয়া বলেন জ্ঞান চৌধুরী—আঃ, এই শব্দটা পড়িতে পারে নাই অরুণ! গড়গড় করিয়া পড়িয়া চলেন জ্ঞান। অরুণের বিস্ময়ের সীমা থাকে না—ইংরেজী নয়, অঙ্ক নয়, সংস্কৃত পর্যন্ত বাবা এত ভালো জানেন! কোন ঘটনার এল্যুশেন কোথায় তাহাও জানেন। অরুণকে একবার তাহা জিজ্ঞাসা করেন, জিজ্ঞাসা করেন আবার কমলাকে। অরুণের অপমান বোধ হয়। কিন্তু ছোটদি'র কাণ্ডজ্ঞান আছে। অরুণের অভিমান বুঝিয়া বলে,—আমরা পড়েছি বাঙলা রামায়ণ—এখন ওদের বাড়িতে পড়া আরম্ভ করেছিলাম ভট্টিকাব্যম্। নিজেই তখন বই পড়িতে আরম্ভ করেন জ্ঞান চৌধুরী। পড়িতে ভালো লাগে। রামায়ণের সংস্কৃত সরল ও মধুর। এখন যেন এই কথাটা তিনি আরও উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। ছাত্রজীবনে তো সংস্কৃতভাষার রস এমন করিয়া উপভোগ করিতে পারেন নাই। কালিদাস ভবভূতিতেই তখন পরিতৃপ্তি পাইয়াছিলেন। ভট্টি কেন, মাঘও মনে হইয়াছে নীরস। 'মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ।' ইহার বিরুদ্ধে জ্ঞান সেবার তর্ক করিয়াছিলেন

কমলার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে—তিনি মাঘেরও ভক্ত। তিনি বলিয়াছিলেন—ইংরেজী কাব্য ও তাহার রীতি-পদ্ধতিতে জ্ঞানেরা এত প্রভাবিত হইয়াছেন যে, সংস্কৃত কাব্য কথা ও রীতিপদ্ধতিতে যথার্থ মূল্য আর তাঁহারা খুঁজিয়া পান না। তখন জ্ঞান কথাটা মানেন নাই, এখন বুঝিতেছেন—হয় ত ঠিকই বলিয়াছিলেন চক্রবর্তী কবিরাজ মহাশয়। বড় বেশি ইংরেজী ধ্যান ধারণা, জীবন কর্মও নিয়মের দ্বারা পরিচালিত তাঁহারা, ইংরেজি শিক্ষিতেরা। ভারতীয় জীবনের রসকেও আর তাঁহারা তেমন করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। সে জীবনের আদর্শ ও রূপ তাঁহারা না বুঝিলে সেই কাব্য-রস ও কাব্য-কলাই বা বুঝিবেন কি করিয়া? না, সন্দেহ নাই—ভারতীয় জীবনের একটা শাশ্বত সৌন্দর্য্য আছে; আর এদেশে পুরুষেরা তাহা হারাইয়া ফেলিতেছে। কিন্তু এ দেশের মেয়েরা এখনো আপন আপন গৃহকোণে, আপনাদের ব্রত নিয়ম গৃহকর্মের সূত্রে, দিন-রজনীর নিয়ম-রীতির মধ্য দিয়া সেই জীবন-রূপ অব্যাহত করিয়া রাখিয়াছেন। সেইখানেইতো আমাদেব সভ্যতার প্রাণ, সেইখানেইতো আমাদের জীবনের উৎস; এই রামায়ণ মহাভারতের কথায় পরিপুষ্ট বহুশতাব্দীর বিচিত্র জটিল জীবন মধ্যেই আমাদেরও উদ্ভব।

বঙ্গবাসী সংস্করণ রামায়ণ মহাভারত জ্ঞান চৌধুরী পড়িয়াছিলেন কত কাল আগে, তখনো তিনি ওকালতি পাশ করেন নাই! অনুবাদের সাহায্য তাঁহাকে বারে বারে লইতে হইয়াছিল, তবু তাহা ভালো লাগিয়াছিল সেই সেকস্‌পীয়ার মিলটন-পড়া ডারুইন হার্বার্ট স্পেন্সার পড়া জ্ঞান চৌধুরীর। এখন এই সামান্য এইটুকু পড়িতে পড়িতেও তাহা আজ আরও ভালো লাগিল। কত গল্প তাঁহার মনে জাগে, রামায়ণের কত উপাখ্যান মনে পড়ে। লবকুশের রামায়ণ গান: কৃত্তিবাসে তাহা কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে?

জ্ঞান চৌধুরী অরুণকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অরুণ প্রস্তুত ছিল না, বলিল: কৃত্তিবাস আমাদের পাঠ্য নয়।

পাঠ্য না হোক, মনে পড়ে তো?

না, অরুণের তাহা মনে নাই। কমলার মনে আছে কি? কমলা এবার আর অরুণের কথা মনে করিয়া সাবধান হইল না, বলিয়া ফেলে। জ্ঞান চৌধুরী খুশী হন। অরুণকে বলিলেন: মনে পড়ছে এ সব?

অরুণ ততক্ষণে গম্ভীর হইয়াছে। আবার একটা ক্ষোভ তাহার মনে জাগিয়াছে। পিতার পড়াইবার আগ্রহে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও ঔৎসুক তাহার মনে ইতিপূর্ব্বে জাগিয়াছিল তাহা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অরুণ গম্ভীরভাবে কহিল: ওসব আমি পড়ি না।

জ্ঞান আশ্চর্য্য হইলেন: কৃত্তিবাসী রামায়ণ তুমি পড়ো নাই?

হৈম আপনা হইতেই বলিল: ওকি ওসব পড়িবে? রামায়ণ মহাভারত ছিল অশোকের নেশা। খাওয়া দাওয়া ভুলে যেত। অশোকের মুখস্থ ছিল সমস্ত রামায়ণ ও মহাভারত।

হাঁ, মনে পড়িল জ্ঞানেরও। একবার মহাভারতের কোন্ একটা তর্কে অশোক তাঁহার পণ্ডিতমহাশয়কেও হারাইয়াছিল।

কেবল সেই 'অশোক', 'অশোক', 'অশোক': অরুণ মুখ নত করিয়া রহিল।

জ্ঞান বলিলেন: তুমি পড়ো নি বাঙলা রামায়ণ মহাভারতও?

অত গাঁজাখুরী গল্প পড়ে কি হবে?—হাসিতে চেষ্টা করে অরুণ।

এবার জ্ঞান হাসিয়া ফেলেন—নির্ব্বোধ অরুণ বলে কি?

মনে পড়ে আপন শৈশবের বাল্যের কথা—মেটে প্রদীপের আলোতে চিত্রিসারের ভদ্রাসনে রামায়ণ-মহাভরত পড়িয়া শুনাইতেন বালক জ্ঞান

চৌধুরী। সেকালের ছাপা সেই বই ছিল তাঁহার মায়ের বড় সম্পদ—বুঝি অকাল-মৃত স্বামীরই চিহ্ন। মহেশ্বরী ও সরলা দি' শুনিতে বসিতেন; কাজের অবসর পাইলে জেঠাই মা'বাও থাকিতেন; ও-বাড়ির বড় দিদিমাও আসিতেন; বাড়ির আশ্রিতা আত্মীয়-কুটুম্বরা জুটিতেন। পাটি বিছাইয়া দিতেন মহেশ্বরী। প্রত্যেকের হাতেই থাকিত নানা কাজ, কেহ প্রদীপের আলোকে কাঁথা সেলাই করেন, সলিতা পাকান কেহ। কোন কোনো দিন বা সকলে মিলিয়া লাড়ু তৈরী করেন। কোনো দিন দ্বি-প্রহর গড়াইয়া যাইত অপরাহ্নে, কোনো দিন সন্ধ্যা হইয়া উঠিত স্তব্ধ রাত্রি। হঠাৎ যখন প্রদীপ নিবাইয়া সকলে শুইতে যাইতেন, জ্ঞানের মনে হইত নির্মল আকাশের প্রকাণ্ড আসর জুড়িয়া যেন সেই মহাপরাক্রান্ত বীর রথীদের আসন পাতা রহিয়াছে। কিংবা ইতিহাসের সেই প্রলয়-শেষে পুণ্যবতী বীর সাধ্বীরা বুঝি অন্ধকার আকাশে আপনাদের প্রিয়জনের পার্শ্বে নক্ষত্র-লোকে গিয়া বসিয়াছেন। প্রত্যেকে তাঁহারা জ্ঞানের চেনা। কুন্তী, মাদ্রী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা—কেহ কি ছিলেন মিথ্যা? কেহ কি ছিলেন কল্পনা?—কম জীবন্ত, জাগ্রত সত্য ছিলেন কি তাঁহারা তাঁহার মাতা-মাতামহীদের অপেক্ষা?... মেটে প্রদীপের আলোকে সেই ঘিরিয়া-বসা মাতা, পিসিমা, জেঠাই মা'রা,—তাঁহারাই কি আজো কেহ কম জীবন্ত, কম জাগ্রত—এই হৈম কমলা অরুণের অপেক্ষা?...কি মিথ্যা? কি কল্পনা? সেই অশ্রু-সজল তরণী সেনের উপাখ্যান, সেই বিদ্রূপ বিচ্ছুরিত 'অঙ্গদের রায়বার'?—ব্যাস যাহার খোঁজ রাখিতেন না,—তাহাই কি মিথ্যা? বাঙ্গালী মনের দুইটি মূল সত্যই কি কৃত্তিবাস উহাতে প্রকাশ করিয়া রাখিয়া যান নাই? আছে এমন অশ্রু ও বিদ্রূপের পাশাপাশি সমাবেশ বাঙ্গালী ছাড়া ভারতের আর কোনো জাতির রামায়ণে? তাহাদের মনে?

জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন, তখনকার দিনে এই রামায়ণ মহাভারত এই ছিল আমাদের পড়ার বই। এত গল্পের বই, ছবির বই কি তোমাদের মত আমরা চোখে দেখতে পেয়েছি? কাঠের খোদাই সেই সব ছবিতে দেখতাম আমরা পা'জামা ঘাগরা-পরা রামসীতাকে। আজ তোমরা রামায়ণ-মহাভারতকে বলো গাঁজাখুরী গল্প! হল কি দেশের?

ও সব আজ কাল কে পড়ে?—অরুণ তেমনি হাসিয়া বলিল।

পড়ো কি তবে?—লিজিণ্ডস্ অব্ গ্রীস এণ্ড রোম্, কিং আর্থার এণ্ড দি রাউণ্ড টেব্‌ল, এ্যারেবিয়ান্ নাইট্‌স্;—আর রামায়ণ, মহাভারতই বাদ? চমৎকার ইউনিভারসিটির ব্যবস্থা। তবু দীনেশবাবুকে দক্ষিণা পাইয়ে দেবার জন্য স্যর আশুতোষ 'রামায়ণী কথা' পাঠ্য করেছিলেন। কিন্তু তোমরাও হয়েছ তেমনি—বুঝলেও না কি জিনিস তোমাদের ছিল, কি জিনিস তোমরা হারালে।

পৌরাণিক ভারতবর্ষের কল্পনাময় চিত্র জ্ঞানেব মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে—অযোধ্যা, বিন্ধ্যপর্বত, দণ্ডকারণ্য, অশোকবন, সীতাব বনবাস, কুরুক্ষেত্রের সেই পার্থসারথি, পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ, সেই অনেক বাহুবক্ত্র নয়ন বিশ্বরূপ, মহাপ্রস্থানের পথে বিলীয়মান মূর্তি-সমূহ—তারপর? ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথে ভারতাত্মার মহাভিক্রামণ। শতাব্দী শতাব্দী ব্যাপী গম্ভীর বিভাবরী জুড়িয়া এ কোন্ তপস্যা? কোথায় তাহার শেষ, কিসে সিদ্ধি?

জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী ভুলিয়া যান অরুণকে, কমলাকে,—হৈমকেও। কেমন অদ্ভুত ঠেকে যেন অরুণের চক্ষেও তাহার পিতাকে।

কিন্তু চমক ভাঙিয়া যায়। জ্ঞান চৌধুরী বলেন: আচ্ছা, এবার পরীক্ষা শেষ হোক্। তোমাকে সাতপুকুরের ভট্টচাজ্জি মহাশয়দের বাড়ি পাঠিয়ে দোব। ক' মাস থাকবে, সংস্কৃত পড়বে।

অরুণের বিস্ময় কাটিয়া গেল, হাসি পাইল। হৈমও না হাসিয়া পারে না। সাতপুকুরে সংস্কৃত পড়িতে যাইবে অরুণ?

সাতপুকুরের ভটচাজ্জি ঠাকুরেরা সিদ্ধা মহাপুরুষের বংশধর। জগদীশ বিদ্যালঙ্কার সেই বংশের এখন সর্বপূজ্য সাধক।—চতুস্পাঠীতে তাঁহার পুত্র পৌত্রেরা, অধ্যাপনা করেন; তিনি সাধন-ভজন লইয়াই থাকেন। অশোকের গ্রেপ্তারের পরে হৈমবতী তাঁহাকে আনাইয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে। পূজা শেষে প্রশান্ত উজ্জ্বল মুখে বৃদ্ধ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে ডাকিলেন। অশ্রুমুখী হৈমবতীকে কহিলেন, কেঁদো না মা। ভগবতীর কৃপায় এবার অশোকেব বিপদ নেই। আর অত ভয় কেন মা?,—পৃথিবীতে তাঁব কাজ ছাডা কারো কাজ আমরা কবতে পারি কি?—জ্ঞানশঙ্কবকেও বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর বুঝাইলেন—সকল কাজই তাঁহার সাধনা। অশোকের এই দুঃসাহসিকতা,—মহাশক্তিব সাধনা নয়তো কি ইহা?

প্রশান্ত, স্থির, স্বল্পভাষী মানুষ তিনি, কথায় তাঁহার একটা নিশ্চয়তা আছে। হৈমবতীও জ্ঞান তাহাতে আশ্বাস পাইয়াছিলেন। আর সত্যই অশোক মুক্তিও পাইল।

অশোকের মুক্তির পর হৈমবতী মানত মত সাতপুকুরে গিয়া পূজা দিয়া আসিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞানকে বলিয়াছে সেই অধ্যাপক বাড়ির অধ্যয়ন অধ্যাপনা, শুচি নিয়মের কথা। জ্ঞানের মনে পড়িয়াছে তাঁহার মাতুল গৃহের কথা। সেই গৃহও চতুস্পাঠী ছিল, আচার নিষ্ঠায় সুন্দর ছিল তাঁহাদের জীবনযাত্রা। কিন্তু মামাতোভাই ইংরেজি পড়িয়া পাশ করিল। তারপর ডাক্তারি কিছুটা

পড়িয়াই চা বাগানে ডাক্তার হইয়া চলিয়া গেল। 'জ্যোতিষী ভট্চাজ্জিদের ভিটায়' এখন জঙ্গলে ছাইয়া যাইতেছে। সাতপুকুরের ভট্চাজ্জি ঠাকুরদের গৃহের শ্রী ও অনাড়ম্বরতা, প্রাচীন বংশের অধ্যয়ন অধ্যাপনা, পূজা অর্চনা, সাধনা আরাধনা, পুরুষদের সুশৃংখল সংযত জীবনযাত্রা. মেয়েদের আচার নিষ্ঠ সংসার নির্বাহ,—এমনি একটা পবিত্র চিত্র হৈমর কথা শুনিতে শুনিতে জ্ঞানের চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ভারতবর্ষের বিলীয়মান জীবন-ধর্মের একটা বর্তমান কালীন রূপ-কল্পনা তাঁহাকে নূতন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা কি শেষ হইয়া গেল? ইহা কি শেষ হইবার মত—এই জীবন-যাত্রা, এই জীবন-সাধনা? গুরুগৃহে শিক্ষালাভের দ্বারা এই জীবন-ধর্ম আয়ত্ত না করিয়া, চা বাগানের ডাক্তার কিংবা পাটের অফিসের বড়বাবু হইলেই কি জীবন সার্থক হয়? দেশ বা জাতি ধন্য হয়? আর গুরুগৃহে শিক্ষায় শৃঙ্খলায় জীবন গঠন না করিলে শুধু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইলেই বা কি হইবে?—বইএর বোঝা ঘাড়ে, কথার জোয়ার বহে,—বড় জোর অমর বা অশোকের মত দিশাহারা হয় সে মানুষ। এই জন্যই গুরুগৃহে পাঠ লইতে হয়। স্কুল হইতে, বই হইতে,—হাঁ একালের সভা পরিষদ লাইব্রেরী হইতেই বা সাধ্য কি সেই জীবন-ধর্ম কেহ আয়ত্ত করে?

জ্ঞানশঙ্করও সত্যই ভাবেন—অরুণ কিছুকাল সেই শৃঙ্খলা সংযমের মধ্যে বাস করিলে ভালো হয়। অরুণ কেন, জ্ঞান চৌধুরী বলেন অবসর থাকিলে তিনি নিজেও যাইতেন। হাসিতেছে কেন অরুণ কমলা হৈম? সত্যই, ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম তাঁহার, কিন্তু কি জানেন তিনি শাস্ত্রের, বেদ পুরাণ উপনিষদ দর্শনের? ন্যায়ের তিনি কিছুই প্রায় পড়েন নাই,—বাঙালী ব্রাহ্মণ নব্য ন্যায়ের জ্ঞান রাখেন না, ইহা কি লজ্জার কথা নয়? সাংখ্যের যোগের বেদান্তেরই বা কি পড়িয়াছেন তিনি? তাঁহার বিদ্যা

বাঙলা অনুবাদ—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের ফেলোশিপের লেক্‌চর, তিলকের গীতা. রহস্য ; পল্লবগ্রাহিতা ইহাকেই বলে। এই সব কঠিন বিদ্যা এইভাবে আয়ত্ত করা যায় না। অধ্যাপকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে হয়। এই সংসারের ভার বহন করিতে করিতে সে সুযোগ আর জ্ঞানশঙ্করের জুটিল কোথায় ? ওকালতির নেশাই কি কম সর্বনাশা ?—একটা আইনের প্যাঁচ পাইলে, কোনো একটা হাইকোর্টের নূতন নজির মিলিলে অমনি উহার নেশা জাগিয়া যায়।...সংসারের ভারও অবশ্য দিনে দিনে বাড়িয়া যাইতেছে—অফুরন্ত কর্তব্যের ভার। এখানে এই সংসার, আর চিত্রিসারে পদ্মার মুখে চৌধুরীদের ভদ্রাসন কাঁপিতেছে। একা কাদম্বিনী সেই বিধবা মেয়েটিকে লইয়া তাহা পাহারা দেন, পুত্রবধূ পর্যন্ত তাঁহার গৃহে নাই। নীলমাধবের ভাঙা দেউলের ফাটল দিয়া জল পড়ে। কর্তব্য কর্তব্য, কর্তব্য—ইহাই কর্ম—ইহাই ধর্ম। কর্মই ধর্ম, জ্ঞান চৌধুরী—কি তাহা জানেন না ? তিলকের গীতা-রহস্য তো তিনি নিবর্থক পড়েন নাই। আর কর্ম যতদিন আছে ততদিন কে মুক্তি দিবে তাঁহাকে ? না হইলে জ্ঞানশঙ্করও তো এতদিনে অবসরের আস্বাদন লাভ করিতে পারিতেন। অশোক এখন আর ছোটটি নাই—সে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিত,—দাঁড়াইল না, আর দাঁড়াইবেও না। এই সমাজ, এই সভ্যতা, এই আদর্শ, কোনোটাই সে মানে না—সে বলশেভিক। অশোকই যদি এই সমস্ত অগ্রাহ্য করিবে তবে আর কে তাহা রক্ষা করিবে ?...

সুরেশ্বর চৌধুরী পাটের ব্যবসায়ে অর্থার্জন করিতেছে, অতুল সরকারের চাকরীতে উন্নতি করিতেছে। তাহারা নিজ নিজ স্বার্থই চিনে, চিত্রিসারের ভদ্রাসনের জন্যও তাহাদের মমতা নাই। অমরও সংসারের বিষয়ে প্রায় নির্বিকার—অথচ পৃথিবীর সর্ব বিষয়ে তাহার ঔৎসুক্য। আপনার স্বার্থকে নয়, আপনার স্বাতন্ত্র্যকেই বরং সে বড় বলিয়া জানিয়াছে।

অমর মনে করে—সে যদি বিজাতীয়া ভিন্নধর্মীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সেই বাগ্‌দত্তা পাত্রীকে জ্ঞান চৌধুরী চিত্রসারের চৌধুরী বাড়ির বধূ হিসাবে গ্রহণ করিতেন না, কাদম্বিনী তাঁহাকে আপনার পুত্রবধূ বলিয়া বরণ করিতেন না, তাহাও অমর বুঝিয়াছে। শান্তা বিলাত গিয়াছে, অমর তাহার সঙ্গে গেল না, অন্যত্র বিবাহও সে করিবে না। অশোকের বিদ্রূপও সে গায়ে মাখে না, কারণ সে অশোকের মত উন্মাদ নয়; কোনো নেশায় তাহাকে পায় না মাতার জন্য, কাকার জন্য, ব্যক্তিগত একটা শ্রদ্ধা তাহার আছে। সে শ্রদ্ধা তাঁহাদের মতামতের প্রতি নয়; শ্রদ্ধা তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের জন্য। কিন্তু অমর সমাজ সংসারের নিকট যখন দায়িত্ব বোধ করে না,—জ্ঞানইবা তখন কেমন করিয়া তাহার উপর চৌধুরী বংশের দায়িত্ব চাপাইয়া দিবেন?—কোন নীতির জোরে? না, অমরও নয়, সংসারে জ্ঞানশঙ্করের একমাত্র আপনার ছিল তাহার আপন আত্মজ,—যাহার উপর জ্ঞান চাপাইতে পারিতেন নিজের সমস্ত দায়িত্বভার—সে তাহা গ্রহণও করিতে পারিত! আর কে আছে তেমন? অরুণ—? অরুণ—? সেওতো তাঁহার তেমনি আপনার, কিন্তু সে কি অশোক?

অরুণের দীর্ঘ উন্নত দেহ, সবল, সুদৃঢ় গঠন আজ জ্ঞান চৌধুরীর নূতন করিয়া চক্ষে পড়িল। পূর্বেও তাহাকে তিনি দেখিয়াছেন,—তখন দেখিতেন—খেলায় অরুণ মাতিয়া ফিরে, শরীরও হইতেছে খেলোয়াড়ের মতন। কিন্তু আজ দেখিয়া চমকিত হইলেন—অরুণ তো বালক নাই আর। বলিষ্ঠ, সুদৃঢ় পুরুষ হইয়া উঠিতেছে সে; সে তুচ্ছ করিবার মত মানুষ নয়। জ্ঞান চৌধুরী এতদিন কি তাহা লক্ষ্যও করিবার সময় পান নাই? বড় লজ্জার কথা, বড় অন্যায় কথা। অমর কি তবে মিথ্যা বলে না—বিলাতে জন্মিলে অরুণ হইত লর্ড ক্লাইব, কিংবা নিলিল

রোডস্। 'বিলাতে জন্মিলে,'—কিন্তু এ দেশে জন্মিয়া অরুণ যে রামায়ণ মহাভারতও পড়িল না! ইহাই কি তুচ্ছ করিবার মত? তাহাকে এই দেশের মানুষ হইতে হইবে—কমলার মত হইতে হইবে শিক্ষাদীক্ষায়।

শরতের ডাক শোনা গেল বাহিরের ঘর হইতে। জ্ঞান চৌধুরী আর অরুণের লেখাপড়ার সংবাদ লইতে পারিলেন না। ওকালতির পরে সে সময়ও তাঁহার নাই। মক্কেলেরা বলে—তিনি নাকি দুর্লভ হইয়া উঠিতেছেন; ইস্কুল, কলেজ কো-অপারেটিভ্ ও ব্যাংক আর লাইব্রেরী, হিন্দু মিশন প্রভৃতি নানা সামাজিক কাজেই নাকি তিনি ব্যস্ত। মক্কেলেরা যাহা বলে তাহা বুঝিয়া দেখা উচিত; জ্ঞান চৌধুরী জানেন তাঁহার আয় এই বৎসর আর বৃদ্ধির দিকে যায় নাই, থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারই জুনিয়র কুমুদের হাতে গিয়া তাঁহার মক্কেলদের কাজ জমিতেছে। সেখানে মক্কেলেরা অনুযোগ করিতেছে—জ্ঞান বাবুকে আর কাজে পাওয়া যায় না। কুমুদের পশার বাড়িতেছে, তাহা ভালোই; জ্ঞান চৌধুরীর কে আছে যে, তাঁহার পশার লইবে? অরুণ?…হাঁ, জ্ঞান চৌধুরী এইবার ভাবিলেন—অরুণও তো ছোটটি নাই। না, জ্ঞান চৌধুরা অরুণকে অবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন—অরুণ নির্ব্বোধও নয়। অশোকের অপেক্ষা হয়ত পড়াশুনায় কম মনোযোগী, হয়ত তেমন তীক্ষ্নবুদ্ধি সে নয়। কিন্তু সে হয়ত বেশি নির্ভরযোগ্য। এমনি ছিল কমলাও অপরিপক্ক-বুদ্ধি, যেমন অপরিপক্ক আজও তাঁহার কন্যা অমিতা—'পাগলী অমি'। অথচ নির্ভরযোগ্যা কমলা সংসারের পক্ষে। তেমনি হয়ত জ্ঞান চৌধুরীর পুত্র অরুণও পিতার সহায় হইতে পারিত। পারিত কেন, এখনো সে পারে। অন্তত কয় বৎসর পরেই পারিবে। সমুন্নত দেহ, দৃক্‌পাতহীন বলিষ্ঠ প্রকৃতি তাহার;

সে কল্পনাকুশল নয়, স্বপ্নাতুর নয়, সহজ অকুণ্ঠিত মানুষ। যাহারা সংসারকে গ্রহণ করে, স্বীকার করে, পালন করে; সবল সুস্থির মন লইয়া সংসারে প্রবেশ করে—আর উত্তীর্ণ হয়। জ্ঞান চৌধুরীর মনে হইল—আবর্তময় এ কালের স্রোতের মধ্যে হয়ত ইহারাই ভাসিয়া যায় না—জ্ঞান চৌধুরীর হাত হইতেও ভার গ্রহণ করিবে হয়ত অরুণই।

জ্ঞানশঙ্কর তথাপি অরুণের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিলেন না। হৈমও পারিল না অরুণকে আপনার করিয়া লইতে। পারিবে কিরূপে? কমলা আসিয়াছে—তাহার সন্তান সম্ভাবনাও। হৈম'র ব্যস্ততা তাহাকে লইয়া। কয়দিন পরেই সরযূ ও জামাতা নৃপেন্দ্র আসিবে—হঠাৎ নানা সমস্যা দেখা দিতেছে। জ্ঞানেরও সময় কমলাকে পাইলেই ভালো কাটে —বিশেষ করিয়া অমি' যখন নিকটে নাই। সেই বাক্‌চতুরা সপ্রতিভা বালিকা কমলা শ্বশুর গৃহের নানা আয়োজনের মধ্যে কেমন একটা শ্রী ও হ্রী অর্জন করিয়াছে,—জ্ঞান চৌধুরী তাহা দেখিয়া যেন আপনার মনেই অনেক বল আর অনেক তৃপ্তি লাভ করেন। অমর অশোকের সমাজ সংসারের প্রতি অনাস্থাতেই বা তিনি নিজ ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা হারাইবেন কেন?—এই তো কমলা আছে, অমিতা আছে, আছে অরুণ। আর অশোক বা অমরই কি একেবারে হৃদয়হীন কিংবা বুদ্ধিহীন?

নীল নির্মল একখণ্ড আকাশের আভাস জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী তাঁহার সম্মুখে দেখেন।

৫

অনেকটা আশ্বস্ত-চিত্তে কাদম্বিনী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন,—জ্ঞান চৌধুরী অমরের বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই ; অমরও সম্ভবত তাহার মাতা ও পিতৃব্যের মতামত অগ্রাহ্য করিবে না। কাদম্বিনী অমরকে যাহা বলিতে পারিতেন না, বলিয়া বুঝাইতে পারিতেন, না, জ্ঞান তাহা অমরকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। কাদম্বিনী মনে মনে কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন। এমন করিয়া এমন সুদৃঢ় ভাবে,—অথচ এমন অভিভাবকের আত্মীয়তা মাখা দায়িত্ববোধ লইয়া,—কে আর পারিত অমরকে বুঝাইতে ?—অমরের বিবাহ শুধু তো তাহার একার অমরের ব্যাপার নয়। তাঁহার স্ত্রীই তো শুধু হইবে না শান্তা, সঙ্গে সঙ্গে সে যে হইবে কাদম্বিনীর পুত্রবধূ, হইবে চৌধুরী বংশের ভাবী গৃহলক্ষ্মী, যে খানেই থাকুক তাহারা, তাহারা যে চিত্রিসারের চৌধুরী। সেই ভদ্রাসনের অধিকার ও দায়িত্ব জন্মাবধি তাহারা লাভ করিয়াছে, আর মৃত্যুকালে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হাতে তাহা অর্পণ করিয়া না গেলে তাহাদের মুক্তি কোথায় ?

অমর অবশ্য তর্ক করিয়াছে ;—তর্ক করা তাহার নিয়ম। বিশেষত জ্ঞান চৌধুরীর সঙ্গে যে কোন বিষয়ে হোক একটা তর্ক না জুড়িয়া দিতে পারিলে সে আরাম পায় না। কাকার তর্ক বরাবরই হাসিতে গল্পে, নানা সরস যুক্তিতে উজ্জ্বল স্বচ্ছন্দ। বয়স ও সম্পর্কের ব্যবধান জ্ঞান চৌধুরীরও মানিবার অবসর হয় নাই, অমরেরও তাহা মানিবার অভ্যাস হয় নাই। কাদম্বিনী তাহাতে বিশেষ বিস্মিত হইবারও সুযোগ পান নাই। এই পরিবেশই তাঁহার চক্ষে স্বাভাবিক। জ্ঞান এমনিতর

মানুষ, তাঁহার সম্মুখে কাহার সাধ্য স্বচ্ছন্দ না বোধ করিবে? কাদম্বিনীর নিজের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, তিনি ছিলেন প্রায় জ্ঞানের সমবয়স্ক—একটু বড়। বধূ বয়সে মহেশ্বরী ও জ্ঞানই ছিলেন তাঁহার ভরসা— বিভূতি শঙ্কর ঘরের মধ্যে কি হইতেছে তাহা খোঁজও রাখিতেন না। লোকে বলে—তাঁহার অমরও নাকি জ্ঞানশঙ্করের মত বুদ্ধিমান্—কাদম্বিনী কথাটি সগর্বে শুনিয়াছেন। কিন্তু এখনো যে অমর বড় বেশি ভাবনাহীন, কোন জিনিসেই যেন তাহার তেমন আগ্রহ নাই। মমতা তাহার আছে, কর্তব্যও সে করে; কিন্তু তাহার তেমন বিশ্বাস নাই কোন কিছুতে। বাড়ি ঘর, বংশগর্ব, সমাজ সংসার, সবই যেন অমরের নিকটে সাধারণ জিনিস। সে বলিবে—কাদম্বিনী ও জ্ঞান চৌধুরী মিছামিছি সেই সবে কেন এত গুরুত্ব দেন, এত তাহা যায় যায় বলিয়া বিচলিত হন। যাইবে না তো কি? চিরদিন থাকে কিছু? থাকিবার মত কী জিনিস ইহা? কোন্ কালের ভাঙা ভৌমিকত্বের নষ্ট-কোষ্ঠী চৌধুরীদের নাম, আর এই বাঁশ বনের মশার বাসা, সাপ-ব্যাঙের রাজ্য চিত্রিসারের ভদ্রাসন। কাদম্বিনী জানেন—অমরের কথার এইরূপই রীতি, কিন্তু তাই বলিয়া অতটা অমর এই সব অমান্যও করে না। তাহা করিলে সে অশোকের মত স্বরাজ স্বাধীনতার নামে মাতিয়া উঠিত। কিন্তু অমরের তাহাও ধাতে নাই। সে বলিয়াই খুশী। তারপর করিবে নিজ কর্তব্য; আর মনে মনে মমতা দিয়াই সব কিছু করে। মায়ের জন্য, বোনের জন্য, কাকার জন্য, অশোকের জন্য, কত কিছু সে করিতে চায়। এ বাড়ির কিছুই সে মানে না বলিলে হইবে কি? বাড়ির কাহাকেও সে সত্য সত্যই অমান্যও করিতে চাহে না।

তাই তর্ক করিলে হইবে কি, অমর অমান্য করিবে না জ্ঞান চৌধুরীকে,

তুচ্ছ করিবে না কাদম্বিনীর ইচ্ছাকে। এবারও অমর তেমনি হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া তর্ক করিয়াছে—যেন কথাটা অত্যন্ত সাধারণ, লঘু হাস্যে বুঝিবার মত, লঘুচিত্তে গ্রহণ করিবার মত। আর যখন সে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল তখনও দেখিয়া বুঝিবার সাধ্য নাই সে ক্ষুণ্ণ হইল কি না। হয়ত আসলে সত্যই সে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ, কোনো জিনিসই তত প্রাণ মনে আঁকড়াইয়া ধরিবার মত মানুষ অমর নয়,—বিভূতি শঙ্করও তেমন মানুষ ছিলেন না। হয়ত অমর তাহার পিতার নিকট হইতে এই গুণটুকু পাইয়াছে—সর্বনাশা গুণ, মারাত্মক গুণ, কোনো কিছুতে তিনি ডুবিয়া যাইতেন না। বিষয়ে ব্যবসায়ে নয়, ঘর সংসারে নয়,—পত্নী পুত্রতেও নয়। সকলকেই ভালোবাসিতেন, কিন্তু কোথাও যেন আবদ্ধ হন নাই। অমরও বুঝি আবদ্ধ হয় না, তাই সে অশোককে বরাবর পরিহাস করে, 'অত মাতামাতি করবার কি স্বরাজের নামে, গরীবের দুঃখ বলে?' নিজের বিবাহ লইয়াও তাই অত সহজে সে গল্প করিতে পারিল —ঠাট্টা করিতে পারিল। হয়ত সে বাড়ির বাধায় ততটা ক্ষুণ্ণও হয় নাই—ভালোবাসিয়া উন্মাদ হইবার মত মানুষ নাকি অমর? কেমন বরাবরের মত হাসিয়াই সে জ্ঞানের নিকট হইতে, হৈমবতীর নিকট হইতে, মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিল: 'এসব কথার জন্য এত টাকা খরচ করে এতদূর আসবার কি দরকার ছিল? তবে কয়দিন ঘুরে গেলাম—তা মন্দ নয়।' কোন ক্ষোভ নাই তাহার। সত্যই যে সে শান্তাকে ভলোবাসিয়াছে, তাহাও বলিবার উপায় নাই। ভালোবাসিলে অত স্বচ্ছন্দে কি তাহাদের আপত্তি মানিয়া লইত?

কাদম্বিনী নিজের মনে মনে বুঝিতে চাহিলেন—আসলে অমর শান্তাকে তত ভালোবাসে নাই। কথাটা ভাবিয়া তিনি যেন একটা আশ্বাস পাইতে চাহিলেন, একটা আরামও নিজের মনে মনে পাইলেন। তাঁহার অমর অপর কাহাকেও কি তেমন ভালোবাসিয়া পাগল হইতে পারে? না, তাহার সেইরূপ স্বভাবই নয়। সে বুদ্ধিমান, বিদ্বান্, হৃদয়বান্—তাঁহার মাতাকে, ভগ্নীকে ভালোবাসে, ভালোবাসে ও মান্য করে তাহার কাকাকে, আর ভালোবাসে তাহার বন্ধুর অশোককে, অন্যদের সহিত তাহার যত পরিচয়, যত সৌহার্দ্য, যত গল্প, যত আলোচনা, সবই বাহিরের। তাহারা হয়ত অমরের মনকে স্পর্শ করে মাত্র; তাহাকে বিমুগ্ধ আবদ্ধ করিতে পারে না।

হয়ত শান্তাকেও সে তেমনি ভাবেই ভালোবাসিয়াছে। শান্তা খ্রীষ্টান মেয়ে, লেখাপড়া জানে, দেখিতেও নাকি সুশ্রী, অমরের সহিত গল্প করিতে পারে, তাহার সহিত তর্ক করিতে পারে—হাঁ, নিশ্চয়ই তর্ক করিতে পারে। তর্ক যে না করিতে পারে অমরের তাহাকে ভালো লাগিবে না। কাদম্বিনীর সন্দেহ নাই—শান্তা তর্ক করিতে পারে, আর তর্ক করিতে পারে বলিয়াই অমর তাহাকে পছন্দ করিয়াছে। তারপর শান্তা বিলাত চলিয়াছে,—অমরেরও বিলাতের খরচ খানিকটা বহন করিবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। বিলাত যাত্রার খরচ পাইলে তো কত ছেলে পূর্বে যাহাকে-তাহাকে বিবাহ করিত, ভালোবাসার প্রশ্নই উঠিত না। অমর বিলাত যাইবে, বরাবরই তাহার এই স্বপ্ন। সেই বিলাতের খরচ পাইলে সে বিবাহ করিবে না কেন—শান্তাকে? না,—কাদম্বিনী নিজেকে বুঝাইলেন,—ভালোবাসার প্রশ্ন এখানে নাই, অমরের আসল উদ্দেশ্য বিলাত যাত্রা। বেশ তো তাহাই যদি হয়, সে তো অযোগ্য পাত্র নয়, কাদম্বিনী তাহার জন্য নিজেদের সমাজেই তেমনি পাত্রী সন্ধান

করিবেন—অমরের বিলাতের খরচ আংশিক ভাবেও যাঁহারা বহন করিবেন। তবে সে পাত্রীও অমরের যোগ্যা হওয়া চাই। অমর অবশ্য এই মর্ম্মের প্রস্তাব কানেও তোলে নাই। শুনিয়াই হাসিয়া উঠিয়াছে। বলিয়াছে—'এখন বিলাত আমি যাব কি? যাবে ইন্দি, অমি'।' তারপর জানাইয়াছে, 'আমি এখানেই কিছু গবেষণা করতে পারব। অশোক যদি না যায়, বেশ টাকা জমুক, ইন্দি অমিই বিলাত যাবে।—হাসি নয়। বরং মেয়েরা গেলে নির্ভাবনা—মেম সাহেব নিয়ে ফিরবে না; চৌধুরী বাড়ির নিয়ম-কানুন উল্‌টে যাবে না।'

কাদম্বিনীর মনে পড়ে কথাটার মধ্যে তো শুধু চৌধুরী বাড়ির নিয়ম কানুনের উপরই খোঁচা ছিল না,—অমর তাহা বরাবরই দিয়া থাকে;—উহার মধ্যে আরও একটি কথাও উহ্য রহিয়াছে। শান্তা বিলাত যাইবে;—অমরের মন জুড়িয়া সেই কথাটি রহিয়াছে। শুধু বিলাতের স্বপ্ন নয়, শান্তার কথাও অমরেব মনে নানা সূত্রে জাগিয়া উঠে। আর—তাহা হইলে অমর যে শান্তাকে ভালোবাসে তাহাতেও তো সন্দেহ করা চলে না। সত্যই তো কাদম্বিনী কি করিয়া মনে করিতে পারিলেন—অমর শান্তার প্রতি আকৃষ্ট নয়? অমর অমন স্বচ্ছন্দ মনে হাসি গল্প তর্ক করিয়াছে বলিয়া; শান্তার সম্বন্ধেও অমন অকুণ্ঠ কথাবার্তা বলিয়াছে বলিয়া? অমরের যে এই রূপই স্বভাব। উহা ছাড়া অন্যরূপ কিছু করিতে পারিত নাকি অমর? মাতামাতি কান্নাকাটি রাগ ক্ষোভ—ইহা করিবে অমর? আর, তাহা করিল না বলিয়াই তাহার মা হইয়া কাদম্বিনী মনে করিলেন—অমর বুঝি আসলে বিলাত-যাত্রার আশাতেই শান্তাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল?—কাদম্বিনী নিজের নিকট নিজে যেন ছোট হইয়া গেলেন—এত ভুলও তিনি করিতে পারেন! এত অবিচার করিতেছেন তাহার অমরের প্রতি।

এইবার কাদম্বিনীর মনে হইল তিনি হয়ত ভুল করিয়াছেন—অমর সত্যই শান্তাকে ভালোবাসে। এবং তাঁহারা হয়ত অমরের প্রতি সুবিচার করেন নাই।

কিন্তু কাদম্বিনী ভুল করিলেও জ্ঞানশঙ্কর তো ভুল করিবার মত মানুষ নহেন। তিনি অবিচার করিবেন অমরের প্রতি?—যে অমরকে তিনি আপনার মত মনে করেন—সাদরে শত কথায়, শত আলোচনায় উৎসাহ দিয়া যাহাকে তিনি প্রথম মানুষ করিয়াছিলেন।—অশোককেও বুঝি তিনি এত আনন্দ এত আশার সহিত কোনোদিন পড়াশুনায় উৎসাহ দেন নাই। না, জ্ঞান চৌধুরী যাহা করিয়াছেন তাহাতে কাদম্বিনী সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন;—এমন সুবিবেচনা ও ন্যায়বোধ আর কাহার আছে? কাদম্বিনীর সন্দেহ নাই—জ্ঞানশঙ্কর ঠিক কাজই করিয়াছেন। —অবশ্য অমর অসুখী হইবে। যতই হাস্যমুখে অমর বিদায় লউক, অসুখী হইয়াই অমর তাহার কর্মস্থলে ফিরিয়া গিয়াছে। হয়ত তাই সে বিলাত যাত্রার কথায় এখন আর কর্ণপাত করিতে চাহে নাই।—হয়ত সে এই চৌধুরী বাড়িতেও আর পদার্পণ করিতে চাহিবে না। কিন্তু না, তাহা হয় না! অত অবিবেচক অমর নয়। সে কি জানে না—তাহার মাতা এই বিবাহ কি করিয়া অনুমোদন করিবেন? কি করিয়া অনুমোদন করিবেন কাদম্বিনী যখন জ্ঞান চৌধুরী বুঝিয়া-শুঝিয়া অন্যায়-বোধে এই বিবাহে আপত্তি করিয়াছেন?

কাদম্বিনী কি করিবেন?…অমর অসুখী হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

চিত্রিসারের গৃহে কাদম্বিনীর মন দিন পনের'র মধ্যেই দুইটি কথায় গিয়া পৌঁছিল—তিনি অমরের প্রতি অবিচার করিলেও জ্ঞান চৌধুরী অন্যায় করিতে পারেন না, কিন্তু—অমর অসুখী হইয়াছে।

মাত্র দিন পনের কাদম্বিনী ঘর দুয়ার ছাড়িয়া গিয়াছিলেন—ইহার মধ্যে বাড়ির এ কি শ্রী হইল? ইন্দুমতী বাড়িতে ছিল, কিন্তু ইন্দু বুঝি দেখিতে-শুনিতে পারে নাই। কাদম্বিনী না থাকিলেই কাজে শিথিলতা দেখাইবে, ইন্দু সেরূপ প্রকৃতির মেয়ে নয়। কি করিতেছিল তাহা হইলে ইন্দুমতী? শরীর ভালো নাই বুঝি? কাদম্বিনী নিজেকে বুঝাইলেন—ইন্দুর শরীরই ভালো যাইতেছে না। সে কাজ একটু কম করুক, এখন তো তিনি নিজে আসিয়া গিয়াছেন। বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য অত ব্যস্ত হইতেছে কেন ইন্দু; সবইতো পরিচ্ছন্ন আছে। এই সময়ে এমনি একটু দেখায়,—হেমন্তের শেষে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, ডাল-পালা খালি, তাই চারিদিকে একটা শূন্য ভাব। দিন ছোট ও রাত্রি বড় হইতেছে। এ সময়ে বাড়ি ঘর এইরূপই ম্লান দেখায়। ইন্দু যতটুকু পারে পাঠশালা দেখুক।

দিনে পাড়া-প্রতিবেশিনীরা নতুন দি'র নিকটে আসিয়া জুটে। কিন্তু রাত্রে কাদম্বিনী বড় একা পড়িয়া যান—কিছুতেই ঘুম পায় না। আর দিনেও বারবার কথাটা মাথায় ঘুরিয়া বেড়ায়—অসুখী হইল তাহার অমর। এক একবার রাগ হয় তাঁহার সেই অজ্ঞাত মেয়ে শান্তার উপর। কেমন মেয়ে সে? কেমন? সে কি জানে না—অমর হিন্দু ব্রাহ্মণ? সে কি জানে না—অমর তাহার মাতার একমাত্র পুত্র?—কত আনন্দের ও কত বেদনার ধন? সে কি জানে না—অমর তাহার কাকার কত আশার স্থল—তাহার বংশের কত গৌরবের উত্তরাধিকারী? নিজেকে কাদম্বিনী বুঝান—ইহা শান্তার জানার প্রয়োজন নাই। তাহারা অন্য বর্ণের, অন্য সমাজের মানুষ;—সেখানে মা-বাপেরই কথা থাকে না, আর কাকা আর বংশ-গরিমা!...আবার চিন্তা ঘুরিয়া যায়

কাদম্বিনীর—অমর কি করিয়া এই সত্য বিস্মৃত হইল? সত্যই কি বিস্মৃত হইয়াছে অমর? কিন্তু বিস্মৃত হউক, যাহাই হউক—অমর অসুখী হইয়াছে।

কথাটা কি আলোচনা করা যায় কাহারও সহিত? তাহা হইলেও কাদম্বিনীর মনের ভা‍ একটু লাঘব হইত। গ্রামের কেহ এখনো অমরের এই প্রস্তাব জানে না। একা ইন্দুমতী জানে:—তাহার সহিত কি কথাটা আলোচনা করা যায়? কাদম্বিনী বুঝেন, যায় না। ইন্দুর সহিত অমরের কথা, শান্তার কথা তিনি বলিবেন না। বিধবা মানুষ ইন্দু—অভাগিনী। কেন তাহাকে সংসারের সেই সব কথার মধ্যে টানিয়া আনা, ও নানা জটিলতার মধ্যে জড়ানো? কোনো দিকেই তো ইন্দুর আনন্দের সান্ত্বনার কিছু নাই। তাহাকে এই সংসারের দশজনের কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়া সার্থকতা লাভ করিতে হইবে! ইহা ছাড়া পথ কি?

়াটমন্দিরের পাঠশালা ইন্দু দেখিতেছে। আর পড়িতেছে নানা বই। পড়িবার নেশা ইন্দুকে পাইয়াছে। কিন্তু গল্প উপন্যাস বেশি না পড়িয়া মহাভারত, রামায়ণই সে আরও বেশি পড়ুক। ভাগবত ও 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' আছে, 'অমিয় নিমাই চরিত' এবার লইয়া আসিয়াছেন কাদম্বিনী। চোখে কম দেখিতে পান কাদম্বিনী, চশমা এবার বদলাইতে হইবে, তাঁহাকে এই ধর্মগ্রন্থগুলি পড়িয়া শোনাক ইন্দু। ধর্মগ্রন্থ ছাড়া কি আছে আর তাহার আশ্রয়?

ইন্দুমতীকে নানো কর্ম্মের মধ্যে টানিয়া লইয়াও, কাদম্বিনী নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। রাত্রিতে ইন্দুমতীর চিন্তাটাও আসিয়া জুটে।

হঠাৎ কয়েকদিনের জন্য আসিল অশোক—জ্যেঠাইমা'র সহিত ঝগড়া করিবে। কোন্ অধিকারে তাঁহারা বাধা দিলেন অমরদা'র

শান্তার সঙ্গে বিবাহে? অশোকের প্রকৃতি কাদম্বিনী ভালো করিয়া জানেন। চিরদিনের মত স্নেহের অত্যাচার সহিয়াই হাসিয়া উত্তর দিতেছিলেন: অধিকার আবার কি? অন্যায় যে।

কিন্তু হাসিও উত্তর কোনটাই যেন তেমন স্বচ্ছন্দ হইয়া ফুটিল না। চিরদিনের মতই অশোকও ছাড়িল না: কে বল্‌ল অন্যায়?

বলতে হয় নাকি আবার! তারা খৃষ্টান, আমরা ব্রাহ্মণ—এ কথা কি আবার বুঝিয়ে বলতে হয়।

কালী সিংহীর মহাভারত সম্মুখে রহিয়াছে! অশোক তাহা দেখাইয়া বলিল: আপনাদের কোন মুনি-ঋষি, দেব-দেবী এই ব্যবস্থা দিয়েছেন—দেখান ওখান থেকে।

কাদম্বিনী মনে মনে কুণ্ঠিতা হন। মুখে তথাপি হাসিয়া বলেন: সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা?

তুলনা নয় কেন?

সে কালের মানুষের পুণ্যবল ছিল।

তাই দশ হাজার বৎসর তপস্যার পরে যেই তপোবনের কোন এক প্রান্তে কোনো এক মেনকা-রম্ভা দেখা দিল, অমনি তাকে না দেখেও মহর্ষিদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। কলকাতায় ওদের ছেড়ে দিলে এই পুণ্য বলের জন্য মেয়েরা পথে বেরুতে পারত না।

কাদম্বিনীর নিকট অশোকের অমরের এই ধরণের কথা নূতন নয়, তথাপি কাদম্বিনী রাগ করিয়া বলেন, দূর হও!— ইন্দু রহিয়াছে তাহাও কি লক্ষ্য নাই।

অশোক বলিল: তবে ওকে এসব পড়তে দিলেন কেন? অহল্যা দ্রৌপদী তারা কুন্তী মন্দোদরী—আপনাদের কোন্ কন্যাটি আপনাদের বিচারে পার পাবেন? মহর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষিদের পুণ্যবল আছে, থাকুক।

কিন্তু অমরদা'র ও শান্তা বউদির বিবাহে বাধা দিয়াছেন আপনারা—আপনি আর বাবা,—কেন ?

অশোক কাদম্বিনীকে রাগাইবার জন্যই তর্ক করিতে লাগিল। শান্তা পূর্বেই তাহার নিকট শান্তা বউদি হইয়াছে। আর শান্তার সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা সে বলিল।

শান্তার সম্বন্ধে এই সব কথা কি কাদম্বিনী পূর্বে শোনেন নাই ? শুনিয়া এবার তিনি কিন্তু বিরক্ত বোধ করিলেন না—শান্তা বিলাতে চলিয়া গিয়াছে, আপাতত সে আর কোনরূপ গোলোযোগ ঘটাইতে পারিবে না। হয়ত সত্যই শান্তা সৎপাত্রী, সৎকুলোদ্ভবাও, হয়ত সদ্‌গুণ ও তাহার যথেষ্ট।—না হইলে অমরই কি তাহাকে পছন্দ করিত ? কিন্তু তাহাতে কি হইবে ? অমরের সহিত তাহার বিবাহ হইবে কিরূপে ? কাদম্বিনী না হয় মূর্খ, লেখাপড়া শিখেন নাই। আর তাই—অশোকের মতে—তাঁহার হিংসা—বউ কেন তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবে বিদ্যায় বুদ্ধিতে।

'হাঁ, বিদ্যায় নয় শুধু, বুদ্ধিতেও ছাড়িয়ে যাবেন শান্তা বউদি।'—শুধু হৈমবতীকে নয়, কাদম্বিনীকেও বুদ্ধিতে ছাড়াইয়া যাইবেন শান্তা—অশোক কৌতুকচ্ছলে বারে বারে কথাটা শুনাইল ;—তাই শান্তার সহিত কাদম্বিনী হৈমবতীর এত হিংসা চক্ষে না দেখিয়া। 'চক্ষে দেখলে কিন্তু ভালো না বেসে পারতেন না।'

আমাদের কি তোমাদের মত ইংরেজি চোখ, যে ইংরেজি বলিয়ে মেয়ে দেখলে আর চোখে পলক পড়বে না।

কিন্তু শুধু পরিহাস করিলে হইবে কি ? কাদম্বিনীর মনে শান্তার সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মাইয়া দিয়া গেল অশোক। আর ইন্দুর সঙ্গেও শান্তা অমরের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনার পথটা একেবারে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়া

দিয়া গেল। কাদম্বিনী তাহাতে আরাম লাভ করিলেন। একজনকে অন্তত বলিতে পারা যায় তাঁহার মনের কথা। আর শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে ইন্দুমতী।

সত্যই অমর বাবুর এই বিবাহে এত ইচ্ছা ছিল?

কাদম্বিনী বুঝাইতে চেষ্টা করেন। শ'ন্তা সুশিক্ষিতা মেয়ে'—

ইন্দু বলে: লেখাপড়া ত আপনাদের বাড়িতে আপনারা সবাই চান—

কাদম্বিনী বলেন, সত্য কথা। কিন্তু লেখাপড়াই কি মানুষের সব?

ওর যখন মত—আপনি বাধা দিলেন কেন?

বাধা!—বাধা কাদম্বিনী দিয়াছেন কি? কাদম্বিনীর মনে পড়ে! হাঁ, তিনি বাধা দিয়াছেন, তবে আপত্তি করিয়াছিলেন জ্ঞান চৌধুরী। কাদম্বিনী একা বাধা দেন নাই, দিতেনও না। অবশ্য তিনি এই বাড়ির কর্ত্রী, ঘর সংসার তাঁহাকে দেখিতে হয়। তিনি কর্তাদের দিনও দেখিয়াছেন—চৌধুরী বংশের গৌরব গর্ব কিছু কিছু তিনি আপনার বধূ-জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তবুতো তাঁহাদের সম্পদ তখন ছিল না,—ছিল শুধু নাম। আর ছিল মান, নিজেদের মর্য্যাদা-বোধ। আজ না হয় সুরেশ্বর, অতুল কাদম্বিনীকে বিশেষ মান্য করেন না, কিন্তু চৌধুরী বাড়ীর কর্ত্রী হিসাবে তাঁহাকে সসম্মানে মান্য করেন জ্ঞানশঙ্কর। কাদম্বিনীর কথা তিনি প্রাণ থাকিতে উপেক্ষা করিতেন না। কাদম্বিনী যদি বলিতেন—করুক অমর শান্তাকে বিবাহ। কাদম্বিনী জানেন তাহাতে হেঁট হইয়া যাইত জ্ঞান চৌধুরীর মাথা। তিনি দুঃখে মরিয়া যাইতেন, কিন্তু মুখে আর আপত্তি করিতেন না। চৌধুরীগোষ্ঠীর গৃহকর্ত্রী কাদম্বিনী, সাধ্য কি জ্ঞান তাঁহার কথা উপেক্ষা করেন? তাইতো কাদম্বিনী নিজেকে আরও অসহায় বোধ করিলেন। কি করিয়া তিনি মত দিবেন এইরূপ অসামাজিক বিবাহ প্রস্তাবে?

কিন্তু এই ভদ্রাসন, এই পরিবার, এই ঠাকুরসেবা, এই পুঁথিপাঠ—এই সব সত্বেও কাদম্বিনী বিস্মৃত হইবেন কি করিয়া—অমরকে তিনি অসুখী করিয়াছেন, দুঃখ দিয়াছেন। অমর যদি শান্তাকে বিবাহ না করে, তথাপি মনে করিবে তাহার পরিবার তাহার উপর অবিচার করিয়াছে—আর অবিচার করিয়াছেন তাহার মা কাদম্বিনীও।

অমর সত্যই চিত্রিসারে আসিবার সময় করিতে পারিল না। অশোকের মুক্তির পর অশোককে সে মধুখালিতে পৌছাইয়া দিল, তাহার পর চলিয়া গেল আপনার কর্ম্মস্থলে। কাদম্বিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পূজায় গিয়া বসিলেন। হে ভগবান্, একি করিলে? সত্যই কি তাঁহার অমর মায়ের সহিতও দেখা করিতে আসিল না। সত্যই কি সে মনে করে মা তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন,—ইচ্ছা করিয়া অবিচার করিয়াছেন? সত্য কি অশোকের কথা—ইহা অন্যায়? সমাজ নিয়মের নিকট, ধর্ম্মনীতির নিকট,—ইহা কাদম্বিনীর শুধু আত্মনিবেদন নয়, পুত্রের প্রতি অন্যায়, অবিচার—হয়ত বা ঈর্ষাও?

কাদম্বিনী নিজেই জানেন এই নিয়ম, এই নীতি তাঁহারই চোখের সম্মুখে বদলাইয়া যাইতেছে। অশোক তো মিথ্যা কহে নাই; আজ না হয় কাল যাইবে,—কলিকাতায় গিয়াছে, শহরে যাইতেছে, গ্রামেও যাইবে। অমর যদি আজ শান্তাকে বধূরূপে লইয়া এই চিত্রিসারের ভদ্রাসনে না আসে—অন্তত পূজার দিনে না আসে,—তাহা হইলে এই গ্রামেইবা কে তাহা লইয়া হৈ চৈ করিবে আজ? অবশ্য বারো মাসে তের পার্ব্বণ এই ভদ্রাসনে, কিন্তু শান্তা তাহাতে না থাকিলেই হইল। আরও তো আত্মীয়-পরিজন রহিয়াছে, কাদম্বিনী আছেন, ইন্দু আছে—কি প্রয়োজন শান্তার?—তবু বাড়ির বউ শান্তা, দশটি আত্মীয়ের সঙ্গে সে নৈবেদ্য

সাজাইতে বসিত না,…স্নানশুদ্ধ কাষায়বাসে ইন্দুর মত নীলমাধাবের ভোগ রাঁধিতে যাইত না; পূজার মণ্ডপে দশজনের সঙ্গে একত্র হইয়া দেবী প্রতিমাকে প্রণাম করিত না; দশটি এয়োতীর মত মাথায় সিন্দুরের রেখা আঁকিয়া সকলকার আশীর্বাদ গ্রহণ করিত না—সে কেমন হইত? কাদম্বিনী তাহাই বা কেমন করিয়া দেখিতেন? কি করিয়া দেখিতেন তাঁহার অমরের বধূ, এই বাড়ির বধূ—এই বাড়িতে পর হইয়া রহিল, পরের মত আসিল, গেল? জ্ঞানশঙ্কর বলিবেন—'এই ঘরকে সে সকলের সঙ্গে মিলিয়া আপনার করিবে না, এই গ্রামকে সকলের শুভাশুভের মধ্য দিয়া চিনিবে না,' কাদম্বিনী বুঝেন—আরত্রিক দীপ দেখাইবে না সে নীলমাধবের মন্দিরে, বিজয়ার অপরাহ্নে সে দেবী প্রতিমা বরণ করিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া কাদম্বিনীর মত বলিবে না—বলিবে না মহেশ্বরীর মত—পূর্ব্বগামিনী এই চৌধুরী গৃহকর্ত্রীদের মত—'মা, আবার এসো।'—না, কাদম্বিনী কি করিয়া সহিতেন অমর যদি শান্তার মত খ্রীষ্টান মেয়েকে বিবাহ করিত?

সে বড় অসম্ভব হইত, বড় অসম্ভব হইত।

দেবতার ভোগ লইয়া স্নানান্তে প্রবেশ করিল ইন্দুমতী। কাদম্বিনী মুখ তুলিয়া দেখিলেন তাহার স্থির ব্যথা-স্তব্ধ মুখখানি। দেখিয়াই আবার পার্ব্বতীর কথা মনে পড়িয়া গেল…যাহাকে খুশী বিবাহ করুক অমর, সে যেন বিবাহ করে আপন ধর্মের কাহাকেও।

সুমন্ত্র ইন্দিরাকে চিত্রিসারে পৌঁছাইয়া দিতে আসিল—ছুটি হইয়াছে। ইন্দি'কে পাইয়া কাদম্বিনী বাঁচিলেন। অন্তত কাহাকেও তিনি পাইলেন যাহাকে লইয়া মন ব্যস্ত হইতে পারিবে। গৃহকর্ম্মে কিছুতেই তাহার মন সম্পূর্ণ ভরিতেছিল না। কোন দিনই বুঝি সম্পূর্ণ ভরিত না। কিন্তু এখন

নানাভাবে মনে জিজ্ঞাসা জোটে—তাহার অমর অসুখী হইয়াছে। পৃথিবীতে মানুষের সুখ কোথায়? এইতো ইন্দু—অসুখী তাহার মতই বা আর কে? কিন্তু সুখীই কি কেহ তাহাকে করিতে পারিত? কাদম্বিনীই কি পারিলেন তাহাকে সুখী করিতে? অমরকেও কি কাদম্বিনী সুখী করিতে পারিতেন, যদি তিনি বলিতেন, 'না হয় তুমি স্বধর্ম্মে থাকিয়া বিধবা বিবাহ করো।—ইন্দুর মত কোনো মেয়েকে,'—অমর কি তাহাতেই সুখী হইত? ঠিক বলেন জ্ঞানশঙ্কর, 'সুখী কেহ কাহাকেও করিতে পারেনা—অন্যায়, অধর্ম না করিলেই হইল।' অন্যায় অধর্ম কি করিয়াছেন তাঁহারা অমরের প্রতি?... বড় আলো-আঁধারি তাহার মন। ইন্দিরা সেখানে বুঝি একটু আলোক লইয়া আসিবে।

বড় ভালো লাগিয়াছিল ইন্দিরার নিকট কলিকাতার পরে চিত্রিসারের এই বাড়ি। বন জঙ্গল, ঝোপ ঝাড়, সব ভালো লাগে তাহার চোখে। পিছনের বাগানের আমের চাড়াটা এই কয় মাসে এত বড় হইয়াছে। পূর্ব দিক্‌কার শিমুল গাছটা মরিয়া গিয়াছে। 'ঝোপের পথের' সরু পথ রেখাটি বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়া গিয়াছিল, দুপুরেও জায়গাটাছিল ছায়া-ঢাকা, রহস্যময়, কেমন ছম্‌ছম্‌ করিত গা।—কিন্তু তাহাতে অনেকটা বেশি আলো আসিয়া পড়িয়াছে আজ কাল। সুমন্ত্রের সঙ্গে সেই পথে চলিতে চলিতে আর গা ছম্‌ছম্‌ করে না; অথচ কেমন ভালোলাগে। পুকুরের জল আজকাল নদীটার টানে এত শীঘ্র শুকাইয়া যায়।—নদীর ঘাটে কিন্তু এখন ঢেউ নাই; স্রোত আছে খরধার, মসৃণ চকচকে ধারাল ছুরির ফলা যেন';—ইন্দিরার তাহা দেখিয়াও বড় ভালো লাগে। সুমন্ত্রকে সে টানিয়া লইয়া ফিরে।

সুমন্ত্র শহরে মানুষ, কিন্তু মধুখালি শহরই বা কি? অমরের মতে

'প্রি-ইলেকট্রিসিটি এজ্' সেখানে কাটে নাই। ঝোপ-ঝাড় গাছপালা কিছুরই সেখানেও অভাব নাই। খালবিল নাই বটে, কিন্তু নদীর অভাব কি? আর সে নদীর তুলনায় এই পদ্মাই বা কি! চিত্রিসারে অবাক্ হইবার মত বিশেষ কিছু নাই। তবু সুমন্ত্রের ভালো লাগে ঐ ছায়া ঢাকা ঝোপের পথ, এই চষা-মাঠের খোলা হাওয়া, ফসলে ভরা তাহার রূপ। তাহা ছাড়া ভালো লাগিতে চাহে তাহার আরও অনেক জিনিস—নীলমাধবের মন্দিরের সম্মুখে পঞ্চবটী তলায় বসিয়া কাদম্বিনীর মন্দির ধোয়া পোছা, পূজার আয়োজন করা, দেখিতে ভালো লাগে; ইন্দুদি'র মণ্ডপ লেপা, নিকানো-পোছানো দেখিতে ভালোলাগে; পাঠশালার মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া তাহাদের পড়া-নেওয়া দেখিতে ভালো লাগে;—মাটিতে খড়ি আঁকিয়া, সত্যই কলাপাতায় লিখিয়া ইহারা এখনো লিখিতে শিখে।—আর ভালো লাগে ইন্দিরার সঙ্গে মাঠের মধ্য দিয়া গ্রামের এ-পাড়া ও-পাড়া যাইতে; নদীর ধারে অকারণে হঠাৎ-ছুটিয়া-পালানো ইন্দিরাকে ধরিয়া ফেলিতে, কুলগাছের ডাল হইতে কুল পাড়িতে গিয়া কাঁটা ফুটিয়া জব্দ হইতে আর ইন্দিরার হাতে পায়ের কাঁটা খোলাইয়া লইতে;—ব্রাহ্মণ কন্যা ইন্দি' শূদ্রের পায়ে হাত দিতেছে—কাণ্ডটা যে কী করিতেছে সে, তাহা যত বুঝাইতে চাহে মরণ দাস, ইন্দিরা হাসিয়া তাহাতে ততই গড়াইয়া পড়ে প্রায়। আর সুমন্ত্রেরই কি হাসি গোপন করার সাধ্য হয়?—কাদম্বিনীকে সুমন্ত্র দেখিয়াছে মাঝে-মাঝে মধুখালিতে, ইন্দিরাকেও দেখিয়াছে—বুদ্ধিমতী, স্বল্পভাষী মেয়ে সে। একটু দূরে দূরেই থাকিত অশোকদা'দের নিকট হইতে। তাহাকে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতে আসিতে আসিতে তাহার সহিত সুমন্ত্রর একটু নৈকট্য ঘটিয়াছে পথে কথাবার্তায়। কিন্তু এই গ্রামের বাড়িতে না দেখিলে সুমন্ত্র বুঝি বিশ্বাসও করিত না ইন্দিরা এমন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে,

খেলিতে পারে, সুমন্ত্রকে এমন নিকটের বলিয়া স্বীকার করিতে পারে।

কিন্তু সুমন্ত্রদেরও আসল বাড়ি এই অঞ্চলে, আজ না হয় তাহারা শহরের অধিবাসী। সুরথ মিস্ত্রির ছোট ছেলে সে—বিভূতি-শঙ্কর যে সুরথ ও সুরথের পিতাকে মধুখালিতে কাঠের কাজে লইয়া যান। সেখানেই এখন তাহাদের মিস্ত্রির দোকান, কাঠের ছোট-খাট কারবার। সেই 'শূদ্রের' ছেলে সুমন্ত্র এখন চৌধুরী বাড়িতে এমন ভদ্রলোকের মত থাকিতেছে, খাইতেছে, পরিতেছে—দুই একদিন ইহা গ্রামের মানুষ সহ্য করিতে পারে, বেশি দিন তাই বলিয়া সহ্য করিবে কেন? এত সাহস কেন কাদম্বিনীর?

কাদম্বিনী কথাটা সুমন্ত্রকে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন বোধ করিতে-ছিলেন, কিন্তু কেমন পারিলেন না। সত্যই তো, শহরে তাঁহারা সুমন্ত্রকে প্রায় বাড়ির ছেলের মতই গণ্য করিতেন। সুরথের ছেলে সে, যে সুরথ কাদম্বিনীকে ডাকিত 'মা'। আহারে বিচারে একটু তফাৎ যাহা ছিল তাহাও ইদানীং অশোকের তাড়নায়—গান্ধীজীর যুগে মধুখালিতে জ্ঞান চৌধুরীর পরিবারে আর নাই। কিন্তু সে হইল শহর—ইহা চৌধুরীদের ভদ্রাসন। না, ঠাকুর দেবতা, গো ব্রাহ্মণ—এই সবের জন্য কাদম্বিনী কোনো বাধা দেখেন না। ইন্দুমতীও এখন বোঝে—আসলে মানুষ কি আর কেহ পবিত্র, কেহ অপবিত্র জন্ম ও জাতির জন্য হয়? শাস্ত্রেও ইহার বিরোধী প্রমাণ রহিয়াছে। আমরাই শুধু আচার নিয়মের নামে মানুষকে মনে করি ছোট বড়, মনে করি কোন ধর্ম্ম ছোট, কোনো ধর্ম্ম বড়।—শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ইহারা কত করিয়া এই সত্যটাই বুঝাইলেন;—আর কাদম্বিনী ও ইন্দুমতী দুজনেই বুঝিয়াছেন উহা সত্য। এই আচার বিচার শুধু মানুষকে অবিচার করিতে

শিখায়—অন্যায় দূর করিবার নামে অন্যায় বাড়াইয়া তোলে—কবে মানুষকে অসুখী—যেমন অসুখী তাঁহার অমর।...

কাদম্বিনী কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলেন না। ঘুরাইয়া বলিলেন : সুমন্ত্র, তুমি মধুখালি যাচ্ছ কবে ?

শীঘ্রই। তবে অশোকদা' বলেন—গ্রামটা দেখতে, তাই দেখছি।

এ গ্রাম আবার দেখবে কি ? গ্রাম কি ওখানেই নেই—মধুখালিতেও তা আছে।

তবে এখানে নাকি অশোকদারা কাজ করেছেন—

সেখানেও যেমন এখানেও তেমন—চরকা তাঁত সব কাঠ হয়েছে, উনুনে গিয়েছে।

সুমন্ত্র শুনিয়া উল্লসিত হয়—এই দশাই হইবে, তাহা সেও জানিত। এইজন্যই গান্ধীজীর আন্দোলন সে ছাড়িয়াছিল। স্বাধীনতা কি চরকা কাটিয়া হইবে ? তাহার জন্য চাই—আখড়া, ডন, কুস্তি, লাঠি খেলা, তরবারি খেলা।

সুমন্ত্রের আরও দুই চার দিন চিত্রিসারে দেরী হইল। কাদম্বিনী মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না—যাও! আর ইতিমধ্যে সেখানে আসিল চিত্রসারে সরযূ ও নৃপেন তাহাদের ছেলেমেয়ে শুদ্ধ। জ্যেঠাইমা'র কাছে চিত্রিসারে এই সময়ে দিনকয়েক কাটাইয়া যাইবে। তাহাদের আগমনে বোধ হয় সুমন্ত্রও বুঝিল—এই পরিবারে সে কত পর। হঠাৎ কুটম্বদের লইয়া সকলেরই ব্যস্ততা বাড়িয়া গেল বিশেষতঃ জামাই নৃপেনকে দেখিতে হয়—'বাবুর হাটের' বাবুদের বাড়ির মেজবাবুর ছেলে সে। ইন্দিরাই তবু কোনরূপে সুমন্ত্রের সহিত নিজের আচরণ অব্যাহত রাখিতে চাহিল; কিন্তু একটু শান্ত নিয়মিত হইল তাহারও ব্যবহার। প্রথম বাড়িতে আসিয়া যতটা গ্রামের সব জিনিসেই কৌতূহল জাগে এখন আর ততটা তাহার কৌতূহল জাগিবে কেন ? কোথায় যাইবে মাঠে মাঠে ? চাঞ্চল্যই

কি ভালো—তাহা ছাড়া বড়দির ছেলে খোকাকে তাহার ভালো লাগিয়াছে খুব। মধুখালি যাইবার দিন চলিয়া যাইতেছে ইহাও সুমন্ত্র বুঝিল।

সুমন্ত্র চলিয়া গেল,—বড়দি' সরযূ ও নৃপেনের সঙ্গে এক আধটুকু কথাও তাহার হইয়াছিল। ছেলেটি কে—এই বাড়িতে এত খাতির যাহার? নৃপেন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

সরযূ বলিল: কেন চেন না, দ্যাখোনি মধুখালিতে সুরথদা'র ছেলে।

সুরথদা'? সুরথদা' কে?—ও সেই মিস্ত্রির দোকান যাদের?

আমি ভাবলাম বুঝি বা তোমাদের চৌধুরী গোষ্ঠীর কেউ। কিন্তু সুরথরা তো মিস্ত্রি;—কি জাত তারা?

সরযূ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল: শূদ্রই হবে। হয়ত নমঃশূদ্র।

নৃপেন উঠিয়া বসিল: আর তার ছেলে তোমাদের বাড়িতে একেবারে চেপে বসেছে—বাবুটি হয়ে!

সরযূও মানিল, জ্যাঠাইমা বড় বেশি উহাদের বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে মা ডাকিত কিনা সুরথ মিস্ত্রি।

নৃপেন বুঝাইল: ছোটলোককে 'নাই' দিয়েছ কি মাথায় চড়ে বসেব।

সরযূও এই বিষয়ে এক মত। তাহারও কেমন ভালো লাগে নাই সুমন্ত্রের এত বেশি অকুণ্ঠিত কথাবার্তা, মেলামেশা। তাহারই বোঝা উচিত—যতই তাহাকে কাদম্বিনী হৈমবতী স্নেহ করুন, অশোক নিজের দোসর করিয়া থাকুক,—আসলে তাহারা শূদ্র। চৌধুরী বাড়িতে ঘরে দুয়ারে না ঢুকিয়া বাহিরের ঘরে থাকিলেই হইত।

সুমন্ত্র চলিয়া গিয়াছে—নৃপেন তাহাকে কিছু বলিবার সুযোগ পায় নাই। বেয়াদব ছেলেটা তাহাকে দেখিয়াই পালায়াছে—বাবুর হাটের বাবু তাঁহারা, চৌধুরীদের মত ছোটলোকের বেয়াদবী তাঁহার সহ্য করিবেন না। তবু নৃপেন ইন্দিরাকে একবার কথাটা বুঝাইয়া

দিতে চাহিল : তুমি স্কুলে পড়ো, ইন্‌টেলিজেন্ট মেয়ে। তুমি এ ছেলেটার সঙ্গে একা এলে ?—অশোক বললে বলে ? এলে তো এলে, ওকে বাড়ীতে উঠতে দিলে কেন ? আফটার অল্‌—এটা চৌধুরীদের ভদ্রাসন।

ইন্দিরা অল্প কথা বলে। জামাইবাবুর কথার ভাবটা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। কেমন যেন তাঁহার চোখের দৃষ্টিও। সংক্ষেপ জানাইল : এ সব কথা মায়ের সঙ্গেই বলবেন, তিনিই বাড়ির কর্ত্রী।

কাদম্বিনীর সহিত এই সব বিষয়ে নৃপেনের কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ইন্দিরার ভারী দেমাক্‌ !—কলিকাতায় পড়া মেয়ে বলিয়া নিশ্চয়। নৃপেন কেমন অপমানিত বোধ করিল। তাই, একবার জ্যেঠাইমা'র নিকট কথাটা তুলিল : পড়াশুনা না হয় করে ইন্দি'। কিন্তু তাই বলে এত স্বাধীনতা কি ভালো ?

কাদম্বিনী চমকিতা হইলেন। কিসের স্বাধীনতা ? ও সুমন্ত্রের কথা বলিতেছে বুঝি নৃপেন। 'সুমন্ত্র যে আমাদের আপনার লোক।'

একে ছোটলোক, তাতে আবার কলেজে পড়ে—ওর মাথা ঘুরে যাবেই তো। তার উপর আবার আপনারা বলেন 'আপনার লোক'—যেন বাড়ির ছেলে কিংবা জামাই।

বড় স্থূল কথাবার্ত্তা নৃপেন্দ্রের;—বরাবরই সে একটু স্থূল। তবে এই রূপেই কথাবার্তা বলিয়া থাকেন বাবুর হাটের বেহাইরাও। কিন্তু নৃপেন্দ্রতো জামাই, আর তত বয়স্ক নয়, একালের মানুষ। সেও জাতি লইয়া এইরূপ কথা বলে ? কাদম্বিনী কথাটা তাই তাহাকে বুঝাইতে চাহিলেন। পরে বলিলেন, দেখে ওকে ছোট লোক মনে হয় ? ওর কথাবার্তায় অভদ্রতা দেখতে পাবে ?

নৃপেন্দ্র আরও বিরক্ত হইল। শাশুড়ী ঠাকুরাণীও খুব অপ-টু-ডেট্

হইয়াছেন যে। চশমা আঁটিয়া আটচ'লায় তিনি বেথুন কলেজ চালাইতেছেন—লেডি প্রিন্‌সিপ্যাল্! ইন্দুমতী মেয়েটাও এই বৎসর দেড়েকেই বেশ অপ-টু-ডেট্ হইয়াছে। ভারী দেমাক তাহারও, নৃপেনকে দেখিলে গায়ের কাপড় আঁটিয়া টানিয়া দূরে পলাইয়া যায়। আর ওদিকে কি শোনা যাইতেছে?—অমরের সঙ্গে নাকি একটা খ্রীষ্টান মেয়ের, বিবাহ পাকা হইয়া আছে। আসলে বিবাহ হইয়া গিয়াছে—কথাটা গোপন রাখিতেছন তাহার মা। কিন্তু নৃপেন্দ্র বুঝিয়াছে—শুধু তাহাই নয়, এই ইন্দুমতী মেয়েটাও অমরের পাল্লায় পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাওয়া মানুষের চেহারা সে দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারে—সে নৃপেন্দ্র গাঙ্গুলী, বাবুর হাটের বাবুদের এখনকার ন' বাবু।

কাদম্বিনী প্রথম একটু ধৈর্য্যের সহিত বুঝাইতেছিলেন। শেষে অপমানিত বোধ করিলেন। হউক জামাই, তবু তাহারও কথাবার্ত্তায় শ্রী থাকা উচিত। একটু শক্ত হইয়া কাদম্বিনী বলিলেন: তুমি বাড়ির জামাই। একটু বুঝে শুনে কথা বলতে হয়।

স্পষ্ট কথা আমি লাট সাহেবকে বলতে জমাই না—জানেন তো আমাদের বাড়ি।

কাদম্বিনী স্থির স্বরে বলিলেন, এবাড়ীওতো জানো—আর তার মান অপমানে তোমারই মান অপমান।

আমার মান অপমান শ্বশুরবাড়ি দিয়ে নাকি?—বাবুর হাটের বাবু আমরা।

অন্য ঘর হইতে সরযূও আসিয়া ততক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে।

এবার তীক্ষ্ণ হইল কাদম্বিনীর স্বর: সে বাবুর হাটে—এ বাড়িতে নয়!

সরযূই বলিয়া উঠিল: এ বাড়িতে আছে কি আর মান-সম্ভ্রমের?

নৃপেন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিল: ছেলেরা মেম বিয়ে করছেন, বিধবারা বিবি সাজছেন। মেয়েরাই যে কি এখন করবে দেখব।

কাদম্বিনী দাঁড়াইয়া উঠিলেন: এ বাড়িতে এই ঘরের তলে বসে এই কথা বলবে তুমি, আর তা শোনবার জন্য আমি থাকব, মনে করেছ? আমি চললাম—মাথা ঠাণ্ডা হলে আবার কথা বলতে এসো।

কাদম্বিনী সারা দিন শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। ইন্দিরা দেখিয়া গেল, ইন্দুমতী ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বসিল। জানাইল: ওঁরা রাগ করে চলে যাচ্ছেন মাসীমা, ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কাদম্বিনী শুনিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিলেন। তিনি গৃহকর্ত্রী, জামাই-মেয়ে এই গৃহ হইতে রাগ করিয়া যায় যে! কি বলিবে হৈম শুনিয়া।

পাল্কী তৈয়ারী। কাদম্বিনী বলিলেন: আমার উপর রাগ করো না, নৃপেন। তুমিও এসো সবসু। নানা ঝামেলায় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে আমার।

সরযূর মন নরম হইতে চাহিতেছিল। দুইদিন শান্তিতে থাকিবে বলিয়া তাঁহারা এখানে আসিয়াছিল। জেঠাইমা ছেলেমেয়েদের আদরে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বাবুর হাটের বাবু ক্ষমা করিতে পারিবেন না। আর ক্ষমা চাহিল কোথায় কাদম্বিনী? একটু গম্ভীর হইয়া নৃপেন্দ্র বলিল: বাবা, আগেই বলে ছিলেন—যা না শ্বশুর বাড়ি, দেখবি সমাদর। তেরাত্রির বেশি শ্বশুর বাড়ি থাকা বাবুর হাটের আমাদের নিয়ম নয়।

কাদম্বিনী নীলমাধবের মন্দিরে গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন।—ঠাকুর, একি তোমার ইচ্ছা! কাদম্বিনীকে এমন করিয়া পরীক্ষা করিতেছ কেন?

সে তো বড় নয়, মহৎ নয়, বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমান্ নয়,—শুধু সে তোমার এই মন্দির, এই ঘর-সংসারকে কোন রূপে রক্ষা করিয়া পুত্র পৌত্রদের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে চায়! কাহাকেও সে বাধা দিতে চায় না, কাহাকেও অপমান করিতে চায় না;—সে-ই বাধা পায়। তা পাউক। কিন্তু তবু তুমি তাহাকে আজ বলিয়া দাও—তোমার পৃথিবীতে সত্যই কি তুমি মানুষে মানুষে এত তফাৎ করো?—কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র, কে হিন্দু, কে খ্রীষ্টান,—ইহাই কি শেষ কথা তোমার বিচারে? তোমার বিচার ইহা নয়, তাহা কাদম্বিনী জানে। এই বিচারও মানুষের। কিন্তু ইহা যে অবিচার তোমার বিরুদ্ধে। কে আজ আর এই মধুখালিতে সুমন্ত্রকে ভদ্রলোক নয় বলিয়া বলিত? কে পারিত অমরের কর্মস্থলে শান্তাকে তাহার পত্নী বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে? তথাপি শান্তাকে লইয়া সে এই গ্রামে তোমার এই মন্দির ছায়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে—কাদম্বিনী কি সহিত তাহা অমর যদি শান্তাকে বিবাহ করিত?···অথচ তুমি কি সহিতে না তাহা, হে যদুপতি, হে ভাগবতের ভগবান্। মহাভারতের মহাসারথী! তুমি সহিতে। তুমি সহিতে সুমন্ত্রকে, তুমি সহিতে অমরকে, তুমি সহিতে শান্তাকেও। আর সহিতে পারিব না তবু আমরা—'বাবুর হাটের বাবু' নৃপেন্দ্র, চৌধুরী বাড়ির কর্ত্রী কাদম্বিনী।

কোথা হইতে কোথায় ভাসিয়া যায় কাদম্বিনীর নিবেদন! অমর শান্তাকে বিবাহ করে নাই—করিবে না। কাহাকে সে অমান্য করিবে না, মাতাকে সে অসুখী করিবে না; তবু অপমানিতা হইবেন কাদম্বিনী। অসুখী হইয়াছে অমর!—কিন্তু সুখী হইল কে? কাদম্বিনী—তাঁহার এই ভদ্রাসনের ক্রিয়াকর্ম লইয়া? জ্ঞান চৌধুরী—তাঁহার সমাজের এই নিয়ম-মর্যাদা লইয়া?

৬

বইখানা জ্ঞানশঙ্করের এতদিনে পড়া হইয়া গেল। রুশ ভাষ্যকারের ভাষ্য সমেত এই বইটা নানা বাধা ডিঙাইয়া অশোকের হাতে আসিয়াছিল। তাহা পাঠেই নাকি অশোক নূতন আলোর সন্ধান পাইল। অমর বলিয়াছে যে, তাহাও সত্য নয়; এই আলোকের সন্ধান অশোক পাইয়াছে অনেক আগেই—ইংরেজি সাহিত্য হইতে, ফেবিয়ানদের রচনা হইতে, শ,' ওয়েলস্ হইতে; আর যুদ্ধের পরে বলশেভিকদের নামে কত অদ্ভুত গল্পই তো কাগজে বাহির হইত, অশোকের স্বদেশী দাদা হীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী পর্যন্ত লাহোর হইতে নাকি চলিয়া গিয়াছে রুশিয়া,—তাহা কি ভুলিবার মত? কিন্তু অশোক অমরের কথা স্বীকার করিবে না। সে বলিবে—আলোক লাভ করিয়াছে সে এই বইখানা হইতেই।

আশ্চর্য বই বলিতে হইবে অবশ্য, জ্ঞান তাহা মানেন। ১৮৪৮এর লেখা। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই নাকি গড়িয়া উঠিয়াছে একটা বিশ্বজোড়া আন্দোলন। এবং জাগিয়াছে একটা অদ্ভুত দেশ,—অদ্ভুততর তাহার চিন্তা ও আদর্শ। ক্ষুদ্র একখানা পুস্তিকা দিয়া সূচনা, কিন্তু গড়িয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র দার্শনিক সাহিত্য, পৃথিবী পুনর্গঠনের একটা কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞান চৌধুরীর বিস্ময় জন্মে এই সবে, কিন্তু আস্থা জন্মে না। ইহাই তো অশোক সপ্তাহে আপনার লেখায় প্রচার করিবে?

মনোজীবন ভট্টাচার্য্য অরুণকে পড়াইতে আসিয়াছে বুঝি। কেমন করিয়াছে অরুণ টেষ্ট পরীক্ষায় জানিতে হইবে। কিন্তু জ্ঞানশঙ্কর

প্রথমেই মনোজকে আজ না বলিয়া পারে না—মনোজ ছাড়া এমন কথা বুঝিবে কে ?—

পড়ে ফেলেছি মনোজ, অশোকের সেই বই।

মনোজ একটা কাজের কথা বলিতে আসিয়াছিল। জ্ঞানের কথা শুনিয়া বলিল: কোন্ বই ? ওঃ হাঁ। কেমন দেখেছেন তো, কী জোরালো কথা।

জোরালো। কিন্তু তাই বলে সত্য নয়।

'এণ্ড হোয়াট ইজ ট্রুথ ?'—তা হলেই বলবেন অমর।

জ্ঞান চৌধুরী হাসিলেন: কিন্তু অমরও উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করেই পাইলেটের মত দিত তোমাদের ছেড়ে এই অশোকের মত ফেরিসিদের হাতে।

একদিন মনোজীবনের প্রিয় ছাত্র ছিল অশোক। সাহিত্যে আশাকের অনুরাগ; রচনা শক্তি তাহার তখনি সুস্পষ্ট। মনোজের নিকট সে-ও পাইয়াছিল চিন্তার উপজীব্য—স্পিনোজা বের্গসর তত্ত্ব! দর্শনে এম্-এ পাশ করিয়া মনোজ মাত্র তখন মাষ্টারি আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার পিতা ছিলেন ইংরেজি স্কুলের সংস্কৃতের পণ্ডিত; ছেলে অধ্যাপনা ছাড়া অন্য কাজ করে, ইহা তাঁহার মনঃপূত ছিল না। মনোজীনেরও মেধা থাকিলেও পরীক্ষায় ভালো পাশ করিবার মত বাস্তব বুদ্ধি ছিল না। কাজেই এম-এতে থার্ড ক্লাশ ও স্কুলের মাষ্টারিই তাহার ভাগ্যে জুটিল। তাহা লইয়া মনোজের নালিশ নাই। তাঁহার পিতা পাইতেন মাসে ত্রিশ টাকা, সে পাইতেছে ষাট টাকা; অতএব, নালিশের কারণ কি ? কিন্তু অভাব সংসারে লাগিয়া থাকে—ষাট টাকায়ও এইদিনে

আর কিছুতেই কুলায় না। সেই অভাবের সংসারে দেড় বৎসর পূর্বে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে তাহার স্ত্রী দুইটি শিশু রাখিয়া। মনোজ নিজেকে বুঝাইয়াছে—পয়সা থাকিলেও স্ত্রী বিলাতী ঔষধ পথ্য গ্রহণ করিত না; সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের মেয়ে, পণ্ডিত বাড়ির বধূ। কাজেই অল্প বেতনের জন্য মনোজের ক্ষোভ নাই। তাহার নালিশ অন্য কারণে—ছাত্র কই আর অশোকের মত? শিক্ষার আগ্রহ আছে কাহার? ছাত্রদের নাই, শিক্ষকদেরই বা কই? অভিভাবকদের আছে কি?

আর মনোজের মনে গভীর ক্ষোভ—এ কালের এই সমাজ ব্যবস্থায় বা সমাজ-চিন্তায় ভারতীয় সভ্যতার আসল সাধনারও কোন চিহ্নই দেখা যায় না। মনোজ প্রথম দিকে এই সব আলোচনা কাহারও সহিত করে নাই। পরে শিক্ষক বন্ধুদের সহিত বাক্যালাপে এইরূপ কথা বলিতে গিয়া আরও সে বিপন্ন বোধ করিয়াছে। কেহই এই কথা বুঝতে চাহে না। হয়ত সে-ই বুঝাইয়া বলিতে পারে না। কথা তাহার সংক্ষিপ্ত, ঝকঝকে; কিন্তু চিন্তা তাহার তির্যক গতিতে এদিকে সেদিকে ধাবমান; এক-একটি লম্ফে পার হইয়া যায় অনেকটা ভূমি। প্রথম প্রথম ভদ্র লোকেরা শুনিয়া ধরিতে পারে নাই এই অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত কথা ও অদ্ভুত বাচন-ভঙ্গি। একটু পরে তাহারা কৌতুক বোধ করিয়াছে—লোকটাকে একটু উসকাইয়া দিলে অনেক মজার মজার কথা শোনা যায়। তারপরে তাহারা বোধ করিল একটা অবজ্ঞা।—কিন্তু এবার মনোজ বুঝিল। তাহার প্রকৃতির দৃঢ়বর্মে তখন সেই অবজ্ঞা ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া যায়—মনোজ তাঁহাদের গণনার মধ্যেই আনে না। এইবার ভদ্রলোকদের মনে জাগিল বিরোধিতা।

এমনি সময়ে অশোকের কলেজ-ত্যাগ উপলক্ষ্য করিয়া মনোজের সহিত নৈকট্য ঘটিল প্রথম জ্ঞানশঙ্করের, পরে অমরের। আর দেখিতে না

দেখিতে অমর তাহাকে সগৌরবে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিল, জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর বাড়িতেও মনোজ হইয়া উঠিল বিজয়ের মত, হীরেন্দ্রের মত, অমর অশোকের অন্য বন্ধুদের মত আপনার লোক। তথাপি মনোজ সকলের হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, সে 'অসাধারণ'—অমরের এই কথা সত্য। 'সমাজ সব সইতে পারে, কিন্তু পারে না অসাধারণকে সইতে। তার উপর তারা প্রতিশোধ নেয়—নিজেদের তুচ্ছতার ক্ষোভে। শিক্ষিতরাই আবার এ প্রতিশোধ নেয় বেশি—অসাধারণকে তারা উপেক্ষা করে, উপহাস করে, শেষে করে হত্যা—প্রমাণ সোক্রেটিস, প্রমাণ এরিষ্টাইডিস, প্রমাণ—খ্রীষ্ট,—আর মনোজ।'

অশোকও আগে আগে এই তত্ত্ব মানিত। কিন্তু ইদানীং তাহার ঝোঁক অন্যদিকে। সে এখন বলে: ষাট টাকার মাষ্টার না হয়ে দেড়শ' টাকার সাব ডিপুটি হলে কিন্তু এই 'অসাধারণকেও' সকলে বলতে 'হাকিম,' স্ত্রীও তাঁর বিনা চিকিৎসায় মরতেন না, সাড়ে বারো শিলিংএ বই কেনাও তাঁর বেয়াদবী হত না।

কিন্তু অশোকের এই বিচার মনোজও মানে নাই, জ্ঞানশঙ্করও মানেন নাই। জ্ঞানশঙ্কর জানেন—মনোজকে তাঁহারা স্কুলের কর্তৃপক্ষরা শোষণ করিতেছেন, অশোকের এই কথা সত্য নয়। পারিলে তাঁহারা বেশি মাহিনা দিতেন বৈকি? স্কুল তো আর ব্যবসা নয়। মনোজও মনে করে, তাহাকে শোষণ করিবে কে? সে তো ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করিয়াছে শিক্ষকের জীবন, আর তাহাতে এইরূপই তো আয়ের সম্ভাবনা। সাংসারিক স্থূল অভাবগুলি আছে, থাকিবেও। কিন্তু যে অভাব মনোজকে ক্লেশ দেয় সে মানসিক ও আধ্যাত্মিক—বই কিনিবার মত তাহার টাকা নাই; জানিবার, বুঝিবার মত জিজ্ঞাসা নাই কাহারও মনে।

অশোক তাঁহার মাষ্টার মহাশয়কেও ছাড়িত না, তর্ক করিত।

কিন্তু মনোজও ছাড়িত না, বলিত, অশোক, তুমি করছ কি ? জর্ণালিজম্, বলশিভিজম্ যা-ই করো তোমার আসল কাজটা কিন্তু লেখা। আগুন-ধরানো নয়, আলো-জ্বালানো। তা যদি না করো—'ইওর্স ইজ্ দি সিন্ অব্ আনলিট্ ল্যাম্প্।' প্রদীপ না-জ্বালাবার অপরাধে অপরাধী হবে তুমি।'

অশোক তর্ক করিত : এমন আগুন আমরা জ্বালাব যা গঙ্গার সমস্ত আধ্যাত্মিক জলেও আর নিব্‌বে না।

তর্ক অশোক যতই করুক, মনোজের মনে ক্রমশ একটা নিরাশা জাগিতেছে অশোকের জন্য। এমন সাহিত্যিক মেধা যাহার ছিল সেই অশোক এমন রাজনৈতিক বিষয় লইয়া মাতামাতি আর কতদিন করিবে ? তাই যে ব্যথা ও নৈরাশ্য জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর বুকে গোপন থাকিয়া যায় মনোজের তাহা চোখে পড়ে, তাহার একটা ভাগ যেন মনোজও পাইয়াছে। তাই অশোকের বিষয়ে তাহাদের কথা হয় আত্মীয়ের মত। সেইজন্যই আবার জ্ঞানশঙ্করকে একটু জোর করিয়াই ভরসা দিয়াছিল মনোজ সেবার : অশোক চালাক না সাপ্তাহিক। রবীন্দ্রনাথও চালাতেন 'ভাণ্ডার' 'সাধনা,' ; তাঁর সাহিত্যিক মন তাতেও ফুটে উঠ্‌ত। অশোকও 'বলশেভিজম্' লিখতে গিয়ে লিখে বস্‌বে সাহিত্য। কারণ সে সাহিত্যিক, গান্ধীবাদীও নয়, সাম্যবাদীও নয়।

শুনিয়া জ্ঞানশঙ্কর প্রসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন : ওরা লিখবে ওদের সাহিত্য। তুমি আমি সাহিত্য বলে যা জানি, চিনি, তা নয় ; সেক্‌স্পীয়ার, কালিদাস নয়। ওদের কাছে বঙ্কিম মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথও বাতিল, সেক্‌স্পীয়ারের তো প্রশ্নই উঠে না। ছাখো না, ওরা লাফালাফি করে নজরুল ইসলামকে নিয়ে—'সাম্যের গান গাই।' ওদের গল্প-উপন্যাস সব বস্তির কুলি-মজুর নিয়ে—যেন

পৃথিবীতে মানুষ নেই! সেদিন এ নিয়ে 'রক্ত-করবীর' কথা উঠল। হেসে উড়িয়ে দিলে সে বই অশোক। বল্‌লে, 'বাজে। গল্‌সওয়ার্দির 'ষ্ট্রাইকের' থেকেও কাঁচা, আর তার চেয়েও বেশি ফাঁকি। একটা 'হিং টিং ছট্‌।' ওসব রূপক ও ঝাপ্‌সা কথা 'রাজা' 'ডাক ঘর' নিয়ে চলে; কিন্তু ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্‌ সভ্যতা বড় প্রত্যক্ষ জিনিস। তাতে এসব ফাঁকি চলে না।'

'রক্ত করবী' নাম শুনিয়াই মনোজ উৎসাহিত হইল। নাটক খানা নূতন বাহির হইতেই জিলা জজ দত্ত সাহেবের সঙ্গে আলোচনা হইয়াছিল মনোজের। দত্ত সাহেব গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। তাঁহার শিশুপুত্রের শিক্ষক মনোজ—সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান লোক ছাড়া শিশু-শিক্ষার ভার অন্যের উপর তিনি দিবেন না। কিন্তু মনোজ তাঁহার কলেজের দিনের পরিচিত, তাহার সহিত গল্প-আলোচনা করিতে দত্ত সাহেবেরও আনন্দ।

সম্প্রতি দত্ত সাহেব বিলাত হইতে সপরিবারে ফিরিয়াছেন। কথায়-কথায় তাই বলিলেন,—ইউরোপের সাহিত্যে চিন্তায় যুদ্ধান্তের একটা আস্থাহীনতা এসেছে—একদিকে ওদের সিনিসিজম্‌, আর দিকে তেমনি সেকস্‌-ম্যানিয়া, প্রলাপ প্রমত্ততা। আমাদের সাহিত্য বরাবরই একটু নকল নবিশের সাহিত্য; তাই আমরাও ওদের বুলি কপ্‌চাতে শুরু করেছি। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথকে বুঝলে এই 'নকলের নাকাল' আমাদের হতে হবে না। গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের থেকে বেশি ইউরোপকে আমাদের ক'জন আমরা দেখেছি? আমরা ভুলে যাই ওঁরাও বিলাত ফেরৎ। রবীন্দ্রনাথ তো এই যুদ্ধের পরেও ইউরোপকে আবার দেখে

এলেন। কিন্তু এঁরা দেখতে জানেন—আমাদের মত 'আদিখ্যেতে' আই-সি-এস্ নন,—যা দেখি তাতেই চোখে ধাঁধাঁ লাগবে। এঁরা ইউরোপকে দেখেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখেন পৃথিবীর মূলরূপকে। পৃথিবীর সেই মূল কথাটিই 'নন্দিনী' ও 'রঞ্জন'।

মনোজের তখন মনে জাগিল অশোকের সঙ্গে তর্ক। অশোককে মনোজ যাহা বলিয়াছিল তাহাই মিষ্টার দত্তকে বলিল: টেক্‌নিক্ ও কাল্‌চার এক কথা নয়,—এ কথাটা অনেকের মনে থাকে না। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজম্ ও ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সিভিলিজেশান্‌এও তফাৎ আছে। ইন্‌ডাষ্ট্রি খুব বাস্তব, যেন যক্ষপুরী। তাই 'ইন্‌ডাষ্ট্রিকে' গান্ধীজী যতটা মিথ্যা মনে করেন তাও তা নয়। এ সভ্যতাও বাস্তব, যেন যক্ষপুরীর 'রাজা'। কিন্তু বাস্তবই তো সত্যের সবটা নয়,—ফ্যাক্‌ট যেমন নয় ইতিহাসের সবটা। তাই 'রাজার' থেকে বড় 'রঞ্জন', আর সকলের অপেক্ষা বড় 'নন্দিনী—' 'পৃথিবীর প্রাণ ভরা খুশীখানি যে নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে।'

জ্ঞানশঙ্করের সঙ্গেও 'রক্ত করবীর' কথা মনোজের তাই জমিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তখন অশোক নাই; অমরও নাই; জ্ঞান চৌধুরী ও মনোজ দুই জনেই একমত, কে আপত্তি করিবে তাঁহাদের কথায়?

অশোকের প্রসঙ্গটা তবু জ্ঞান চৌধুরী আলোচনা করিতে পারেন মনোজকে পাইলে। অন্যেরা বুঝিবে না—অশোক কি হইতে পারিত, এবং কি হইল না। অশোক যে 'ফেরিসি' হইয়া উঠিয়াছে, পরিহাসছলে হইলেও এই কথাটা জ্ঞান চৌধুরী মনোজকেই বলিতে পারেন। তিনি হয়ত আশা করেন, মনোজ আবার বলিবে,—অশোক ফেরিসি নয়, সে সাহিত্যিক।

কিন্তু মনোজ আজ বলিল: যা'ই বলুন অশোককে, পাইলেটদের কোন কিছুর উপর আস্থা নেই।' অশোকদের কিন্তু আস্থা আছে। দেখুন বইএর প্রথম লাইনেই ওরা চ্যালেঞ্জও করে বসে সেই আস্থার জোরে—'এ স্পেক্‌টার ইজ্‌ হন্টিং ইউরোপ।' দেখেছেন তো?

দেখেছি।—জ্ঞানশঙ্কর হাসিলেন। তিনি ভাল করিয়াই তাহা দেখিয়াছেন। লাইনটা তাঁহাকেও নাড়া দিয়াছিল। বইটাও পাতায় পাতায় নাড়া দিত। কিন্তু তখনি তাঁহার কন্যা কমলার পত্র আসিল তাঁহার হাতে। আর নিমেষ মধ্যে জ্ঞান চৌধুরী বুঝিলেন—আমরা পুরুষেরা বিলাতী মশাল লইয়া আমাদের সমাজে আগুন ধরাইতেছি। কিন্তু ভারতবর্ষের গৃহদীপটি অঞ্চলের আড়ালে ঘিরিয়া বাঁচাইয়া লইয়া চলিয়াছেন আমাদের কন্যারা, গৃহলক্ষ্মীরা, গৃহকর্ত্রীরা। জ্ঞান চৌধুরীর মন হইতে তাই এই গ্রন্থের চ্যালেঞ্জও মুছিয়া যায়। বইটাকে পড়িবার কথাও তখন তাঁহার আর মনে থাকিল না। সম্প্রতি হঠাৎ আবার বইটা চোখে পড়িয়াছে, পড়িয়া ফেলিয়াছেন।

সহজ ভাবে, একটা দৃঢ়তার সহিত মনোজকে তাই জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন: এ স্পেক্‌টার ইজ্‌ হনটিং ইউরোপ? করুক হণ্ট্‌। ভারতবর্ষ ইউরোপ নয়।

মনোজও তাহাই মানে। কিন্তু সে বলিল: অশোকেরা বল্‌বে ইউরোপ নয় ঠিক, কিন্তু ইউরোপের একটা পোকায়-কাটা সংস্করণ।

জোর দিয়াই এবার জ্ঞান বলিলেন: না, ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয়। গোটা ইউরোপের জাতিরা চিন্তায় ও কর্মে পরস্পরের জ্ঞাতি, তাহারা কেহ বড় কেহ ছোট। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহাদের কেহ নয়। এমন কি, 'এশিয়া ইজ্‌ ওয়'ন্‌' বল্‌তাম আমরা সে দিনে,—প্রিন্‌স্‌ ওকাকুরার কথা। কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। ভারতবর্ষ নিজেই একটা ইউনিট্‌; আর সে

তাই—স্বতন্ত্র আর অদ্বিতীয়। '১৮৪৮এ ওরা ইউরোপে যা দেখে শিউরে উঠ্‌ছিল, ভারতবর্ষে তা তুমি দেখেছ কোথাও ?'

আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন—, মনোজ বাধা দিল না, বাধা দিবার কথা তাহার মনেও উঠিল না।—কোথায়, মনোজ, সেই বুর্জোয়া এই দেশে—সেই কাঞ্চন কৌলিন্য ? সেই ক্যাপিটালিজম্‌—বা বৈশ্যরাজ ? কোথায়ই বা ইউরোপের ফিউডালিজম্‌ ভারতবর্ষে ? সেই পোপের রাজত্ব, চর্চে-বাঁধা ধর্মহীন রিলিজিয়ান, যাকে আমরা বলতাম 'চার্চিয়ানিটি' ? কোথায় বা সেই ইনকুইজেশান, ধর্ম্মের নামে নির্ব্বিচারে খুনোখুনি, 'থার্টি ইয়ার্স ওয়ার ?' আমাদের ইতিহাসে আছে কি রাষ্ট্র উৎপাৎ ? আমরা রাষ্ট্রশাসিত নই, সমাজবদ্ধ জাতি। রাজার শাসনে চলিনি, ব্রাহ্মণের অনুশাসনে চলেছি। না, মনোজ শ্রেণী-সংঘাত ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেই, সমাজে নেই, জীবনে নেই। সেই বারবারিজম্‌ নেই, সেই স্যাভেজারি নেই; সেই ফিউডালিজম্‌ নেই, সেই ক্যাপিটালিজম্‌ও নেই। আজও এদেশে কল-কারখানা নেই, টাকার রাজত্ব নেই, টাকার দাসত্বও নেই; নেই তাই আমাদের সমাজে প্রোলিটেরিয়েট; নেই বুর্জোয়া। নেই শ্রেণী বৈষম্য, শ্রেণী সংঘর্ষ, শ্রেণী-বিদ্বেষ। ওরা ইউরোপের মানুষ, সমস্ত জিনিসটাই ইউরোপের ইতিহাস দেখে তৈরী করছে ;—আমাদের ইতিহাসের কোনো খোঁজই ওরা রাখত না। কেই বা এখনো রাখে ?—জয়সওয়াল মাত্র পথ দেখালেন।

মনোজ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। কথাগুলির মধ্যে যে আবেগ যে বিশ্বাস, অন্তরাত্মার যে আত্মপ্রকাশ সে শুনিতে পাইল তাহাতে সে যেন আপনারই কথার, চিন্তার, চেতনার প্রতিধ্বনি শুনিল। কিন্তু জয়সোয়ালের 'হিন্দু পোলিটি' বা মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কারে এত

গুরুত্ব দান করেন কেন জ্ঞান চৌধুরী ? সত্য সত্যই তাহাতে ভারতীয় সাধনার ইতিহাসের কোনো বিশেষ দিক তো খুলিয়া যায় নাই। এমন আরও সভ্যতা ছিল, মোহেন-জো-দড়োর মত,'—মিশরে, মেসোপোতামিয়ায়। এমন আরও গণতন্ত্রও ছিল—গ্রীসে, রোমে, হয়ত বা অসভ্য জাতিদের মধ্যেও ছিল। তাহাতে কি ? ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতটুকু সত্য তাহা ? ইতিহাসের এদিককার আসল কথাটা বরং বুদ্ধের কথা—ভারতের এ্যাথিক্যাল বাণী ক্ষমা মৈত্রী, উপেক্ষা ;—আমাদের 'সার্মোন অন্ দি মাউন্ট্।' আর তার থেকেও বড় কথা—ভারতের স্পীরিচুয়াল বাণী—তেনাহং কি কুর্য্যাম্ যেনাহং নামৃতা স্যাম্ !'

জ্ঞানশঙ্কর জানেন মনোজ ইতিহাসের ফ্যাক্টস্‌কে তত বেশি গুরুত্ব দিতে চাহে না। কিন্তু জ্ঞানচৌধুরী আইনজীবী, ফ্যাক্টস্ তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার পর বুঝিতে হইবে ন্যায়-অন্যায়। যাহা ফ্যাক্ট্ তাহাকে ভ্যালিড্‌ও বলিতে হয়, যাহা ডি ফ্যাকটো তাহাও ডি জুরি হইবে—যদি অন্ত ফ্যাক্ট্ আসিয়া তাহা নাকচ না করে। তবে মনোজও ঠিকই বলে—সত্য বলিয়া একটা জিনিস আছে। আর তাহাই সনাতন। তাহার উপরই আমাদের ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত,—সে ন্যায়-নীতি অপরিবর্তনীয়। আইনের মূলও এই ন্যায় নীতি ; তাহা শুধু ইউরোপের 'ইক্যুইটি' নয়, তাহা আমাদের 'ধর্ম।'—ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ধর্ম পরিবর্তিত হয় না। তাহা সনাতন। এই মূল বোধটা গীতায় লাভ করা যায়। শুধু উপনিষদ্ ও ব্রহ্মবিদ্যাই তো ভারতবর্ষের আবিষ্কৃত সত্য নয়। ভারতবর্ষের উপলব্ধ সত্য একটা জীবন-ধর্ম—তাহাই গীতাতে কর্মযোগ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মনোজ কিন্তু গীতার অত ভক্ত নয়, বিশেষ করিয়া ফ্যাক্ট্-এর উপর এত জোর দিলে সে স্বস্তি পায় না। ঘটনা বা বাস্তব অবস্থাই যদি সত্য,

তাহা হইলে ভারতবর্ষের গৌরব বড় বেশি রক্ষা পাইবে না। উপনিষদের সাধনার কোনো পরিচয়ই প্রায় সাধারণ ভাবে ভারতীয় সমাজে নাই। আজ সেখানে 'ধর্মও' নাই, আছে সংস্কার, কতকগুলি প্রাণ-হীন ক্রিয়াকাণ্ড।

মনোজ তাই বলিল: কিন্তু ইতিহাসের ফ্যাক্‌ট্‌স্ দেখলে, আর এই সমাজের এখনকার বাস্তব অবস্থা দেখলে, কিন্তু অশোকের কথা উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। সেইখানেই তো বরং ওই বইখানারও জোর—ওরা ফ্যাক্‌ট্‌স্‌কেই শুধু স্বীকার করে। এ্যাক্‌চুয়ালকেই মনে করে ওরা রিয়াল—আসল ভুলটা ওদের এইখানে।

এই কথাটায় জ্ঞান চৌধুরীরও সম্মতি আছে। তিনি বলিলেন: আমাদের সংস্কারগুলোকেই আমাদের সমাজ-জীবন বলা চলে কি? ছ্যাখো না, এ ভুল রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত করে বসতেন মাঝে মাঝে—সনাতন সমাজ থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতার বশে। অথচ ধরো শরৎবাবুকে—তুলনাই হয় না যাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিভায়!—'শিক্ষার মিলনে' আর 'শিক্ষার বিরোধে' তুলনা হয়? অত্যন্ত পুয়র তা চিন্তা ও বুদ্ধিতে। কিন্তু তিনি ওরূপ বিচ্ছিন্নতায় বাধা পান নি বলে বুঝতে পারেন—সংস্কারটা সমাজ-জীবনের আসল পরিচয় নয়। 'পল্লী সমাজ' আছে, আছে 'চরিত্রহীন', 'দেবদাস'; কিন্তু আছে 'বিন্দুর ছেলে' আছে 'নিষ্কৃতি'।

মনোজ বলিতে যাইতেছিল: রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শরৎচন্দ্রের এই সমাজ-জ্ঞান নিচু স্তরের। শরৎবাবুতে আছে 'রিয়ালিজম্'—কিন্তু নাই 'রিয়ালিটি',—আর রবীন্দ্রনাথের আছে এই রিয়ালিটি; রিয়ালিজম্‌এরও যাহা অন্তর্বস্তু—সেই সত্য।

কিন্তু মনোজ কথাটা বলিতে পারিল না। নৃপেন দিন দুই পূর্বে

শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল। একটু পূর্বে কমলা গল্প শুনিতে এই ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল,—এমনি সে বসে, কথা বলিবার মত মেয়ে সে নয়। কিন্তু আজ নৃপেনও তাহার পশ্চাতে আসিয়াছে। কথা সে বলিবেই এখন শরৎচন্দ্রের নাম শুনিয়াই সে খাড়া হইয়া বসিল, মনোজ কিছু। বলিবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল:

শরৎ চাটুজ্জে নরেশ সেনের আজ-কালকার লেখা দেখেছেন? একেবারে অশ্লীল।

মনোজ আর কথা বলিতে পারিল না। জ্ঞানশঙ্কর চোখ তুলিয়া একবার নৃপেনের দিকে তাকাইলেন। তারপর, হাসিবার চেষ্টা করিলেন—নৃপেন যেন নিতান্তই ছেলেমানুষ; তাহার কথায় মনোজের গুরুত্ব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বুঝিলেন, মনোজ আর কথা বলিতে পারিবে না,—নৃপেনরাই তো সমাজ। আলোচনা আর জমিবে না। এবার উঠিতেই হইবে। অবস্থাটা তাই এড়াইয়া যাইবার জন্য, জ্ঞান বলিলেন: পড়ি কখন বলো না? ওই তো শুনছো—মক্কেলেরা ইতিমধ্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—'উকিল বাবু আসছেন না।'—উঠি আজ, মনোজ। ওবেলা আসবে তো পারলে?

মনোজ উঠিয়াছে। উঠিতে উঠিতে মনে পড়িল, যে কথাটা সে বলিতে আসিয়াছিল তাহাই বলা হয় নাই। এখন বলিবে কি? না, বেশ ও-বেলাই সে আসিবে, তখনি বলিবে। সে কি জানে না—জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর মনে এমনিই তো কত নিরাশা জমিয়া আছে—অশোকের আচরণে। 'ওবেলা,' ভাবিয়া তাই মনোজও স্বস্তি পাইল, অন্তত এখন—এবেলা বলিতে হইল না।

মনোজ দা'—

কে ডাকিল? ওঃ কমলা। সে যে কখন আসিয়া ঘরের কোণে

নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল, আবার এখন কখন আসিয়া দুয়ারের বাহিরে বারান্দায় তাহার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, মনোজ তাহা দেখে নাই। ভালো লাগে তাহার কমলাকে। কথা বলে সুন্দর, বুদ্ধিও তাহার তীক্ষ্ণ।

কমলা বলিল: অরুণের কথাটা বাবাকে বলেন নি তো?

না। কিন্তু ওঁকে জানানো দরকার—হেড মাষ্টার মশায় বলেছেন।

বাবা না জানলেও আমরা তো জেনেছি—মাকে জানাব। বাবা আর নাই বা জানলেন?—কমলার চক্ষে একটি শঙ্কিত সংকুচিত প্রার্থনা। মানোজও না বলিতে হইলেই যেন বাঁচিয়া যায়, সে অন্তত মুক্তি পায়। জ্ঞান চৌধুরীর ভরাক্রান্ত চিত্তে আরও আঘাত না দিয়া সে পারে। অথচ কথাটা প্রয়োজনীয়, হেডমাষ্টারবাবু বলিবার ভার তাহাকেই দিয়াছেন—জ্ঞানবাবু স্কুলের সেক্রেটারী। আর কিছু ব্যবস্থা না করিলে নিজেও মনোজ অস্বস্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। কিন্তু কথাটা জানিয়াছে অরুণের দিদি কমলা, আর বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, ফাজিল নয়, দায়িত্ব বোধ আছে। অতএব মনোজ আর ওবেলাও না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। হাঁ, ও বেলা না আসিলেও চলে। না হয় আসিবে, কমলার সহিত কথা বলিবে—আবার কথাটা বুঝিয়া দেখিবে। কমলারও তাহার নিকট নানা কথা জানিতে আগ্রহ।

অরুণের পরীক্ষা চলিতেছে। হৈম ও কমলাই সব দেখে। তবু শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও জ্ঞান চৌধুরীর অরুণের পরীক্ষার কথা মনে পড়ে। বাড়ি ফিরিয়া সন্ধ্যায় প্রথম জিজ্ঞাসা করেন,—কেমন করিল অরুণ পরীক্ষায়। লেখাপড়ায় সে ভালো নয়, তবে পড়িয়াছে। আর

অশোকের মত সে পরীক্ষায় অত ভালো করিবে, ইহা তো কেহই প্রত্যাশা করে না।

বার লাইব্রেরীতেই রাজেন সেন জ্ঞানকে বলিলেন: জানো না কি পরীক্ষা কেমন হচ্ছে ওদের?—তাঁহার ছেলে নাকুও পরীক্ষা দিতেছে—সে ছেলে ভালো। যতটা ভালো সে সকল পরীক্ষায় করে, তাহার অপেক্ষাও সে ভালো করিবার মত ইউনিভার্সিটিতে,—সেখানে তো আর সেক্রেটারির ছেলেদের ফার্ষ্ট হইবার কথা নয়;—এই কথাটাই রাজেন সেন ও গণেশ বাবু বহুবারের মত আলোচনা করিতেছেন, জুনিয়ারেরা তাঁহাদের ঘিরিয়া বসিয়াছে,—জ্ঞান তাহা মনে করিয়া বলিলেন, না। মামলা করব, না, ছেলের পরীক্ষা দেখব?

রাজেন সেন তাহা কানে তুলিলেন না। বলিলেন: ভালোই হয়েছে শুন্‌লাম প্রশ্ন। তবে আমি ভাবলাম—তুমিও গিয়াছিলে, ব্যাপারটা মিটে গিয়েছে।

কি ব্যাপার?—জ্ঞান উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

সে কি, তুমি শোনো নি নাকি?—বুঝা গেল রাজেন সেন জ্ঞান চৌধুরীর কথাটা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু তথাপি একটা চক্ষু লজ্জা আছে তো। তাই বলিলেন:

ব্যাপার কিছু নয়। অরুণের সামনে পরীক্ষা দিচ্ছিল মৈনপুর স্কুলের একটা ছেলে। ছেলেটা ভালো। তা লোকে যত বলে তত নয়। আহা, বৈদ্যের ছেলে কে কেমন, জানতে তো আমার বাকী নেই। তবে সে ছেলে মন্দ নয়, কিন্তু বড় বেশি ডেঁপো। কি না কি হয়েছে, দাঁড়িয়ে উঠে ছেলেটা ইনভিজিলেটরকে বলে, 'স্যার আমি ডিস্‌টুর্বড হচ্ছি।' 'কি ব্যাপার?' অরুণ নাকি ওকে অঙ্কের একটা ফল বলতে বলছিল, ছেলেটা তা না বলায় অরুণ তার পিঠে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে। অরুণ বলে, 'কলমে

কালি বেশি উঠলে আমি ঝেড়ে নিই। ওর গায়ে তা পড়লে আমি কি করব? ওকে আমি চিনি না? কথা বলব কেন ওর সঙ্গে?' তবে নাকু বললে—গোলমাল বেশি দূর যাবে না। জিলা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন সুপারভাইজার, তিনি তো জানেন তোমাকে। আমি আমি ভাবলাম তুমিও খবর পেয়েছ, ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়ে এসেছ।

লজ্জায় ও গ্লানিতে মাটিতে মিশিয়া যাইতে চাহিলেন জ্ঞান। রাজেন সেনের মুখ হইতে বার লাইব্রেরীতে তাঁহার শুনিতে হইল এইরূপ কথা। এতক্ষ এই গল্পই ইহারা নিশ্চয় করিতেছেন—গণেশ ও নিশ্চয়ই ডাকিয়া জুটাইয়াছিল সকলকে—শোনো জ্ঞান চৌধুরীর ছেলের কাণ্ড শোনো। ভিক্টোরিয়া স্কুলের সেক্রেটারি জ্ঞান চৌধুরী—শোনো! এ তো স্কুলের পরীক্ষা নয়, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা, তাই গোলমাল। তবু গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে। যাইবেই তো। জ্ঞান চৌধুরীর ছেলে—নিজেই জ্ঞান চৌধুরী হয়ত গিয়াছিলেন জিলা স্কুলের হেডমাষ্টারের বাড়ি কাল সন্ধ্যায়।

রাজেন সেনের সম্মুখে যেন জ্ঞান চৌধুরী কথা বলিতে পারেন না। না, বার লাইব্রেরীতেই তিনি আর বসিতে পারেন না। অসম্ভব, অসহ্য তাঁহার পক্ষে মুখ দেখানো এখানে এখন। জ্ঞান চৌধুরী ক্রুদ্ধ কঠিনস্বরে বলিলেন: খাতা মিলিয়ে দেখেছেন কি পরিদর্শকরা? অন্যায় যদি অরুণ করে থাকে তাকে বের করে দিলেন না কেন? সে মাষ্ট ডু দেয়ার ডিউটি।

রাজেন সেন যেন বুঝেন না এই সব কথার ভণ্ডামি! তিনিই বুঝি হার মানিবেন? বলিলেন: না, না, তেমন কিছু নয় বোধ হয়?

'কিছু' হলেই তো অন্যায়।

অন্যায়ই বা বিশেষ কি?—গণেশ বেশ ভালো মানুষের মত

বলিলেন : ওরকম ওই স্কুলেও ওরা এক-আধটুকু করে। এক-আধটা কথা জিজ্ঞাসা করলে আর কি হয়—

অসহ্য এই বিদ্রূপ গণেশের মুখ হইতে—সে কলেজ কমিটির মেম্বর হইয়া অবধি জ্ঞানকে নানা ভাবে অপদস্থ করিতে চাহে। ওকালতিতে সে জ্ঞানকে আঁটিতে পারে নাই, সম্মানে মর্যাদায় পারে নাই। নিজ পুত্রের গুণ ব্যাখ্যানে সে পঞ্চমুখ—আজ সে জ্ঞানকে অপমানিত করিবার সত্যই সুযোগ পাইল। কিন্তু অপমান তো রাজেন-গণেশ তাঁহাকে করে করে নাই, অপমান জ্ঞানকে করিয়াছে আসলে অরুণ!

ক্রোধে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

মুহুরি কি একটা কাজের কথা বলিতে আসিলে বাঁচিয়া গেলেন জ্ঞান চৌধুরী। এই শত্রুশিবির হইতে তিনি পলাইবার অবসর পাইলেন। একেবারে থার্ড সব জজ কোর্টে। তারপর আজ—বাড়ি। মাথার আজ ভয়ানক কষ্ট হইতেছে।

হৈম কিছুই জানিত না। জ্ঞানের মুখ দেখিয়াই সে হতবাক্ হইল। সব সে শুনিল, বিশ্বাসও করিল। এইরূপ সন্দেহ অরুণের সম্বন্ধে তাহার মনে পূর্বেই তো জন্মিয়াছিল। অরুণ,—নির্বোধ অরুণ, একবারও সে ভাবে নাই এই অপমান তাহার পিতার নিকট যে মৃত্যুতুল্য। কিন্তু অরুণকে তখন বাড়ি পাওয়া গেল না। কমলা জানাইল, সে পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে আলোচনা করিয়া পড়িতে গিয়াছে। জ্ঞান চৌধুরীর ভয়ানক মাথা ধরিয়াছিল; ব্ল্যাড্ প্রেসার বাড়িতেছে না তো—ক্রোধে অপমানে? গল্প করিতে ডাকিলেন শরৎ। হাঁ, একটু মন শান্ত করা প্রয়োজন—ক্রোধে তিনি হতচেতন হইতে পারিতেন।

আহার কালে অরুণকে পাইয়া হৈমবতী তীক্ষ্ণ স্বরে তিরস্কার করিল,

সখেদে বলিল : কতবার তোমাকে বলেছি এসব করো না। কর্তা খুন হবেন।

অরুণ পূর্ব্বাপর ব্যাপারটাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল।

হৈম বলিল : বললেই হল? সে বার টেস্‌ট পরীক্ষায়ও এমনি কাণ্ড করেছিলে। তখন কর্তা জানেন নি; মনোজ জানাল না, কমলাও জানতে দেয় নি তাঁকে। তাতেই তোমাব সাহস বেড়ে গিয়েছে।

তখন কি করেছিলাম আবার?—অরুণ চটিতেছিল।

সে তুমিই জানো। মাষ্টাররা তোমায় দেখতে পারেন না, এই তো বলবে? কেউ তোমাকে দেখতে পারেন না। দেখতে পারবেন কোন গুণে? কর্তা বলছেন, একথা শোনবার আগে আমি মরলেই ভালো ছিল।'

অরুণ ক্ষেপিয়া গেল—তাহার গুণ নাই কাহারও চোখে, সে বেশ জানে তাহা।

আমার যদি গুণ না থাকে, গুণ না থাকবে। সেজন্য 'অন্তের' মৃত্যু হবে কেন? দুর্ণাম তো আমার। আমি এ দুর্ণামে 'কেয়ার' করি না।

তুমি কেয়ার করবে কেন? মানুষ হলে সে অপমান বুঝবে।

অর্ধভুক্ত অন্নব্যঞ্জন ফেলিয়া অরুণ উঠিয়া গেল। আসলে পালাইল—জ্ঞান আসিবার পূর্বেই ঘরে গিয়া খিল দিয়া সে শুইয়া পড়িবে।

ক্রোধ নাই, কিন্তু মাথার কষ্টটা তখনো আছে। জ্ঞান চৌধুরী সে রাত্রিতে আর পড়িতে পারিলেন না। অরুণ ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কমলা যে আজ তাঁহারই অপেক্ষায় কেন বসিয়া আছে,—তাহা জ্ঞান বুঝিলেন। না, আর রাগ করিবেন না, ব্ল্যাড প্রেসারে এমনি মাথাটা ধরিয়া আছে। তাই যথা সম্ভব নিজের দুঃখ সংবরণ করিবেন। এক আধটুকু শান্ত কথা বলিয়া কমলাকে শুইতে পাঠাইয়া দিবেন।—

হৈমবতীও গৃহকর্ম শেষ করিয়া আসিয়াছেন।

জ্ঞান চৌধুরী হৈমকে বলিলেন: শেষে এও ছিল অদৃষ্টে! লোকে বলে অরুণ পরীক্ষায় নকল করে।

জ্ঞান বোধহয় প্রত্যাশা করিতেছিলেন, হৈম বলিবে 'লোকের কথা মিথ্যা।' কিন্তু হৈম তাহা বলিল না। জ্ঞানের এই আশাও নিবিয়া যাইতে লাগিল।

কমলার নবজাত শিশুপুত্র ঘুমাইতেছে; সে ফিরিয়া আসিয়া পিতার নিকট বসিল। সন্তর্পণে বলিল: কিন্তু মনোজদা,' বিজয়দা'দের কাছে শুনেছি—ব্যাপারটা কিছু নয়। এক-আধটুকু ওরকম কথাবার্তা সকল ছেলেই বলে।

শুনিয়া হঠাৎ জ্ঞান আবার ক্রুদ্ধ হইলেন—কমলাও চাহে অরুণের এই আচরণ সমর্থন করিতে। কিন্তু ক্রোধ তিনি আর পোষণ করিবেন না। তাহা ছাড়া কমলা, মনোজের বিজয়ের কাছে নিশ্চয় এইরূপ শুনিয়াছে। জ্ঞানশঙ্কর তবু এই কথা মানিবেন না—ইহা কি সম্ভব?

কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী আবার একটা আত্মরক্ষা করিবার মত যুক্তিও দেখিলেন এই কথাটিতে। হয়ত বিশেষ গর্হিত কিছু করে নাই অরুণ অবিবেচনার কাজ করিয়াছে সম্ভবত; জ্ঞানের আত্মগ্লানির কারণ নাই

মনোজের নিকট পরদিন জ্ঞান শুনিলেন—অরুণের আচরণে হেড মাষ্টার মহাশয়েরও পূর্বে সংশয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা গুরুতর কিছু নহে। অসাধুতা নয়, জুয়াচুরি নয়। পরীক্ষার ব্যাপারে আজকাল ছাত্ররা এইরূপ ছোটখাট অন্যায় কৌশল গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ছাত্রদেরই বা দোষ কি? দুই দুইবার ম্যাট্রিকুলেশনে

ইউনির্ভাসিটির প্রশ্নপত্রই তো সেবার বাহির হইয়া গেল। তাহার কোনো কূল কিনারা হইয়াছিল? হয় নাই। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরাই এইসব কৌশল গ্রহণ করিতেছেন। কর্তাদের পুত্রদের ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড কবিবার জন্য তাহাদিগকে এইরূপ সুযোগ দান করিতে বড় বড় অধ্যাপক অধ্যক্ষরাও কার্পণ্য করেন না। 'এ সবইতো বলেছি আপনাকে,'—মনোজ বলিল।

আলোচনা ব্যক্তিগত অংশটুকু বেদনাদায়ক হইত; কিন্তু সেই রূপ আলোচনা মনোজের নিকট সামান্য জিনিস. ব্যক্তিসত্বা অসামান্য সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত আচরণ তো তাহা নয়। অরুণের ব্যক্তিগত আচরণ তাহার সত্বার কতটুকু প্রতিফলন? উহা আসলে একটা ফেনোমেনা—সোশ্যাল ফেনোমেনারই একটা অংশ বলিয়া মনে হইবে;—বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষাপদ্ধতির কথামাত্র। কিন্তু আসলে আবার শুধু তাহাও নয়—একটা স্পীরিচ্যুয়াল ব্যাধি—সত্বার অপঘাত। মনোজ তাই তাহা জ্ঞানের সহিত না আলোচনা করিয়া পারে না।

জ্ঞানও বুঝি সেইরূপ নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা পাইলে এখন স্বস্তি পায়। সত্যই তো, জ্ঞানেরও মনে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষানীতির উপর বিরক্তি ও অভিযোগ জমিয়া উঠিয়াছিল। মাস কয় পূর্বে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিয়োগের সংবাদে তাঁহাদের মধ্যে এই আলোচনাই উঠিয়াছিল।

সেদিন সকলের মন ছিল শোক-বিহ্বল,—বাঙলার সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ পুরুষ স্তব আশুতোষ, রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি আবির্ভূত হইতেন হয়ত। সকলেই তাঁহার সেই আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়াছিল। গবর্ণমেন্টের সহিত বিরোধে ইউনির্ভাসিটি যে এখন অসহায় হইয়া পড়িল তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙালীর বড় দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগ্য বটে, শিক্ষার প্রসার হইতেছিল।—কিন্তু কোন্ শিক্ষার? আমরা কি শিখিতেছিলাম?—

হঠাৎ মনোজ এই ধরণের তর্ক তুলিয়া বসিল। এই তর্ক সময়োচিত নয়। বিশেষত একালের সকলেই আশুতোষের ভক্ত। কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী মনে করেন—তর্কটায় সত্য আছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক হয় নাই; স্যর আশুতোষ গোখ্‌লের সেই প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এ কালের বি-এ, এম্-এর বাজার দামও নাই, সত্য মূল্যও নাই। স্কুলগুলির তো আরও দুরবস্থা।—কেবলই তাড়া—'মুসলমান টিচার রাখো; ট্রেণড্‌ টিচার চাই।' সেকালের শিক্ষকেরা ট্রেনিংএর ধার ধরিতেন না, কিন্তু পড়াইতে জানিতেন। প্রাণ দিয়া তাঁহারা ছাত্রদের পড়াইতেন, ভালবাসিতেন। আর বেতের ভয়ে ছাত্রবাও কাঁপিত থর থরি। একালের শিক্ষায় ডিসিপ্লেনের চেঁচামেচি বাড়িয়াছে,—ছাত্রদের 'লয়াল' করিতে হইবে, অর্থাৎ গোয়েন্দা বানাইতে হইবে। কিন্তু মানসিক সুশৃংখলা, সংযত আচরণ, গুড্‌ সিটিজেনশিপ্—তাহা কোথায়? পড়াশুনায় ছেলেদেরই বা আগ্রহ কোথায়? তাঁহাদের কালে স্কুলে-কলেজে পড়িতে পাওয়া মানুষের জীবনে একটা সৌভাগ্যের কথা ছিল। এখন সেদিন নাই। ষ্ট্যাণ্ডার্ডও নিচু হইয়া চলিয়াছে। বোধ হয় ননকোঅপারেশনের ফলেই আরও তাড়াতাড়ি তাহা নামিতেছে।

মনোজ বলিল—তারও কারণ ব্যবসা বুদ্ধি। চাই Advancement of Learning নয়, Advancement of Earning. ছাত্ররা ভাবে যেমন করে হোক্ মার্কা পাওয়া চাই—ভালো মার্কায় ভালো চাকরি, —অন্তত তা পাবার সম্ভাবনা। বড় কর্তাদের ছেলেরা তাই ভালো মার্কাও একচেটিয়া করে নিচ্ছে;—কারণ মার্কার বাজার দাম আছে। স্কুলগুলোকে বলে—ছাত্র বাড়াও;—কাঁচা, ডাঁসা পাকা যা পাও নাও—ফি দিলেই হল। ইউনির্ভার্সিটি কি চায়—পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট

ক্লাশগুলি পাখা ছড়াবে, 'তোতা কাহিনীর' তোতারা এম্-এ হবে, পি-এচ-ডি হবে,—গবেষণা করবে।

এই সাধারণ আলোচনায় মনোজের মনের ক্ষোভ জ্বলিয়া বাহির হইতেছিল। স্ত্রী বিয়োগের পর হইতে মনোজ আজকাল এইরূপে ধৈর্য হারায়, তাহা জ্ঞান চৌধুরী লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি তাই কথার মোড় ঘুরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন: তবু স্কুল কলেজ চাই।—সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে তো—

কিন্তু মনোজ শান্ত হইল না।—সাধারণ মানুষ এসব স্কুল কলেজ থেকে শিক্ষা পায় না কি? পায় না বলেই তারা মানুষ আছে এখনো। তারা কবি যাত্রা কথকতা পুঁথি পাঁচালি শোনে;—আমাদের সমাজের সহজ সভ্যতার অধিকারী তারাই। সে সভ্যতা শ্রীহীন নয়, আপনি জানেন। এই অক্ষর-জ্ঞানের ইতরতায় সাধারণ মানুষ আত্মভ্রষ্ট হয় নি।

জ্ঞানও জানে মনোজের মনে শিক্ষার মোহ নাই—থাকিবে কেন? বউ মা সামান্য লেখাপড়া জানিতেন, দুইটি সন্তান রাখিয়া পরলোকগতা হইলেন। সতী লক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন, সেবায় আচার নিষ্ঠায় সেই গুরু-পুরোহিত বংশের মেয়ে—এক অক্ষর ইংরেজি যিনি জানিতেন না—মনোজের অভাবের সংসারকে শ্রীময় করিয়া দিয়াছিলেন,—মনোজ তাহা ভুলিতে পারে না। তাঁহার স্মৃতি সে সযত্নে রক্ষা করে—আর বিবাহও করিতে চাহে না। নিরক্ষর মানুষের সপক্ষে মনোজের এই প্রতিবাদ আসলে তাহার দিক হইতে সেই পুণ্যবতীরই স্মৃতি তর্পণ। তাহা ছাড়া মনোজ বাহিরেও দশজনের নিকট প্রতিনিয়ত আঘাত খাইতেছে। ষাট টাকা বেতনে মাষ্টার মনোজ,—জ্ঞান চৌধুরী, অমর চৌধুরী তাহাকে তাহার ইংরেজি লেখার জন্য, দুর্বোধ্য চিন্তার জন্য, দুষ্পাঠ্য লেখার জন্য, সমাদর করিবেন, তাহাও সহ্য করা গিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি জজ সাহেব

মিষ্টার দত্তও তাহাকে খাতির করিতে শুরু করিয়াছেন—এত লেখাপড়া জানা উকিল, এম-এতে ফার্ষ্ট ক্লাশ অধ্যাপক এই শহরে থাকিতে। ইহা শুধু সেই যোগ্যতমদের প্রতি অবিচার নয়, ইহা মনোজেরই যেন একটা চক্রান্তও ঔদ্ধত্য। কোনো কালেই মনোজ অভাব গায়ে মাখে নাই, শিক্ষিতাদের উপেক্ষাতেও সে বাগ মানে নাই। তাহাদের উপেক্ষা ও উপহাস তাই এখন গোপন আক্রমণ ও চক্রান্তে পরিণত হইতেছে। যে পারে সেই মনোজকে একটু জব্দ কবিয়া ছাড়ে। অথচ এইরূপ আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার মত বাস্তব বুদ্ধিও মনোজের বেশি নাই। তাই শিক্ষিত মানুষের নিকট হইতে নানা ভাবে সে পীড়নই লাভ করিতেছে। তাহার মার্জিত মনে ক্ষোভই কেবল জমিতেছে। এমন অসময়েও এমন আলোচনায় তাহা তাই এমন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

জ্ঞান চৌধুরী বুঝিয়াছিলেন—সেই প্রকাশ সেই সময়ে সুসঙ্গত নয়। মনোজের সমালোচকেরা তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে আরও একটা নিন্দার সুযোগ লাভ করিতেছে—শহরে বলিয়া বেড়াইবে, স্যার আশুতোষের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণেও লোকটা এই সব কথা বলে। জ্ঞান তাই একটু সস্নেহ তর্কে ধীরে ধীরে মনোজকে সেদিন শান্ত করেন: এ ঠিক কথা হল না, মনোজ। সেদিনে কথকতা, কবি পাঁচালি, কীর্ত্তন—এসবই ছিল পাবলিক প্ল্যাটফরম্, লোকশিক্ষার পথ। আজ আরও নূতন নূতন পথ আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে—স্কুল কলেজ লাইব্রেরী সেই নূতন প্ল্যাটফরম, আর মুদ্রাযন্ত্র—সংবাদপত্রও। এই নূতন পথগুলি এখন এদেশে তৈরী করা চাই—তৈরী না করলে এগুলি বিপথ হবে। বন্ধ করলেও হবে না, সে তো গান্ধীজীই করেছিলেন—ব্যাক্ টু ভিলেজ। আমরা চাই 'শিক্ষার মিলন।'

মনোজ আর কথা বলে নাই, সে দেখিল জ্ঞান চৌধুরী

তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে পারিয়াও কথা চাপা দিলেন—উকিলের কৌশলে।

অরুণের প্রসঙ্গে আজ তাই মনোজ সেই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিল। 'ব্যাক টু ভিলেজ' মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু যেখানে শিক্ষা এত অর্থকরী হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কুশিক্ষাই তো হইবে। আর অশিক্ষার অপেক্ষাও কুশিক্ষা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। অরুণের অসাধুতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়া তবে আর লাভ কি? বিশ্ববিদ্যালয়েই যখন এতটা শিথিলতা, অন্যায়, কেলেঙ্কারি প্রশ্রয় পাইতেছে?

জ্ঞান চৌধুরী ভাবিতেই পারেন না—বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ অধোগতি হইতে পারে। হাঁ, বিদ্যা তাহাদের দিনেও অর্থকরী হইয়াছিল। পাশ করিলে তখনো ভাল চাকরি হইবে, ইহা তাঁহারা আশা করিতেন। উৎকৃষ্ট ছেলেরা পরীক্ষা দিয়া সে দিনে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইত। অবশ্য অনেকে তাঁহারা চাকরি করেন নাই—রাসবিহারী ঘোষ, হীরেন্দ্র নাথ দত্তরা ওকালতিতে যাইতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মত কেহ কেহ দারিদ্র্যকেই ব্রত করিয়াছিলেন। তবে চাকরিই করিতেন বেশি, আব চাহিলে সেদিনে চাকরি মিলিত। আজ ইহারা পাশ করিয়াও চাকরি পায় না। বারে তাই ভিড়। ওকালতির সম্মান উকিলের ভিড়ে কমিয়াছে, গান্ধীজীও তাহা বিনষ্ট করিয়াছেন। মাষ্টারি, প্রোফেসারিরও সম্মান নাই, মাহিনা তাঁহারা কম পান—'পজিশান', 'প্রেষ্টিজ' তাই কতটা আর টিকিবে? চারিদিকে এখন শিক্ষিত বেকারের ভিড়, ভদ্রলোকের জীবন-যাত্রা অসম্ভব। ছেলেরা পাশ করিয়াই বা করিবে কি? তাই ভদ্রলোকের ছেলেরা পড়াশুনায়ও আর গুরুত্ব অর্পণ করে না।—কোনো কিছুতেই তাহারা গুরুত্ব দেয় না, সব যেন খেলা, সবাই যেন দায়িত্বহীন। পরীক্ষায় ছাত্রদের নকল করিতে লজ্জা নাই, বিদ্যালয়ের তাহা দমন

করিবার মত দৃঢ়তা নাই। স্কুলের কর্তৃপক্ষের তাহা রোধ করিবার মত আর্থিক শক্তি, আদর্শের স্থিরতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাই বা কোথায়?

জ্ঞানশঙ্কর বুঝিতে পারিতেছেন—সমাজের কেন্দ্রস্থলে ঘুন ধরিতেছে—ধর্মবোধ, ন্যায়ান্যায়-বোধ আর সুদৃঢ় নাই। সবাই ভাবনাহীন, সবাই লঘুচিত্ত—কি অমরের মত বুদ্ধিমান মানুষ, কি অশোকের মত প্রতিভাবান্ মানুষ। মানুষ হওয়াই আজ বড় কঠিন। অরুণের তো কথাই নাই। বিচার-বিবেচনা সে কোনো কালে করিতে পারে না। তাঁহার কন্যা সরযুর কথা মনে পড়িল, কমলার মত মেয়ে তো সবাই নয়,—সরযুও কেমন অবুঝ—যেন অরুণের মত। গভীরতা নাই কোথাও বড় আর, বিষম কাল সম্মুখে।

'এ স্পেকটার ইজ হনটিং ইউরোপ'—ভারতবর্ষেও কি আসিতেছে?

না, ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র, ভারতবর্ষ অদ্বিতীয়। একালের যুবকদেরই আলেয়ায় পাইয়াছে।

মনোজের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জ্ঞান চৌধুরী অরুণের অপরাধ বিচারের কথা বিস্মৃত হন। তাঁহার ব্যক্তিগত নিরাশা, অপমানের উপশম হয়—মন আস্বাদন লাভ করে ব্যাপক ও গভীর একটা বিষাদের:

The time is out of joint.

সন্ধ্যায় আবার জ্ঞান চৌধুরীর মনে পড়িল, অরুণ কেমন করিয়াছে পরীক্ষায়? কি করিয়াছে অরুণ, কি হইতেছে অরুণ? মানুষ হইবে কি অরুণ? মানুষ হওয়া আজ বড় কঠিন। বিষম কাল তাহাদের সম্মুখে। সত্যই কি The time is out of joint?

তবু অরুণ পাশ করিল এবং কলিকাতা পড়িতে গেল।

নৃপেন ও সরযূদের জন্য যে তাঁহাদের কখনো ভাবিতে হইবে, এই কথা জ্ঞানশঙ্কর ও হৈমবতীর ছিল স্বপ্নের অগোচর।

জমিদার বংশের ছেলে নৃপেন। 'বাবুর হাটের বাবু' তাহারা,—পুরাতন মানী ঘর। পরিবারও প্রকাণ্ড, তবে বিষয়-সম্পত্তি এখন অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি বাড়ীতে দালান-কোঠা আছে, পুকুর আছে, জমি জমাও আছে। আত্মীয় অনুগতেরও অভাব নাই,—এমন নামী বংশের তাহা থাকিবেই। সরযূর যখন 'বাবুদের' বাড়ির ছেলের সঙ্গে বিবাহ হয়—নৃপেন্‌ও তখন বি এ পরীক্ষা দিতেছে—সকলে সংযূকে হিংসা করিয়াছে।—'বাবুদের' বাড়ির সে বউ হইবে, বর বি-এ পড়িতেছে কলেজে! সরযূও বুঝিতে পারিয়াছে—সত্যই তাহার গর্ব করিবার মত কারণ আছে। নৃপেন আর বি-এ পাশ করিল না;—'বাবুদের' বাড়ির ছেলের পক্ষে তাহা প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু সরযূ গব বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কমলাকে সে উঠিতে-বসিতে শোনায়—'বাবুর হাটের' বাবুদের বাড়ির কাহারও কোন কালে জীবিকার্জন করিতে হয় নাই। আর কবিরাজী করিয়া, খলে ঔষধ মাড়িয়া, জীবিকা সংস্থান করা—ইহা তো নিতান্তই একটা অদ্ভুত কাজ। কমলার শ্বশুর অবশ্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ;—কিন্তু জমিদার নন; কোনো পুরুষে বলিতে পারিবেন না তাঁহারা ছিলেন 'বাবু' বা 'ভূঞা'।

নৃপেন্দ্র শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে তাহার প্রয়োজন জানাইতে। না, চিত্রিসারে সেবার কাদম্বিনী যতই দুর্ব্যবহার করুন, নৃপেন্দ্র তাহা মনে রাখে নাই। তবে এখানে আসিয়াছে—একটু বৈষয়িক ব্যাপারে।

বিষয়-সম্পত্তি দুই দুইবার খাজনার দায়ে ইতিপূর্বেও নিলামে উঠিয়াছিল। এবারও উঠিবে। এজমালি সম্পত্তি দেনায় জড়িত। কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী এখন যদি নিলামে উহা ক্রয় করেন তবে বেনামীর দায়ে না পড়িয়া সরযূদেরই এই সম্পত্তি হইতে পারে। জ্ঞাতি অংশীদারেরা আপত্তি করিলেও টিঁকিবে না। অবশ্য, নৃপেনদের হাতে এখন টাকা নাই। তাহার পিতা বলিয়াছেন, 'বৈবাহিক একটা বড় উকিল। টাকাটা তিনি জোগাড় করে দিতে পারবেন—টাকা-কড়ি তাঁর রয়েছে; ভাইপো সুরেশ্বরও অমন বড় ব্যবসায়ী।'

নৃপেনকে জ্ঞানশঙ্কর বুঝাইতে পারেন না—সে সম্পত্তি কিনিবার মত টাকা তাঁহার নাই। ইহা কি একটা কথা? তাঁহারই মক্কেল বৈকুণ্ঠ পালেরা সম্পত্তিটা কিনিবার জন্য বসিয়া আছে,—সুরেশ্বরের সঙ্গেই তাহারা কারবার করে—সুরেশ্বরের অপেক্ষা ধনীও তাহারা বড় নয়। তবে তিলি সাহাদের টাকার কথা বলা যায় না। কিন্তু এত দিনকার সম্পত্তিটা কি তাহাদের হাতে যাইবে, উহাই চাহেন জ্ঞান? নৃপেনের পীড়াপীড়িতে সুরেশ্বরকে সত্যই জ্ঞান পত্র লিখিলেন।

সরযূ আরও পাগল। না হইলে তাহার মায়ের সঙ্গেই ক হ জুড়িয়া দেয়—সুরেশ্বর তো কাদম্বিনীর জ্বালাতেই দেশের বাড়িতে পদার্পণ করে না; অথচ হৈমবতী 'দিদি' বলিতে অজ্ঞান। কমলাকেও নানা তিক্ত কথা শোনায় সরযূ।

কিন্তু সুরেশ্বর কাকাকে জানাইল, সম্পত্তি কিনিবার মত সাধ্য তাহার কোথায়? বাধ্য হইয়া হৈমও তাহাকে আবার লিখিল, কিন্তু উত্তর আসে না।

নৃপেন অসন্তুষ্ট হইল। সরযূ কান্না সুরু করিল। এতদিন নৃপেন্ বিষয়সম্পত্তি দেখিত এখন কি শেষে নৃপেনকে চাকরি করিতে হইবে?

এ কি কম লজ্জার কথা জ্ঞান-হৈমর পক্ষে ! তাহা ছাড়া, 'হিন্দু ভদ্র লোকের চাকরিই কি সহজে মিলে ?'—নৃপেন হাসিয়া জানায়,—'এটা প্যাক্‌টের যুগ।' তখন সে বি-এ পাশ করিল না—সম্পত্তি দেখার জন্য সংসারে ডাক পড়িল। বি-এ পাশ করিলে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সে অনায়াসে হইতে পারিত—বাবুর হাটের 'বাবুদের' পক্ষে তাহা দুর্লভ হইত না। এখনো তাহার অনারারি ম্যাজিস্ট্রের হইবার কথা ছিল।

তা নৃপেন অকর্মণ্য লোক নয়। এখানকার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ একটা ম্যানেজারি পদ খালি আছে। টাকা যখন জ্ঞান চৌধুরী দিতে পারিবেন না তখন এই চাকরিটাই নৃপেনকে জোগাড় করিয়া দেওয়া তাঁহার উচিত। জমিদারী শাসন নৃপেনের অভ্যস্ত কাজ। আর বাড়িতে বসিয়া থাকা নৃপেনের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন চলিবেই বা কিরূপে সেখানে ?—সম্পত্তি আসলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে আগেই।

জ্ঞান চৌধুরী বিপন্ন হইলেন। বুঝিলেন, নৃপেন্ এই চাকরির সন্ধান পাইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু জীবনেও যে জ্ঞান এইরূপ হাকিমদের নিকট ছুটাছুটি করেন নাই। এখন তাহা করিবেন জামাইর চাকরির উমেদারিতে ? নৃপেন এই কথা বুঝিবে না, সরযূও বুঝিতে চাহে না।

হৈম বলিল : বেশ তো মনোজকে বলো না হয়।—সে তো জজ-সাহেবের ছোট ছেলেকে পড়ায়।

জ্ঞান বুঝিলেন হৈমকে কে এই তথ্য ও বুদ্ধি জোগাইতেছে। হাসিয়া বলিলেন : জজসাহেব কি করবেন ? আর মনোজই কি তেমন মানুষ ?

কিন্তু উপায় নাই ; নৃপেন্দ্র সরযূ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। তাহা ছাড়া সত্যই বিপন্নও হইবে সরযূ। তাহাদের দুইটি ছেলে-মেয়ে। সুন্দর চট্‌পটে তাহার পাঁচবৎসরের ছেলেটি। জ্ঞানের কোলের কাছটি ঘেঁসিয়া

বসে সকালে-বিকালে। জ্ঞান চৌধুরীর একটা চেষ্টা করিতেই হইবে—ইহাদের জন্ত। মনে পড়িল—কুমুদকে। হাকিম মহলে সে গতায়াত করে। ভবিষ্যতে একদিন গবর্ণমেণ্ট প্লীডার হইবার আশা সে পোষণ করে, এই ভাবে সেই আয়োজনই কুমুদ করিতেছে।

কুমুদ শুনিয়া বলিল: নিশ্চয়ই। এ কাজ আর করব না?

এদিকে সুরেশ্বরও হৈম'র পত্রের উত্তর দিয়াছে—বিষয়কর্মে বাহিরে গিয়াছিল। তাই এতদিন উত্তর দিতে পারে নাই। কিন্তু কাকীমা তো জানেন—তাহার হাতে টাকা থাকিলে কথা ছিল না। কাপড়ের কল বসাইতে অনেক টাকা লাগিতেছে: সেই জন্ত ধারও করিয়াছে। কিন্তু আরও টাকা চাই। অথচ চা-এ সে দেখিয়া আসিল জলপাইগুড়িতে কত লাভ! কাকাও তাহা জানেন। সুরেশ্বরের থাকিবার মধ্যে আছে এখন চিত্রিশারের বাড়ির অংশটুকু। তাহা যদি জ্ঞান বা অমর ক্রয় করেন,—অন্ত কাহাকেও সুরেশ্বর তাহা বিক্রয় করিতে চাহে না। 'বাবুর হাটের' বাবুদের সম্পত্তি কথা? উহাতে হাত দিতে জ্ঞানও তাহাকে বলিবেন না। ভাগ-বাঁটোয়ারের পরে উহার আছে কি? কত খানে কতবার তাহা বন্ধক পড়িয়াছে, ঠিক নাই। বিশেষত, জমি-জমায় সুরেশ্বরের আস্থা নাই। খাল-পুকুর কচুরিতে ভরিয়া যাইতেছে। নদীনালা হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে। হয় অনাবৃষ্টি, নয় প্লাবন—বৎসরে বৎসরে এই হাহাকার লাগিয়াই আছে। জমিতে তবে ফলে কি? অবশ্য জমিদারীতে সম্মান একটা আছে—তাহা যাহারা নূতন ভদ্রলোক হইতে চাহে, তাহারা দেখুক। চিত্রিশারের চৌধুরীদের সেই 'বাবু' নাম না হইলেও লোকে চিনিবে। তারপর, প্রজা রায়ত একালে যেমন বজ্জাত ও বেয়াদব, আর নায়েব-গোমস্তরা যেরূপ অসৎ ও সয়তান—তাহাতে এই সব জমিদারী তালুকদারীতে আর

ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম থাকে না। নৃপেনকে বরং কাকা বিজ্‌নেস্‌-এ যাইতে বলুন। ইনশিওরেন্‌স্‌ দেখুক না?

এবার নৃপেন বিষম রুষ্ট হইল, পাটের দালালি আর তাঁতীর সর্দারি করিয়া সুরেশ্বর চৌধুরী আজ দুইটা পয়সা করিয়াছে। তাই মান-সম্ভ্রমের কথা সে বুঝায় নৃপেনদিগকে—'জমিদারীতে মান-সম্ভ্রম' থাকে না!

কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী বুঝিতে পারিয়াছেন বাবুর হাটের বাবুদের সম্পত্তি রক্ষা আর সম্ভব নয়। নৃপেন হয়ত তাহা বুঝিয়াও বুঝিবে না। সে বুঝিবে না যে, ব্যবসাপত্রে ভদ্রলোকের সম্মান সাধুতা বিসর্জ্জন দিতে হয়, ইহা ঠিক নয়। বিভূতিশঙ্কর কি নৃপেন বা বাবুর হাটের কোনো 'বাবুর' অপেক্ষা মান-সম্ভ্রমে, ঔদার্যে আভিজাত্যে খাট ছিলেন? আসল আভিজাত্য—এ দেশের আভিজাত্য—অর্থের ভিত্তিতেও গড়িয়া উঠে নাই ভূসম্পত্তিতেও গড়িয়া উঠে নাই,—এই কথা নৃপেনও বুঝিবে না, সুরেশ্বরও বুঝিবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়াই আমাদের আভিজাত্য জন্মে। নোবলেস্‌ ওব্‌লিজে ;—মহত্ব সেইখানেই প্রকাশ পায়; উদার দায়িত্ব পালনেই মহত্ব। আসলে তাহা তো ঋণ স্বীকার মাত্র ;—আর এই ঋণ সমাজের সকলেরই আছে ;—আভিজাত্যও তাই সকলেরই আছে। ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের, এমনকি শূদ্রেরও আভিজাত্য আছে। কাহারও 'আভিজাত্য' কাহারও তুলনায় ছোট নয়—প্রত্যেকের 'আভিজাত্য' তাহার নিজ নিজ কর্তব্য পালনে, সংযমে, শৃঙ্খলায়; নিজ নিজ জীবনশ্রীকে ফুটাইয়া তোলায়; আর সকলে মিলিয়া এই দেশের সাধনাকে রূপদান করায়।···কে বুঝিবে সেই কথা—অশোক? অমর? না সুরেশ্বর? নৃপেনের কথা বলিয়া আর তাহা হইলে কি লাভ?

তথাপি জ্ঞান চৌধুরীর দুঃখ হয়—এই পুরাতন 'ঘরগুলি' পড়িয়া

যাইতেছে। 'বাবুর হাটের' কথা তো সামান্য, 'বারাহীপুরের' রাজারাও ঋণে জড়াইয়া পড়িয়াছে। দুঃখের কথা সমাজের পক্ষে। নৃপেনের মত পুরাতন পরিবারের বংশধরেরাও বুঝে না—গৌরব তাহাদের কিসে। 'বাবুদের' সেই ঔদার্য মর্যাদাবোধ কোথায় গেল?

The homely beauty of the good old cause
Is gone. Our peace, our fearful innocence,
And pure religion breathing household laws.

দুঃখের কথা—নৃপেন এখনো বুঝিতে পারে না যে, মিথ্যা গর্ব করিবার দিন আর নাই। কী বিষম কাল তাহাদের সম্মুখে। কত অনিশ্চিত আজ ভদ্রলোকের জীবন-যাত্রা! চাকরির অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসা কি অপমান জনক?

নৃপেন কিন্তু অপেক্ষা করিতে লাগিল। বিশেষ তাড়া নাই, চাকরিটা সে নিশ্চয়ই পাইবে। মাসখানেক পরে কুমুদ জানাইল: কালেক্টার সাহেব স্থির করেছেন—ওপদে একজন ল' গ্র্যাজুয়েট নেবেন—'প্রেফারেবলি এ মোহামেডান্।' নৃপেন বুঝিল—কুমুদ তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। আর এই প্রতারণায় সে সমর্থ হইল জ্ঞান চৌধুরীরই ঔদাসীন্যে। তিনি ইচ্ছা করিলে এই চাকরি নৃপেনের না হইয়া যাইত না; তিনি ইচ্ছা করিলে সম্পত্তিটাও রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন।

রীতিমত ক্ষুব্ধ হইল নৃপেন। অভিমান করিয়াই সরযূও তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া বাবুর হাটে ফিরিয়া গেল।

হৈম দুঃখ অশান্তির মধ্যেও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। বড় আদরে মানুষ হইয়াছিল সরযূ তাহার পিতামহী ও পিতৃব্যের নিকট। বহু যত্নে ভালো ঘরে তাহার বিবাহ দিয়া সুখী হইয়াছিলেন জ্ঞান ও হৈম।

কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। আর বরাবরকার অবুঝ সরযূ তাই আরও বেশি অবুঝ হইয়াছে। তেমনি নৃপেনও ;—বুঝিতেই চাহে না কোনো কথা। তবু বড় সুন্দর হইয়াছে তাহার ছেলেমেয়ে দুইটি! সেই শিশুদের অভাবে হৈমবতী সত্যই আরও বেদনা পাইত, কিন্তু কমলা ও তাহার শিশুপুত্র তাহার মন জুড়িয়া রহিল। একটা স্বস্তিও তাই হৈম পাইল—থাকুক নৃপেন সরযূ আপনাদের সংসারে সুখে দুঃখে।

কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই সরযুকে লইয়া নৃপেন্ ফিরিয়া আসিল। বাবুর হাটে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন আর পিতা চালাইতে রাজী নন। পিতার সহিত, মাতার সহিত এই কলহ পূর্বেই নৃপেনের আরম্ভ হইয়াছিল। এই কারণেই সে সেবার চিত্রিসারেও গিয়াছিল সরযুকে লইয়া। কিন্তু এখন আর পিতা-পুত্রের কলহ কেহই গোপন রাখিতে উদ্যোগী নন। জ্ঞান চৌধুরী বুঝিলেন—দুর্দিনে বাবুদের মান-সম্ভ্রম বোধও আর রহিল না। কিন্তু ইহাও তিনি বুঝিলেন—নৃপেনকে এইবার দশজন ভদ্রলোকের মত উপার্জন করিতে হইবে, আর তিনি উদ্যোগী হইয়া উহার ব্যবস্থা না করিলে নৃপেন কাজকর্মে পরে আর বিশেষ আগ্রহ না দেখাইতেও পারে,—তাহাতে জ্ঞান চৌধুরীর পক্ষেই বিপদ আরও বাড়িবে।

বারাহীপুরের রাজাদের উকিল জ্ঞানশঙ্কর। এদিকে জমি জরিপ আরম্ভ হইয়াছে। সরকারী কার্যে ঢুকিবার মত বয়স নাই নৃপেনের। কিন্তু জমিদারেরাও জরিপ সংক্রান্ত কাজে নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করিতেছেন, একজন থাকিবেন ইহার ভারে। মণীন্দ্রের দাদা সুরেন্দ্রের এই কাজটি পাওয়া প্রায় সুস্থির। কিন্তু বড় রাজা বাহাদুর জ্ঞানবাবুর পত্র পাইয়া নৃপেন গাঙুলীকেই সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। অবশ্য ছোট রাজাই এখন সম্পত্তি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন—পিতাকে বৃদ্ধ বয়সে

অবসর দেওয়াই তাঁহার ইচ্ছা। ছোটরাজা কর্মচারীর জামিন চাহিলেন পাঁচ হাজার টাকা। এত টাকা জ্ঞান কোথায় পাইবেন? সুরেশ্বরের নিকট আশা করা যায় না,—হয়ত অমরের সঞ্চয় আছে তাহার বিলাত-যাত্রার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অমরের নিকট তাহা চাহিতে জ্ঞান চৌধুরী পারিবেন না। অমরের প্রতি তিনি মমতাই পোষণ করেন,—সে তাহার পিতৃব্যকে উপেক্ষা করে নাই। জ্ঞানও তাহার প্রতি অবিচার করেন নাই। কিন্তু তাহার সঞ্চিত সেই টাকা এখন চাহিলে বুঝি জ্ঞানশঙ্করের সম্মান বাঁচিত না, হয়ত তাহা অন্যায়ই হইত। ব্যাংক হইতেই হাজার তিন টাকা ধার করিলেন জ্ঞান চৌধুরী। কাছারি পাড়ায় একটা বাড়িও নৃপেনের মিলিয়া গেল—যে ভাবে নদীতে শহর ভাঙিয়া যাইতেছে তাহাতে একটা বাসা-বাড়ি পাওয়াও এখন সৌভাগ্য।

ভার লাঘব হইল, কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী আর ভালো করিয়া মণীন্দ্রের সহিত কথা কহিতে পারেন না। অবশ্য মণীন্দ্র তাঁহার স্নেহের পাত্র। অমরের সে বন্ধু। ওকালতিতে ভালো করিতে পারিতেছিল না, জ্ঞানই তাহাকে স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনার কাজ গত বৎসর জোগাড় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মণীন্দ্র তাহা না ভুলিলেও সুরেন্দ্র তাহা বুঝিবে কেন.? তবে পাঁচ হাজার টাকা জামিন মণীন্দ্র জোগাড় করিতে পারিত না; আর মণীন্দ্র হয়ত জানে,—মনোজের নিকট, বিজয়ের নিকট শুনিয়া থাকিবে,—নৃপেন্দ্রকে লইয়া জ্ঞান চৌধুরী কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কি করিত নৃপেন সরযু তাহাদের ছেলে-মেয়েদের লইয়া? দুইটিও নয়, তিনটি এখন তাহাদের সন্তান। আর, কন্যা-জামাতা লইয়াও জ্ঞান চৌধুরীকে বিপন্ন হইতে হইল। অত নাম ছিল তখন বাবুরহাটের বাবুদের—কোথায় বা সে নাম, কোথায় বা তাহাদের মর্যাদা বোধ?—ভাঙন ধরিয়াছে সমাজে সংসারে।

কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী মনের একটি অংশে বুঝিতেছিলেন—শুধু সংসারে নয়, সমাজে নয়, তাহারও জীবনের কোনো এক কূলে যেন ভাঙন ধরিতেছে। তাই বলিয়া নিজের নিকট সেই কথাটা সহজভাবে স্বীকার করিতে পারিবেন কিরূপে? অরুণ পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়াছে শুনিয়া যেমনি তাঁহার মন স্তব্ধ হইয়াছিল তেমনি আবার সহজেই এই সান্ত্বনাও সেই মন মানিয়া লইল—কি করিবে ইহারা? ইহাদের ভবিষ্যৎ যে বড়ই অনিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে। নৃপেনকে বারাহীপুরের কাজটা জোগাড় করিয়া দিতেই কি কম বেগ পাইতে হইল? জামিন—পাঁচহাজার টাকা, কিই বা ইহার স্থায়িত্ব? রাজারা মারোয়াড়ীদের নিকট ঋণে বাঁধা পড়িতেছে। বড় রাজা শুধু খরচ কমাইতে পারিবেন না—দান ধ্যান পণ্ডিত ও গান বাজনা বাঈজী সবই তাঁহার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ছোট রাজাও খরচ কমাইতে গিয়া সকলকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি ইংরেজি-চালে মানুষ, ইংরেজ গবর্ণেস্, ইংরেজ গার্জিয়ান টিউটারের নিকট তাঁহার শিক্ষা। লাইট হর্সের একজন নায়ক, জঙ্গি সাহেবদের সঙ্গে তাহার দহরম-মহরম। ব্রিটিশ ল্যাণ্ডলর্ডের আদর্শে তিনি জমিদারী পুনর্গঠন করিতে চান—নূতন জরিপে তাঁহার সেই সুযোগ উপস্থিত। মহাল কন্সলিডেটে করিতে হইবে, তাহার পর কিছুটায় প্রজা পত্তন করিবেন, আর কিছুতে ইংরেজি নিয়মে ফার্মিং করিবেন, কলের লাঙল আনিবেন, বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী প্রবর্তন করিবেন; সেই সবের জন্য কয়েকটা মহাল পত্তন দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন; একটা ফিশারি ও একটা কয়ার-নাট ইন্ডাষ্ট্রির কথাও ভাবিয়াছেন। ভাবিয়াছেন তিনি অনেক। কিন্তু কলিকাতায় তাঁহারও দেশী-বিদেশী নানা খরচ—ডিনার, রেস্ আছে, মিলিটারির সাহেবদের নিকট না হইলে পজিশ্যান্ থাকে না। অথচ বাজে দান, সাহায্য প্রভৃতি কমাইতে গেলেও বড় রাজা আপত্তি

করেন। টাকা চাই,—ছোট রাজা তাই হুকুম দিলেন কর্মচারীদের জামিন দিতে হইবে। অথচ কি স্থায়িত্ব নৃপেনের এই কাজের?

দেখুক নৃপেন্দ্র কি করিতে পারে সে এখন। জ্ঞান তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে। না করিলে চলিবে কেন? সংসার বড় হইতেছে—অথচ পিতা দেখিবেন না ত কে দেখিবে সরযুকে? অথচ বড় জটিল দিনকাল, বড় কঠিন জীবন-যাত্রা, ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত।

ঝড়ের মত অশোক আসিয়া উপস্থিত। হঠাৎ কেন? হৈমবতীও জ্ঞান উল্লসিত হইতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। কিছু একটা উদ্দেশ্য যেন আছে অশোকের, মুখে যতই বলুক—-কিছু নয়। পুলিশের কোনো হাঙ্গামা নাই তো আবার? বিজয়ের সঙ্গে কি বিষয়ে তর্ক করিতেছে অশোক; সুমন্ত্রদের আখড়ায় গিয়া গালাগালি করিয়াছে ছেলেদের; তারপর মোহন দাসকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে শুয়োচকের দিকে।—সেখানেই একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে না? নূতন জরিপের সুযোগে বারাহীপুরের রাজারা এই অঞ্চলটাকে খাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে জ্ঞানশঙ্করের কৃতিত্ব ছিল—আইনের কয়েকটা সূক্ষ্ম প্যাঁচে তিনি প্রমাণ করিয়া ফেলিলেন—জমি প্রজাদের নয়, রাজার। বিবেক-বুদ্ধি অবশ্য খুশী হয় নাই! কিন্তু তিনি করিবেন কি? আইনের যেরূপ বিধান, উকিল হিসাবে তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। তবে ছোট রাজা কাজটা ভালো করেন নাই, ধর্ম-সঙ্গত হয় নাই। ইংলিশ ল্যাণ্ডলর্ডের আদর্শে তিনি ল্যাণ্ড ডেভেলাপ করিবেন। চাষী কৈবর্ত প্রজারা উপায় দেখিতেছিল না—এত কাল যে জমি তাহারা ভোগ করিতেছিল এখন তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে—তাহাই নাকি আইন-সঙ্গত

কিন্তু পার্শ্বের মহালের মুসলমান প্রজারা হঠাৎ একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিল।

রেলওয়ের একটা সাহেব আসিয়াছিল এক বাঙালী মেম সাহেবকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের জলা-জমিতে বুনো হাঁস শিকারে। গ্রামের লোক নিষেধ করে। বিশেষ করিয়া মুসলমান চাষীরা ন্সারাদের উপর চটিয়াই ছিল, খেলাফতের ঝাঁঝ তাহাদের মন হইতে যায় নাই। তাহা ছাড়া, একা একা একটা ইংরেজের সঙ্গে শিকারে আসিয়ে কেন এই দেশের মেয়ে এমন নির্লজ্জর মত ?—কিন্তু সাহেব হাঁস শিকার করিয়াও থামিল না। গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া তাহার পেয়াদারা মুর্গী-আণ্ডা লইয়া আসিল, কেহ দাম পাইল না,—বেয়ারারা গৃহস্থদের বরং অপমান করিল। গ্রামের লোক ক্ষেপিয়া গেল। অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া রক্ষা পাইয়াছেন মেমসাহেব, সাহেবকেও তাহারা শুধু সামান্য কিল-চড় দিয়াছে, গাড়ীটাই তাহার বেশি জখম হইয়াছে। ইহার পরে—সদর হইতে পুলিশের অভিযান সদর্পে যাইতেছিল, গ্রাম ঠাণ্ডা করিবে। কিন্তু ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের দূত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে খাঁ বাহাদুরও ব্যাপারটা মিটাইতে গেলেন—লোকটির দায়িত্ব বোধ আছে, বুদ্ধিও আছে। গ্রামের মোড়লরা ক্ষমা চাহিতে রাজী।—অর্থাৎ তাহারা স্বীকার করিল—দত্ত সাহেবের স্ত্রী হাজার হোক্ দেশের মেয়ে, তাঁহার অপমান হইয়াছে ঠিকই। কিন্তু তিনিই বা সাহেবটার সঙ্গে আসিয়াছিলেন কেন ? খাঁ বাহাদুর মানিলেন—সহবৎ-শিক্ষা এই সব মেয়েদের হয় নাই। কিন্তু তিনি মাতব্বরদের শহরে লইয়া আসিলেন। শহরে পৌঁছিতেই তাঁহাদের কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। যাহা তিনি বলিলেন তাহাই মাতব্বরেরা করিলেন,—জমিদার বাবুর ম্যানেজারও বসিয়া আছেন যে। অর্থাৎ তাঁহারা ক্ষমা চাহিলেন। খাঁ বাহাদুরের মিশন সাকসেসফুল

হইল। হয়ত আগামী বৎসর তাহার পুত্র নমিনেশনে সব রেজিষ্টার হইতে পারিবে। অন্তত গ্রামটা পুলিশের হাত হইতে রক্ষা পাইল।

গ্রামে এই সব সংবাদ পৌঁছে নাই। গ্রামের লোকের সাহসও কমে নাই। জরিপের লোকজন আসিয়া এখন গ্রামে বাড়াবাড়ি করিতেছিল। জমিদাররাও কৌশল করিয়া জলাটা লইয়া টান দিল। অমনি গ্রামের লোক বাধা দিল—জমিদারের একদল লোককে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিল।

এইবার সাহস পাইল নমঃশূদ্র হিন্দুরা, সাহস পাইল শুয়োচকের প্রজারা। 'প্রজা বিদ্রোহ' দেখা দিল—ছোট রাজার স্কিমের বিরুদ্ধে। নৃপেন্ কাজটা হাতে লইয়াছে—সে ডেভেলাপমেণ্ট্ ম্যানেজার; এক আধটা 'প্রজা বিদ্রোহে' সেও ভয় পায় না। বাবুর হাটের বাবু তাহারা, প্রজা ঠেঙাইয়া জমিদারী করা তাহার রক্তে,—আজই না হয় সে চাকরি করে। ছোট একটা দাঙ্গা হইল। পুলিশ লইয়া, পাইক লইয়া নৃপেন নিজেও গেল শুয়োচকে।—শায়েস্তা করিয়া আসিবে 'হেলে' ব্যাটাদের। মুচলিকা দিতে হইবে, জোয়ান পুরুষদের।—আর বাচ্চা ও মেয়েগুলি? পুলিশ যখন গ্রামে তখন ইহাদের অবস্থা বুঝাই সহজ। প্রজারা নিরুপায়।

গ্রামের পাঠশালার গুরু মোহনদাস তাই শহরে বসিয়া ছিল। তাহার সঙ্গে কাহাকেও কিছু না বলিয়া শুয়োচকে চলিয়া গেল অশোক। ফিরিল দিন কয় পরেই। সেই থানা হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া হুকুম জারি করা হইয়াছে। হুকুম অমান্য না করিয়া অশোক ফিরিবে, তাহা অভাবনীয়। কিন্তু অশোক ফিরিয়া আসিয়াছে। নৃপেন্দ্র যেন তাহাতে আশ্বস্ত বোধ করিল—যত বড় বড় কথা মুখেই, আসলে জেলখানাকে কে ভয় না করে?

পরিহাস হইতে তর্ক, তর্ক হইতে মনোমালিন্য বাধিয়া যায় এই উপলক্ষে অশোকের সহিত নৃপেনের ।

কি, জামিন পেলে না তোমরা ?—চাপা হাসি গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আসে নৃপেন।

না পাওয়ারই কথা।—অশোক গম্ভীর মুখে উত্তর দেয়।

কেন, এত নিরাশ যে ? এত লেখেন মা তবু বাড়িতে আসছ না। ছুটে এলে শুয়োচকের প্রজা-বিদ্রোহ শুনেই। তা'হলে পুলিশের একটা হুকুম দেখেই চুপ করে গেলে যে।

পুলিশকে ভয় করব না, এত বন্ধুত্ব তো পুলিশের সঙ্গে নেই।—বক্রভাবে অশোক উত্তর দিল।

তুমি কি ভেবেছিলে—পুলিশ তোমাকে ছেড়ে দেবে ?

পাগল ! পুলিশের তোমরা হলে পুষ্যিপুত্তুর। জমিদার তো নয়। জমিদাররা এদেশে ইংরেজের জারজ পুত্র।

কথাটার কি অর্থ নৃপেন বুঝিল, ঠিক নাই। একটা গর্হিত গালাগাল কল্পনা করিয়া সে ক্রুদ্ধ অকথ্য ভাষায় চীৎকার আরম্ভ করিল।

কি হইল ?—হৈমবতী ছুটিয়া আসিল। কিছুই সে বুঝিতে পারে না। বিভ্রান্ত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সে বলিতেছে : কি হ'ল, কি হ'ল ?

নৃপেন তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া অশোককে বলিতেছে : তোমার মত কত বদমায়েসকে জ্যান্ত পুতে ফেলেছি আমরা।

মাকে দেখিয়া অশোক হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। হৈমকে বলিল : চলো, এসব 'বাবু ভুঞাদের' কথাবার্তা শুনে কি হবে ?

হৈম গেল না। অশোকই চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তথাপি নৃপেন রাগে গুমরাইতে লাগিল ;—হৈমকেও গণনার মধ্যে আনিতে চাহিল না। তারপরে নিজ বাড়িতে ফিরিয়া গেল,—চা'-জলখাবার স্পর্শ

করিল না। হেম'র নিকট নৃপেনের ক্রোধ নির্বুদ্ধিতা সবই ইতর বলিয়া মনে হইল। জ্ঞানেব তো তাহা পূর্বেই জানা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া অশোককে কি ক্ষমা করা যায়? নৃপেনকে তো অশোকও জানে। তাহা ছাড়া, এই শুয়োচকের 'প্রজা-বিদ্রোহের' ব্যাপারে অশোকের কি? সে কি এই জন্যই কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছে নাকি?

বিজয় বলিল: জানেনই তো তা।

বিজয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ব্যাপারটাকে মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে, মদন দাসের সঙ্গে কথা হইয়াছিল। কিন্তু অশোকের তো মীমাংসা চাহে না, তাহারা চাহে সংঘর্ষ। বিজয়দা'র সহিত এই সব বিষয়ে ইতিপূর্বে তর্ক হইয়াছে, এবার হইয়াছে রীতিমত ঝগড়া। মদন দাস অশোককে পাইয়া বলিয়াছে। নৃপেন তো দূরেব কথা, সম্ভবত: জ্ঞান চৌধুরী বলিলেও অশোক নিরস্ত হইত না। কারণ, প্রজারা জমি হারাইল তো জ্ঞানের জন্যই।

জ্ঞান বুঝিলেন বারাহীপুরের প্রজা-বিদ্রোহ তো নয়, ইহা জ্ঞান চৌধুরীর বিরুদ্ধে অশোকেরই বিদ্রোহ। এতদিন চোখের আড়ালে ছিল; এবার একেবারে চোখেব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল অশোক—বুঝি 'যুদ্ধং দেহি'?

সেই অশোক—যাহার জন্মক্ষণে জ্ঞান চৌধুরী মনে করিয়াছিলেন তিনি অমরত্বের আস্বাদন লাভ করিলেন;—আত্মজের মধ্য দিয়া তাঁহারও আত্মা ব্যক্তি-জীবনের আয়ু ও স্নায়ুব পরিধি উত্তীর্ণ হইয়া কালাকালহীন অসীমেব মধ্যে আপনাকে মুক্ত করিয়া দিতে চলিল;—তাঁহার এবং আরও কত কত পূর্বজের স্বপ্ন এবার সংসারের ধূলি-ধূসরিত এই চৌধুরী গৃহের আঙিনায় রক্তমাংসময় এই অদ্ভুত অপূর্ব সত্যে রূপায়িত হইতে থাকিবে—

সেই অশোক অত সূক্ষ্ম অনুভূতি-সমৃদ্ধ ছিল যাহার প্রথম জীবনের দিনগুলি—ভারতবর্ষের শিক্ষা, সাহিত্য, সভ্যতার আদর্শে যে প্রাণ মনে ভালোবাসিত;—আপনার সমস্ত সম্ভাবনা,—তাহার পিতার আশা, মাতার আকাঙ্ক্ষা, যে সেই স্বাধীনতার স্বপ্নে বিলাইয়া দিয়া জেলে গেল, গ্রাম সংগঠনে মাতিল, শেষে গান্ধী-আশ্রমে আপনাকে লুপ্ত করিতে চাহিল;—সেই অশোক শুধু তাহার 'স্বধর্মই' বিস্মৃত হয় নাই, সে সমাজ-ধ্বংসী বিশৃঙ্খলায় আপনাকেই লুপ্ত করিতে চাহিতেছে। কিন্তু শুধু আর আপনাকেই সে লুপ্ত করিবে না;—এই তাহার ধর্মহীন, কল্যাণহীন, বিশৃঙ্খল আত্ম-অস্বীকৃতির অধ্যায় সে তাহার পিতার চোখের সম্মুখেই উদ্‌যাপিত করিবে—শুধু আত্ম-বিলোপ নয়, উহা পিতৃ-পীড়নও!—এত ভয়ঙ্কর অশোক, এত নির্মম সে কেমন করিয়া হইল?

৮

বিশৃংখল কালের পরোয়ানা এবার চারিদিকেই পাঠ করা যায়; না দেখিয়া উপায় আছে?

সামান্য ব্যাপারই মেনকা সুন্দরীর ব্যাপারটা। এমন ঘটনা হয়ত বরাবরই ঘটিয়াছে—বিজয়ের নিকট অশোকের এই মর্মের মন্তব্যও হয়ত মিথ্যা নয়—'ষাঁড় ও বাঁড়ীতে কবে কতটা তফাৎ করতেন সমাজ-কর্তারা?' এরূপ ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটিবে—বলে বিজয়, বলে মনোজ, জানেন তাহা জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীও। হিন্দু সমাজে বিধবা, বিশেষত বাল-বিধবার সমস্যা যত দিন আছে ততদিন এরূপ ঘটনার কারণও থাকিয়া যাইবে। সেই কারণ আরও বৃদ্ধিই পাইতেছে। সেদিনও হিন্দু নিম্ন বর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজ উচ্চবর্ণের মত সেই সব বর্ণেরা

ভদ্রলোক হইতেছে, 'সমাজ-সংস্কার' করিতেছে ; তাই তাহারা বিধবা বিবাহ তুলিয়া দিতেছে। অথচ বাল-বিধবার সংখ্যা ইহাদের মধ্যেই আরও বেশি, কন্যাপণে বয়স্ক পুরুষের বালিকা কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়। তাহারা বিধবা হইলে পূর্বেও বহুস্থলে যাহা ঘটিবার এখনো তাহাই ঘটে। শুধু বিধবাদেব বিবাহ আর হয় না। পুত্রকন্যা লইয়া সংসারেব একজন তাহারা হইতে পারে না—গৃহকর্তার রক্ষিতারূপেই থাকে। ইহারা যদি কেহ পূর্বে মুসলমান বিবাহ করিত, মুসলমান হইত, কেহ তাহা লক্ষ্যও করিত না। হিন্দু-সমাজের তাহাতে কোনো ক্ষোভ ছিল না, মুসলমান সমাজেও তাহা ছিল সাধারণ ঘটনা। এখন কিন্তু তাহা আর নাই। মুসলমানরা শহরের বড় মসজিদে সংবাদটা সগর্ব্ব ঘোষণা করে 'ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে' কে আশ্রয় লইতেছে ; তাবপর সেই নবদীক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা বা জেনানাকে লইয়া মহাসমাবহে মিছিল হয়। হিন্দু-সমাজও আর তাহা অবজ্ঞার চক্ষে দেখে না, তাহাদের মুখে এখন কালি পড়ে। হিন্দুর সংখ্যাল্পতা আর তো উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়। ডিমোক্র্যাসির দিন আসিয়াছে, মানুষের একটা মূল্য আছে। সেই মানুষই যদি না থাকে তবে হিন্দুধর্ম থাকি:ব কি লইয়া ?

মেনকা সুন্দরীর ব্যাপারটাও এইরূপেই শেষ হইতে পারিত। কিন্তু হইল না। কারণ, কোথা হইতে পিছনে দাঁড়াইয়াছিল সেই গ্রামের এক কায়স্থ ভদ্রলোক, আর সঙ্গে সঙ্গে মেনকার ভগ্নীপতি একজন আসিয়া সদরে দরখাস্ত করিয়া দাঁড়াইল,—মেনকা স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে নাই, সে সাবালিকাও নয়, ইত্যাদি। হিন্দুরক্ষা সভার সেক্রেটারি উদ্যোগী হইলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট জ্ঞান চৌধুরীও ব্যাপারটাতে অবহিত না হইয়া পারেন না। মেনকাকে সাবালিকা না বলিবার উপায় নাই। কিন্তু হাকিম যাহা স্পষ্ট বুঝিলেন না তাহা মেনকার মত। তদন্ত সাপেক্ষে মেনকাকে তিনি

তাহার ভগ্নীপতির রক্ষণাবেক্ষণে দিলেন। তাহারা যখন গৃহে ফিরিবে তখন গ্রামের রেল ষ্টেশনের বাহিরেই মেনকাকে একদল মুসলমান কাড়িয়া লইয়া গেল। ইহার পরে একে একে ঘটিয়ে গেল অনেক ঘটনা —সকলেই জানে, অথচ পুলিশ আর মেনকা সুন্দরীর সন্ধান পায় না। তবু একজন হিন্দু দারোগাই এক মুসলমান মোক্তারের বাড়ি হইতে মেনকা সুন্দরীকে উদ্ধার করিল। এবার মামলা মোকদ্দমা—দারুণ উত্তেজনা; শহরে হিন্দু মুসলমানেরও একটা রেশারেশি।

কিন্তু জ্ঞানশঙ্কর বোঝেন না—সত্যই সমাধান কোথায়? গ্রামের যে তালুকদার ও মেনকার যে ভগ্নীপতি হিন্দুদের অবলম্বন তাহাদেরও সুনাম নাই;—বিজয় তাহা নিজে অনুসন্ধান করিয়া স্থির জানিয়াছে। আর থাকিলেই বা কি? মেনকা বড় জোর না হয় থাকিবে হিন্দু-সমাজে—ভগ্নীপতির রক্ষিতা! কেহ তাহাকে বিবাহ করিলে হইত।

অশোক তর্ক করিল না, বলিল, হিন্দু সমাজে তাহা হয় না। চিত্রিসারেই তো ইন্দুমতী আছেন—তাঁহাদের নিজ পরিবারে। তাঁহার বিবাহের কথা অশোক কাদম্বিনীকে সেবার বলিলে কাদম্বিনী পর্যন্ত ক্ষেপিয়া গেলেন।

জ্ঞান চৌধুরী শুনিয়া বুঝিলেন; বলিলেন,—এ কথা তুলে কি লাভ? কে ইন্দুকে বিয়ে করত?

অশোক বলিল, কেন? এত উৎসাহী লোক তো আছেন হিন্দু সমাজে। বিজয়দা' করুন না? ওঃ, তিনি কায়স্থ। মনোজদা' —সর্বনাশ, বিপত্নীক হলেও তিনি যে বড় পণ্ডিত গোষ্ঠীর ছেলে, ভুলে গেছলাম। তবে আর কি হবে? অমরদা'র কথা বলতাম—কিন্তু ওঁর উপর আমার আর শ্রদ্ধা নেই। বিয়ে করব বলেও আপনাদের ভয়ে তিনি নিজের বাগ্‌দত্তাকে বিয়ে করতে পারেন না—এমন কাওয়ার্ড!

তর্ক না করিলেও অশোকেব বিচার বিবেচনা নাই। জ্ঞান চৌধুরী চুপ করিয়া থাকেন। সমস্যাটা ইন্দুমতীকে লইয়া নয়, মেনকা সুন্দরীকে লইয়া। আর শুধু বিধবা বিবাহের প্রশ্ন তো নয়, আইনেরও প্রশ্ন। তাহা ছাড়া আরও জটিল প্রশ্ন জড়াইয়া আছে—অশোক তাহার কি বুঝিবে? বার লাইব্রেরীতে খাঁ বাহাদুরের মত পদস্থ মুসলমানও নির্বিকার নাই। সেদিন বলিয়া বসিলেন;—হিন্দু মেয়েদের উপর মুসলমানদের আজকাল আর শ্রদ্ধা থাক'বে কি করে? বড় বড় এ্যারিষ্টোক্রাট ও বিলাত ফেরৎ ঘরের মেয়েবা যে সব কাণ্ড করছেন তা তো আপনারাও সকলেই দেখছেন।

কথাটায় একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট। তাহা শহরে ইতর-ভদ্র-সমাজে আলোচিতও হয় এখন। মেনকা সুন্দরীব ব্যাপারটা উত্তেজনার কারণ না জোগাইলে হয়ত তাহা মুসলমান সমাজের এত উপহাসের বিষয় হইত না। অন্তত খাঁ বাহাদুর তাহার উল্লেখ করিতেন না। কারণ, তিনি ইতর লোক নহেন। তাঁহার সঙ্গে কথা কাটাকাটি না করিয়া জ্ঞান আপনাকে সংযত করিলেন। সমস্যাটা শুধু ইন্দুমতী বা মেনকা সুন্দরীর নয়; না, শুধু বিধবা বিবাহের নয়। আরও মূলের কথা, আরও গুরুতর প্রশ্ন—সমাজের তলায় ঘুন ধরিতেছে। একটা বিশৃঙ্খলায় ক্ষয় পাইতেছে সমাজের কাঠামো, সে ক্ষয় স্পর্শ করিতেছে তাহার অন্তরের অন্তস্তলটিকেও।

সরকারদের বাড়ির মেয়ে মিসেস উমা দত্ত। পিতামহের কাল হইতে তাহারা বড় এটর্নি; মাতামহ মামারাও হাইকোর্টের উকিল, ব্যারিষ্টার। মিষ্টার দত্তও ভালো ঘরের ছেলে, মধ্যবিত্ত অবস্থার ঘর।

বিদ্যার জোরে বিলাতে যান, আই সি-এস্ পাশ করেন। মনোজীবনের তিনি ছিলেন সহপাঠী। নিজের শিশুপুত্রের জন্য গৃহশিক্ষকে খুঁজিতে গিয়াই মনোজকে এখানে পাইলেন। কলেজে তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, তখন ফিলজফির ছাত্র মনোজীবনকে চিনিলেও বেশি জানিতেন না। এইবার পরিচয় হইল—আর সে পরিচয় সমধর্মীর পরিচয়। ইতিমধ্যে দত্ত সাহেবের দর্শনের প্রতিও অনুরাগ বাড়িয়াছে; আর শুধু দর্শন নয়, হিন্দু দর্শন, শিক্ষাসভ্যতায় তাঁহার আগ্রহ জন্মিয়াছে। অবশ্য বুদ্ধিমান মানুষ দত্ত সাহেব। আই-সি-এস্ হইয়াও দেওয়ানী আইন পড়েন, বোঝেন, এমন কি মনোযোগ দিয়া বিচারও করিতে চান;—জ্ঞান চৌধুরীও এমন আই-সি-এস্ আর বেশি দেখেন না। একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষই দত্ত সাহেব। সাহেবদের ক্লাবে, পার্টিতে তাঁহার আগ্রহ নাই;—বরং ভালোবাসেন পাব্লিক লাইব্রেরী, ভালোবাসেন বাঙালীর সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য ও সভাসমিতি। তাঁহার উৎসাহে প্রতিষ্ঠান দুইটি আবার জীইয়া উঠিয়াছে। আর তাঁহারই চেষ্টায় সাধারণ গ্রন্থাগারের অবৈতনিক সম্পাদক হইয়াছে মনোজ। উকিলেরা অবশ্য বিরক্ত হইয়াছে, কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপকরাও খুশী হন নাই। কিন্তু দত্ত সাহেবের কথা না রাখিয়া পারেন না—হাজার হোক তিনি জজ সাহেব।

কিন্তু সাহেবের বেয়ারা, আর্দালি, কেরানি হইতে শহরের সকল লোক জানে—মেম সাহেব একেবারে ভিন্ন চিজ্। মিসেস উমা দত্ত কড়া মেজাজের মানুষ, মায়া-দয়ার বিশেষ ধার ধারেন না। বড় ঘরের মেয়ে সে, কিন্তু দৃষ্টি যে তাহার এত ছোট—তাহা কেহই প্রত্যাশা করে নাই। বেয়ারা চাপরাশিদের উপর দয়া-মায়া নাই; আমলা কর্মচারীদের সঙ্গে আচরণে শ্রী-সৌজন্য নাই; আপনার চাল-চলনেও নাই সম্ভ্রম বোধ।—সাহেবদের

সঙ্গেই তাহার সমাজ। কিন্তু মফস্বল শহরে সাহেব বলিতে এক আধজন অফিসার, আর পাটের ও রেলের সাহেব। এই ফিরিঙ্গী জাতীয় সাহেবগুলির সঙ্গেই তাই তাহার খাতির-ইয়ার্কি। সাহেবদের ক্লাবে সে তাস খেলে, নানা গল্পে মাতিয়া বেড়ায়, এক একদিন জুয়া খেলিয়া টাকা উড়াইয়া রাত্রে বাড়ি ফিরে। মিষ্টার দত্তের সঙ্গে কলহ করিয়া কখনো ভাঙে কাঁচের জিনিস, কখনো ছুঁড়িয়া মারে তাহাকে হাতের ব্যাগ। শুধু তাই নয়, মিসেস উমা দত্ত জানে—রেলের এ-টি-এস হুইলির বেটিংএর টাকার অভাব নাই, ঠিকাদারেরা তাহা জোগায়; পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বীচরক্ এর অর্থাভাব হয় না: জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রোকার সাহেবও টুরে গেলে সদরে ফিরেন জমিদারও মহাজনদের নানা ডালি লইয়া। তাহা হইলে উমা দত্তই বা প্রকাশ্যে বলিবে না কেন দত্ত সাহেবের খাশ কেরাণীকে, 'ওঁকে কে মানুষ মনে করে? কেউ কিছু দিয়েছে ওঁকে কোনো দিন? ভারী উনি অফিসার আই-সি-এস্।' তারপর হুকুম হয় কেরাণীর উপর: 'ঘি নিয়ে আসবেন তো দোকান থেকে, ভালো ঘি।' দাম দিবার প্রশ্ন নাই, কিন্তু ঘি না পাইলে রক্ষা নাই। মেম সাহেব বাজারে বাহির হইলে আরও বিপদ—দামী জিনিষ পত্রে গাড়ী বোঝাই করিয়া কুঠিতে ফিরে। কিন্তু দোকানীবা বিল পাঠাইলে চাপরাশি দিয়া সেই দোকানীর কর্মচারীদের তাড়াইয়া দেয়। শেষ পর্যন্ত দত্ত সাহেব চটিয়া গিয়া দোকানীদের বাকী বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; কিন্তু মিসেস্ দত্তকে ঠেকাইবেন কিরূপে ?

উমা দত্ত তখন শোধ তুলিবার জন্য ইহাদের সঙ্গে শিকারে যাইতে লাগিল। একা বাড়িতে পড়িয়া থাকেন মিষ্টার দত্ত, আর তাহার ছেলে ও মেয়ে। মনোজ দেখে বাড়িতে যেন তাহারা মরিয়া আছে। কিন্তু বাড়ি শান্ত, কলহ নাই, বিসদৃশ কোনো উদ্বেগ নাই। মিষ্টার দত্ত তাঁহার ছোট

মেয়েটিকে লইয়া খেলিতে বসেন লুডো কিংবা ওয়ার্ডমেকিং; মনোজ তাঁহার ছেলেকে লইয়া পড়িতে বসে 'ক্রেডল টেল্‌স্ অব হিন্দোস্তান,' রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী,' আর অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপত্রীর দেশ,' কিংবা প্রাচীন শিল্পের চিত্র সংগ্রহ হইতে মুখে মুখে বলিয়া যায় ভারতবর্ষের ইতিহাস। অযথা কেহ তাহাকে বাধা দেয় না। দুই এক সময়ে মিষ্টার দত্ত আসিয়া বসেন। নানা বিষয়ে গল্প আলোচনা করেন মনোজের সঙ্গে—নূতন বিলাতী বই আনিয়া মনোজকে পড়িতে দেন। কিংবা তাহার সহিত চলেন লাইব্রেরীতে, সাহিত্য সভায়।

এমনি দিনে মনোজ বুঝিয়াছে—বিজন দত্ত গভীর ভাবে জীবনকে দেখিতে চান।

মিষ্টার দত্ত বলেন: 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পড়েন নি আপনি? এ কিন্তু ঠিক করেন নি, মনোজবাবু। রাজেন্দ্রপ্রসাদের সংকলনই না হয় পড়ুন। না, না, রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন তথাপি জানবেন গান্ধীজী জীবনেরই সাধক।

মনোজ গান্ধীজীর ভক্ত নয়। অশোকের মত তাহার গান্ধীবাদের উপর বিরাগও জন্মে নাই। তবে তাহারও মনে হইয়াছে—গান্ধীজীর কাজে ও উৎসাহে তাঁহার ভক্ত সমাজের মধ্যে এক দিকে ভারতীয় সারল্যের প্রতি একটা আগ্রহ জন্মিয়াছে, অন্য দিকে চিন্তাশীলতা, সত্যকারের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতির প্রতি একটা অবজ্ঞা প্রশ্রয় পাইয়াছে। এই এ্যান্‌টি-ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজমেতেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। ইহা বের্গস প্রমুখ দার্শনিকদের এ্যান্‌টি-ইন্‌টেবলকচুয়ালিজম্ নয়, একটা গোঁড়ামি।

মিষ্টার দত্ত গান্ধীবাদী গোঁড়ামির পক্ষপাতী নন; তিনি রবীন্দ্রনাথেরই ভক্ত। কিন্তু যাহা রবীন্দ্রনাথের বাণী, ভারতবর্ষের সাধনা,

গান্ধীজীও আপনার জীবনে কার্যত সেই ভারতীয় চেতনাকেই রূপায়িত করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী—সত্তার সম্পূর্ণতা। ইন্‌টিগ্রিটি ব্যতীত সত্তার সম্পূর্ণতা হয় না। সেই ইন্‌টিগ্রিটিই আসলে গান্ধীজীরও জীবনের কথা। উপকরণ-বাহুল্য আর ঐশ্বর্য, এক কথা নয়। বইএর বা পড়ার বাহুল্য আর বিদ্যাও এক কথা নয়; কেতাবী বিদ্যায় মানুষের মন ভারাক্রান্ত হয়। জমক বাড়ে, চমক বাড়ে—শ্রীবাড়ে না, রূপ ফোটে না।

মনোজ বোঝে বিজন দত্তের মনে অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণা জাগিয়া গিয়াছে আধুনিক জীবন-যাত্রার উপর। দ্বিতীয়বার ইউরোপ দেখিয়া আসিয়া তিনি আরও যেন বুঝিয়াছেন—উহাঁরা জীবনে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে।

ইউরোপের কি দেখেছি আমরা? কতটুকু দেখেছি? এখানে তো আমরা দেখি তাদের চাকরকে—যে চাকরকে ওরা পাঠায় আমাদের শাসন করতে। এই ইউরোপ আমাদের জীবনের যত ক্ষতি করেছে তার ক্ষতিপূরণ হবে না কিছুতেই। তারা চাকরকে করেছে আমাদের রাজা; আর তাই, আমরাও চাকরকে করি আমাদের আদর্শ। না, আমি সুনীতি দুর্নীতির কথা বল্‌ছি না, সব সমাজে তা আছে, সব কালে তা থাকবে। কিন্তু জীবনের একটা স্বচ্ছন্দ রূপ, একটা শ্রী, সেই এথোস্—যা আমরা বহু আয়াসে লাভ করেছিলাম,—তা আমাদের মেয়েরা পর্যন্ত আজ হারাতে বসেছেন। পরিবর্তে কি পাচ্ছি আমরা?—ফ্যাশান, ফ্লার্টেশান, চাকরের সাহেবিয়ানা, রেস,—সেই 'ফাষ্ট উইমেন এণ্ড স্লো হর্সেস্।'

মনোজ জানিয়াছে মিষ্টার দত্তের অব্যক্ত জীবন-কথা, জ্ঞানও বুঝিয়াছেন মিষ্টার দত্তের জীবনের খেদ। তাহা না জানিয়া কিছুমাত্র না বুঝিয়াও তখন সাধারণ লোকে হুইলি-উমা দত্তকে লইয়া গল্প রচনা করিতেছে। হুইলি শুয়োংকে মার খাইয়া তিন মাসের মত বিলাত গেল। কিন্তু তখন পাঞ্জাবী পুলিশ সাহেব হিদায়েৎ হোসেন খান্ আসিয়া

জুটিয়াছে। স্মার্ট, ফ্যাশানদার, চোখে মুখ শিকার-জীবীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সে-ই এখন মিসেস্ দত্তের পার্শ্বচর ক্লাবে, খেলায়, ইয়ারকিতে। তাহারও ট্যুরিং বাড়িয়া গেল; শিকার পার্টি বাড়িয়া গেল;—আর মেনকা সুন্দরীর কেসের মত কেসের কোনো কুল-কিনারা হয় না বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে হিন্দুদেরও নালিশ কলিকাতার কাগজে বাড়িয়া গেল। তাহার অপেক্ষাও স্থানীয় হিন্দুদের ক্ষোভ ও অপমানবোধ বাড়িয়া গেল—মিসেস্ দত্তের তাহার সহিত খাতির ইয়ার্কি 'ঢলাঢলি' দেখিয়া। নানা কুৎসিৎ ইতর গল্প সহজেই জন্মে। কিন্তু এ অধ্যায়ে হিন্দুদের শীঘ্রই সান্ত্বনা মিলিল—হুইলি ফিরিয়া আসিলে রেলের জমাদার কুলীরা পুলিশ সাহেবকে কি কারণে অপমান করিল, আর তিন দিন পরেই হুইলিকে আবার পুলিশের জমাদার কনেষ্টবলে মিলিয়া দিল বেদম প্রহার।

আমলা-জগতের এই পঙ্কিল নরক হইতে অবশ্য সেই সময়ে মিষ্টার দত্ত বাঁচিলেন—তিনি অন্যত্রে বদলি হইলেন। তখন গান্ধীজী বাঙলা দেশে আসিতেছেন, মধুখালিতেও তিনি আসিবেন। মনোজের হাত দিয়া বিজয়ের নিকট তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া মিষ্টার দত্ত মনোজকে বলিলেন:

'O Friend! I know not which way I should look For Comfort,

কোথায় Our peace, our fearful innocence,
And pure religion breathing household laws.
সো রিমেমবার গান্ধীজী; কর আদারওয়াইজ—উই আর লষ্ট।

'উই আর লষ্ট?' জ্ঞান চৌধুরী চমকিয়া উঠেন। বিহারী সরকারের নাতনী উমা দত্ত—স্ফূর্তি বাগানের সরকারেরা প্রায় সমাজের চূড়া। একশ বৎসর যাবৎ তাঁহারা কলিকাতার এক গোষ্ঠীপতি। তাঁহাদের মেয়ের এই যুগ লওয়া, আমলা-কর্মচারীদের সহিত এই কদর্য্য

উগ্র আচরণ—এই মর্যাদাবোধহীন আত্ম-বিস্মৃতি!—বিকৃতি দেখা দিয়াছে আজ সমাজের সম্মানিত উচ্চ স্তরে, ক্ষয় ধরিয়াছে আমাদের নিভৃততম প্রাণকেন্দ্রে, একেবারে অন্তঃপুরে,—ইহাই কি তবে সত্য!

মেনকাসুন্দরীর মত জটিল সমস্যা জমিয়াই আছে সমাজের অন্তর্দেশে---অনেক কাল যাবৎ, উচ্চ-নীচ অনেক স্তরে। তাহাদের দৃষ্টির বাহিরে উহা পূর্বাপর রহিয়াছে। আজ তাহাই ফুটিয়া উঠিতেছে। অশোকেরাও তাহাই দেখে, কিন্তু বুঝে না উহার অর্থ। এই একটা সুপ্রাচীন সভ্যতার ও সমাজের নানা স্তরে ফাটল ধরিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার মন্দিরও কি খালি? এই এথোস্ কি মিথ্যা?

জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর মনে পড়ে—রিমেম্বার গান্ধীজী; ফর আদাবওয়াইজ উই আর লষ্ট!

৯

গান্ধীজী হাসিয়া বলিলেন, তুমি চরকা কাটো কি?

জ্ঞানচৌধুরীও হাসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, চরকায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। বলিতে পারিলেন না 'বিশ্বাস নাই', বলিলেন 'সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই।' একটু অস্পষ্টতা রহিয়া গেল কি এই উত্তরে? উপায় কি।

কিন্তু সুস্পষ্ট গান্ধীজীর কথা!—'পরিশ্রমে বিশ্বাস করো? কাজে? তাহা হইলে দেশের বেকার লোকদের কিছু কাজ দাও—'কাজই শ্রেষ্ঠ ধরণের প্রার্থনা।' সকলের পক্ষে করিবার মত কাজ আর কি আছে?—শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী পুরুষ সবাই করিতে পারিবে, বিশেষ যন্ত্রপাতি কিনিতে হইবে না।'

জ্ঞান মানিলেন—তেমন কিছু মনে পড়ে না। আর সত্য কথা, এত গরীব এই দেশ যে, এই দেশের আবালবৃদ্ধ যদি প্রত্যেকে দিন আর চারটি পয়সা বেশি রোজকার করিতে পারে, তাহা হইলেও এক-একটি পরিবারের জীবনযাত্রার পক্ষে তাহা তুচ্ছ কথা হয় না। কিন্তু জ্ঞানশঙ্করেব মনে পড়িল—এই বিষয়ে অস্পষ্টতা রাখা তাঁহার পক্ষেও কর্ত্তব্য নয়। জানাইলেন, অন্য কোনো লাভজনক জীবিকা যদি তাহারা পায় তবে চরকা কাটিবে কেন?

তৎক্ষণাৎ গান্ধীজী হাসিয়া বুঝাইলেন—কাটিবে না। যাহার জন্য অন্য কাজ জ্ঞান দিতে পারেন তাহাকে তাহাই দিবেন। কিন্তু যাহার অন্য কিছু নাই, তাহাকে চরকা কাটিতে বলিবেন তো? গান্ধীজী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর তাদেব উৎসাহ দেবাব জন্যই নিজেও কাটিবে চরকা। কাটিবে তো?

জ্ঞান চৌধুরীও হাসিয়া বলিলেন, তা, বোধ হয় না। কারণ, লোকে 'মনে করবে ওকালতিতে কাজ পাচ্ছিনে', বেকাব বলেই চবকা কাটছি।

বলবে না, এই চরকা-পাগলের পাল্লায় পড়েছ?—বলিয়া হাসিতে ঘর ভরিয়া আনন্দময় পুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তোমাদের স্কুলের ছেলেদের অন্তত কিছু কিছু এই খেলাই খেলতে বলো না?

কে বলিবে যে, এই মানুষ চরকা-পাগল, এমন অহিংসা-পাগল, এমন ব্রহ্মচর্যের ভূতগ্রস্ত পিউরিটান্? এ যে শিশুর মত আনন্দময়, কৌতুকে পরিহাসে সদা স্ফূর্ত মানুষ—'পরিপূর্ণ মানবতার প্রতীক!' সত্যই কি এই কথা—মনোজের লেখা অভিনন্দনের? মনোজেরও কি ইহাই ধারণা? পলিটিক্সের নেতা তিনি হইলেই বা কি, না হইলেই বা কি? বরং পরিপূর্ণ বলিয়াই পলিটিক্সের চাল তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য। ষ্টেট্স্ম্যানশিপের

উচ্চতর স্বার্থানুসন্ধানও তাঁহার লক্ষ্য নয়। বৃহত্তর মানব-সমাজের ব্যাপকতর কল্যাণকে তিনি আপনার সাধনা করিয়াছেন ;—পলিটিক্সের হিসাবে তাহা অবান্তর অবাস্তব! ষ্টেট্‌স্‌ম্যানশিপের হিসাবে তাহা উচ্চ আদর্শ, তবে অবাস্তব। কিন্তু মানবতার হিসাবে? 'সো, রিমেম্বার গান্ধীজী, ফর্‌ আদারওয়াইজ উই আর লষ্ট।'

মনোজ তাহা মনে রাখিয়াছে, আর বিশ্বাসও করিতে চাহিয়াছে। আর মনোজ সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়াছে জ্ঞানের মত—ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক পরম সত্য।

অশোকের সহিত তাহার তর্ক হইয়াছে—গান্ধীজী প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিংকিংএর আদর্শ। অশোক শহর ছাড়িয়া গিয়াছে—গান্ধীজীর সম্বর্ধনারও সে বিরোধী।—কাহারও সহিত তাহার মতে মিলে নাই। অমর ছুটিতে আসিয়াছে, গান্ধীজীর সম্বর্ধনায় সে উৎসাহী। কিন্তু অশোকের কথাটা সে একেবারে মিথ্যা বলে না। ইণ্ডিয়া লষ্ট্‌ তো বহুদিন যাবৎ—মানুষের অধিকারে সে সকলকে বঞ্চিত করিয়াছে, তাই তাহার নিজের অধিকারেও সে বঞ্চিত। অপমানে তাহাকে যাইতে হইবে সবার তলায়। কিন্তু কথাটা তাহা নয়। পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ মানুষ গান্ধীজী। সেই মানুষকে বুঝাটাই প্রথম কথা। অমর বলে,—আর আপাতত তাঁকে এই তাঁর দেশের মানুষের হাত থেকে বাঁচানোই আরও প্রয়োজন।

অমরের বক্তব্য, গান্ধীজীর মনের ও মতের কোনো মর্য্যাদা এই সব কংগ্রেসওয়ালাদের নিকটে নাই। এই ফিলিষ্টাইনরা সেই মানুষকে চিনে না, তাঁহার জীবন-দর্শন বোঝে না। ইহারা চেঁচাইয়া ভিড় করিয়া হুড়াহুড়ি করিয়া—বিশৃঙ্খলায়, উন্মত্ততায়, ইতরতায়,—সেই সমাহিত-চিত্ত মানুষের দেহমন আত্মাকে পীড়িত করে। ইহারা তাঁহাকে পূজা করে, অর্ঘ্য জোগায়, তাঁহাকে ঘিরিয়া নাচানাচি করে; আর সে মানুষের একান্ত চিত্ত ক্লেশে কাতর হয়, উৎপীড়িত প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। তাহাতে

কি ? ভাগ্যক্রমে দেশে যদি একটা 'মহাত্মা' জন্মিয়া থাকেন তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দিয়ো না, ঘুমাইতে দিয়ো না—কোনরূপে ভাবিতে দিয়ো না, দিয়ো না তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তাকে অবকাশ। চেঁচাও, ভিড় করো, কোথাও ফাঁক রাখিয়ো না। কারণ, উনি মহাত্মা, উনি আমাদের পবিত্রাতা, আর এই আমাদের পূজার শ্রী—এথোস্! 'অথচ,'—অমর মানে, 'লোকটা জীবনে শ্রী সৌন্দর্যের ভক্ত—অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের বিরোধী। আর রবীন্দ্রনাথের মত সৌন্দার্য-বৃত্তির বিকাশেও গান্ধীজী আস্থা রাখেন না।' প্লেন্ লিভিং, বাট নো থিংকিং—এই তাঁহার আদর্শ। তাঁহার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গই প্রিমিটিভ, আর প্যাটার্ণ অব লাইফ্ও প্রিমিটিভ টাইপের।

গান্ধীজী আসিলেন, গেলেন। কিন্তু এখন মনোজ আর তর্ক করিতে চাহে না। গান্ধীজীর মধ্যে যাহা সে খুঁজিয়াছিল তাহার সন্ধান সে পায় নাই; হতাশ হইয়াছে, কিন্তু তাহা নিজের কাছে স্বীকার করিতে পারে না। চরকা, চরকা, চরকা—এত চরকা লইয়া পাগল কেন এমন সত্যান্বেষী পুরুষ? মানুষের জীবিকা-তত্ত্বই যদি উহার কারণ হয়, তাহা হইলে তো অশোকদের জীবিকা-তত্ত্বই বেশি যুক্তিযুক্ত—অনেক সুসম্বদ্ধ। নিজে মনোজ অশোকদের তত্ত্ব মানে না, কিন্তু গান্ধীজীর জীবন-দর্শনও বড় ক্রুড্। জীবনের বহিরঙ্গের উপরে এতটা তাঁহার জোর দেওয়া কেন? মানুষের বিরাট সত্তাকে এমন একটা স্থূল পদ্ধতির মধ্যে পুরিয়া ফেলিলেই কি মানুষ সম্পূর্ণ হইবে?

অমর বুঝাইতে চাহিয়াছে—ইহাই ভারতবর্ষের সমাজের 'ভাল গারিটি'—এই বহিরঙ্গ লইয়া মাতামাতি, মানুষের অপেক্ষা ইনষ্টিটিউশনকে বড় করিয়া দেখা মধ্যযুগের নিয়ম। লাইফ অপেক্ষা ফরমকে বেশি মানাই এই মধ্যযুগে-আবদ্ধ দেশেরও দস্তুর। তাই গান্ধীজীর ভক্তরা মনে করেন

গান্ধীজী বুঝি লেংটি, দন্তহীন মুখ, ছাগলের দুধ! সাহিত্যিকরা ভাবেন—রবীন্দ্রনাথ বুঝি ঠাকুরবাড়ির ঢোলা ইজের ও দরবারী জোব্বা; কিংবা প্রসাধন-মার্জিত লম্বা চুল দাড়ি আর সুচিক্কণ কণ্ঠস্বর। 'ভাল্‌গিরিটি' কখনো সত্তাকে দেখে না,—ব্যক্তিরও না, সমাজেরও না। তা' চিনে মানুষের দাড়ি আর চুল, সমাজের সংস্কার নিয়ম।

জ্ঞান চৌধুরী নীরবে শুনিয়া যান। তিনি কথা বলেন না, তর্ক করেন না। তিনি সেই স্বদেশী যুগের মানুষ, অরবিন্দ তিলকের নামে তাঁহার এখনো মাথা অবনত হয়। তাই গান্ধীজীর অসহযোগের নীতি ও কর্মপন্থা তিনি একবারও সমর্থন করিতে পারেন নাই। অশোক তাহাতে যোগদান করিয়া যেরূপ ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহাতে তিনি গান্ধীজীর কর্মপন্থার উপর আরও আস্থা হারান। সেই আন্দোলনকারীদের কাজ, বক্তৃতা ও আচরণের ভাল্‌গারিটি তাঁহাকে সেই সময়ে আরও পীড়িত ও বিরূপ করিয়া তোলে। কিন্তু আজ কোথায় সেই অশোক?—এমন মানুষের সম্বর্দ্ধনার পর্যন্ত বিরোধিতা করিবার জন্য সে উদ্যোগী ছিল। হৈম তাহাকে বারে বারে বলিয়াছিল, 'সাধু মহাত্মার মনে আঘাত দিলে আর রক্ষা আছে?' শেষ পর্যন্ত তাই এখন অশোক ব্যর্থমনোরথ হইয়া গিয়াছে চিত্রিসারে। কেহ তাহার কথা শোনে নাই। ধর্মহীন, আস্থা-হীন, বিজাতীয় ভাবধারায় আত্মদ্রোহী, দেশদ্রোহী অশোক, কোথায় এখন তাহার গান্ধীবাদ? কোথায় বা আজ সেই অসহযোগ? রাজনীতির, এই ভাঙা-হাটে জ্ঞানশঙ্কর আজ গান্ধীজীকে দেখিলেন—একা!—কে তাঁহাকে 'চরকা-পাগল' না বলিবে? জ্ঞানের মনে হইল তাঁহার মত বুঝি গান্ধীজীও আজ বিষণ্ণ, সংশয়াকুল—অথচ মুখে মনে এখনো কী সানন্দ প্রসন্নতা, কী উচ্চ হাস্য!...এক নূতন দৃষ্টিতে জ্ঞান চৌধুরী গান্ধীজীকে দেখিলেন—ভাঙা-হাটের মানুষ! হাটের বেনা-

পাওনা অপেক্ষাও তিনি বড় বলিয়া চিনিয়াছেন সংসারের লক্ষ্মীকে, সমাজের ধর্মকে। তিনি তো শুধু রাজনীতি সমাজ-নীতির নেতা নহেন; কোনো একটা নূতন দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও নহেন;—চিরদিনের সরল, অকপট সত্যের সাধক—Pure religion breathing household laws—এই ধর্ম আমাদের গৃহ সংসারের তুলসীতলায় ও সেবা-অনুরাগে জীইয়া আছে; আমাদের সমাজ-সংসারের ছোট বড় নানা সম্পর্ক ও সংস্কারের মধ্যে জড়াইয়া আছে,—বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে, আকারে ও প্রকারে, 'মিন্‌সে' ও 'এগু,' তাহা জীবনচর্যার সহজ-সেতু রচনা করিয়াছে। তাই তো এই দেশের সাধারণ মানুষ এমন সহজে গান্ধীজীকে গ্রহণ করিতে পারিল—অন্য কাহাকেও তাহারা গ্রহণ করিল না—রামমোহনকে নয়, রবীন্দ্রনাথকে নয়।—কে অমর, কে অশোক তাহাদের চোখে?

'ভাঙা-হাটের মানুষ' বুঝি নিজেও—জ্ঞানশঙ্কর? ফাটল ধরিতেছে বুঝি আজ গৃহে সংসারে, সমাজে চেতনায়! ধরুক্ তাহা। রিমেম্বার গান্ধীজী!

কলকাতার টেম্‌পেরাচার নেমেছে—৯৫ ডিগ্রিতে! এখন ছুটিও আর পাব না।—খবরের কাগজ উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে অশোক বলিল।

জ্যৈষ্ঠ্য শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু গরম রহিয়াছে। জ্ঞানশঙ্কর অপরাহ্ণের দিকে পুকুরের পারে বেতের কেদারায় বসিয়াছিলেন। সম্মুখে ছিল দৈনিক কাগজ। অশোক তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছে—সম্ভবত কিছু একটা বলিবে। কি বলিবে সে? বলিতেছে না কেন? জ্ঞান চৌধুরীও জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছেন না। কেমন একটা সঙ্কোচ দুই জনার মধ্যখানে স্থায়ী হইয়া উঠিতেছে, দুই জনা আর সহজভাবে কথা বলিতে পারিতেছেন না। অমর থাকিলেও

হইত, কিন্তু সে ঘুমাইতেছে। কেন অশোক কথা বলিতেছে না? সেই বারাহীপুরের ব্যাপার লইয়া সে তবে জ্ঞানের সহিত কথাও বলিবে না ঠিক করিয়াছে নাকি?

তবু অশোকই কথা বলিল, ছুটি আর সে লইবে না। অর্থাৎ সে এবার কলিকাতা ফিরিবে। অমরের পূর্বে—অমি' ইন্দিরা পূর্বেই সে ফিরিবে।

অবশেষে অশোক কথা বলিয়াছে—জ্ঞানও এইবার কথা বলিতে পারিবেন। বলিলেন: ও কাজেই আবার যাবে নাকি?

অশোক জোর করিয়াই সহজ হইতে চাহিল: যাব না? আমাকে অন্য কাগজে কাজ দেবে কেন? মাত্র বি-এ পাশ। তাতে আবার আমি গান্ধীজীকেও মানি না, দেশবন্ধুকেও মানি না।

সহজ কথা। কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী সহজ হইতে পাবেন কই? তিনিই বা কি করিয়া মনে করিবেন—অশোকের কথা সহজ স্বাভাবিক? একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন: তোমরা কেবল অন্নব্রহ্মকেই মানো বুঝি? অন্নই সর্বস্ব, না?

সর্বস্ব নয়, তবে প্রথম ও প্রধান কথা।

প্রথম বস্তু বটে, কিন্তু পরমাত্মা নয়। আর সভ্যতা যত অগ্রসর হয় অন্ন ততই আর প্রধান বস্তু থাকে না। সভ্য মানুষ বলে—অন্ন প্রয়োজন, কিন্তু অন্ন পরম বস্তু নয়, চরম বস্তু নয়, এমন কি প্রধান বস্তুও নয়।

মানুষের তত সভ্য হতে এখনো অনেক দেরী। শতকরা পাঁচজন হয়েছে অন্নের রাজা, আর শতকরা পঁচানব্বই জনকে তারা বানিয়েছে নিজেদের অন্নদাস—ওয়েজ স্লেভ্।

সেই পুঁথিপড়া কথা অশোকের। জ্ঞান চৌধুরীর এই সব আলোচনায় আর আগ্রহ নাই। অশোকই আবার বলিল: পৃথিবীতে সভ্যতা গড়বার সাধনাই এতকাল চলেছে। ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলেই

দেখি—আসলে মানুষেব ইতিহাস এখনো যেমন প্রাগৈতিহাসিক পব ছাড়িয়ে ওঠেনি, তেমনি এই সভ্যতাও আসলে তার প্রাক্-সভ্যতার স্তরেই আবদ্ধ। আমরা সভ্যতাকে এগিয়ে দিচ্ছি—প্রাগৈতিহাসিক স্তর থেকে ঐতিহাসিক স্তরের দিকে।—ইতিহাসের ধারাও শতাব্দী শতাব্দী বেয়ে এই দিকে আসছে।

এবার জ্ঞান আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। না, তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, তবে কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলাও প্রয়োজন। বলিলেন: ইতিহাসের ধাবা এরূপ নয়। মহাবিচিত্র বিশ্বের মধ্যে মহাবিচিত্র মানুষের ইতিহাস। সভ্যতা যত অগ্রসর হয় তত তার বিচিত্রতা স্পষ্টতর হয়। এই ফল জল আকাশ, বিচিত্র প্রাণী-জগতের সঙ্গে-জীবন মিলিয়ে ভারতবর্ষে আমরা ভারতবর্ষের মত জীবন-যাত্রা গড়েছি; তারই নাম ভারতবর্ষের সভ্যতা, ভবেতবর্ষের ইতিহাস। ঋতুতে ঋতুতে আমাদের উৎসব, তার সঙ্গে আমাদের পূজা-পার্বণ, আচার অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারণার নাড়ীর যোগ। আকাশের তারা থেকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম প্রাণীটি পর্যন্ত আমাদের আত্মীয়;—সকলকার সঙ্গে বাঁধা আমি, সকলে বাঁধা আমার সঙ্গে,—সকলেই আমাকে জোগায় রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ; সকলকার কাছে আমি ঋণী।—আর এই বোধ, নিজস্ব জীবন-যাত্রার দায়িত্ব, আমরা পেয়েছি আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে। এই আমাদের 'স্বধর্ম': 'অধিকার' বলো এটা অধিকার, 'দায়িত্ব' বলো এটা দায়িত্ব। আসল কথাটা হল 'ধর্ম'—তা দায়িত্বের থেকেও বেশি গভীর; অধিকারের থেকেও বেশি ব্যাপক। এজন্যই আমরা 'অধিকার' নিয়েও কথা আরম্ভ করি না, 'দায়িত্ব' নিয়েও প্রশ্ন তুলি না। তাই অমরের 'ব্যক্তির অধিকারের' দাবীও বুঝি, তোমার 'সম-ভোগবাদের' কল্পনাও বুঝি;—কিন্তু জানি সে সবই হল অর্ধসত্য। আর a thing that is

half the truth is e'er the blackest of lies. কারণ, এই সমগ্র সত্যের সাধনারই নাম 'ধর্ম।'

কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া জ্ঞান চৌধুরী যেন একটা তৃপ্তি পাইলেন। অনেক দিন এত কথা ও এই সব বিষয় তিনি অশোকের সহিত আর আলোচনা করেন নাই। অমরের ও মনোজের নিকটও আপনার কথা বলেন নাই। অশোকের নিকট কিছু বলা আরও বৃথা। তাহার কথায় আচরণে তাহার মাতার চিত্ত পর্যন্ত আহত হইয়াছে। তাই বলিয়া নিজের আঘাতস্থলগুলি খুলিয়া দেখাইবেন নাকি জ্ঞান চৌধুরী? ছিঃ! তাহাতে একটা দৈন্য আছে। জ্ঞান চৌধুরী চেষ্টা করিয়াছেন নিশ্চল ভাবে আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে। কিন্তু যতই তিনি বুঝিয়াছেন অশোককে কিছু বলা বৃথা, ততই বলিবাব কথাগুলি মনের মধ্যে বেশি অলোড়ন করিয়াছে। মনে মনে জ্ঞান চৌধুরী অশোককে ততই সম্বোধন করিয়াছেন আরও বেশি।

অশোকেরই কি তাহা জানা নাই?

হাতের সংবাদপত্রটা অশোক মুচড়াইতে লাগিল। মুখে কেমন হাসিবার চেষ্টা করিতেছে। চোখে একটা বিভ্রান্ত নিরুপায় দৃষ্টি;—কি করিবে সে, কি বলিবে? তারপর খানিকক্ষণ পরে অশোক কাগজটাকে হাত হইতে একটু ছুঁড়িবার ভঙ্গিতে ফেলিয়া দিল। অভ্যস্ত হাসিতে হাসিয়া বলিল:

যাক্। এ নিয়ে তো কথা নয়। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। নইলে বারাহীপুরের জমিদাররা ফাঁকি দিয়ে প্রজাদের জমিগুলি হাত করে নিলে। এমন তারা বরাবরই করে;—এই তো তাদের স্বধর্ম। আইনের ফিফিধ তারা জানে। তা ছাড়া তাদের সহায় আপনারা বড় বড় উকিলরাও; পুলিশও আছে তাদের পক্ষে। প্রজারা তা হলে করবে

কি? প্রজার ধর্ম অন্তত নিজের হক বজায় রাখা। জমিদারের ধর্ম আর প্রজার ধর্ম তো এক নয়। আপনারা রাজার পক্ষে, আমরা প্রজার পক্ষে।

'আপনারা রাজার পক্ষে, আমরা প্রজার পক্ষে': জ্ঞান উত্তর দিলেন না। নিঃশব্দে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। বুঝি এখন হইতে এই ব্যবধানই স্থায়ী হইবে; নিস্তব্ধতার অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান তাঁহাদের মধ্যে জুড়িয়া বসিবে। আর তাঁহারা পিতাপুত্রে অকুণ্ঠিত আলাপও করিতে পারিবেন না, সেই পূর্বেকার সহজ স্বচ্ছ সম্পর্ক তো কবে শেষ হইয়া গিয়াছে;—তাহা ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা কোথায়? কারণ, 'আপনারা রাজার পক্ষে, আমরা প্রজার পক্ষে'—আর 'রাজার ধর্ম ও প্রজার ধর্ম এক নয়।' জ্ঞান চৌধুরী বারাহীপুরের প্রজাপীড়ক জমিদারের উকিল; অশোক চৌধুরী বারাহীপুরের উৎপীড়িত ভয়াতুর প্রজার মুখপাত্র—তাহাদের ধর্ম এক নয়।…কি সে ধর্ম? ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং?…

বিজয়দা,' না?—অশোক বলিল।—ছুটে আসছেন কেন?

বিজয় ঘোষ কংগ্রেসের সেক্রেটারি। স্বদেশীতে বিজয় ছিল অশোকের এককালে অগ্রজ-তুল্য। জ্ঞান চৌধুরীর নিকট বরাবরই সে স্নেহ-ভাজন। কংগ্রেসের কাজ লইয়া অশোকের সঙ্গে তাহার তর্কবিতর্ক হইয়াছে। কিন্তু বিজয় কর্মী পুরুষ। অত তর্ক করিয়া কি হইবে? স্বরাজ চাই, স্বাধীনতা চাই;—দেশের মানুষ যখন কংগ্রেসের পথেই চলিতেছে তখন সেই পথেই তাহাদের লইয়া অগ্রসর হও—ভালো ভালো কথা, বলিয়া, বড় বড় তর্ক তুলিয়া কি লাভ? আশোক পাগলামি করিতেছে। কিন্তু বিজয় ঘোষ তো পাগল হয় নাই। তাহার অজস্র কাজ; কিন্তু কথা মাত্র একটি—

'স্বাধীনতা' ; তাহা লাভ করিতেই হইবে। সেই জন্যই সে ব্যস্ত, ছুটিয়াই প্রায় চলে। বিজয় তাই ছুটিয়াই আসিল। খানিকটা দূর হইতেই চীৎকার করিল: অশোক, দেশবন্ধু নাই।

কে নাই? জ্ঞান চৌধুরী যেন শুনিতে পান নাই। বিজয় আসিয়া গিয়াছে। হাতের টেলিগ্রামটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে বলিল: দেশবন্ধু! দেশবন্ধু নাই!

দেশবন্ধু নাই।—সমস্বরে আহত-কণ্ঠগুলি বলিয়া উঠিল।

তার সম্মুখে রহিয়াছে—কলিকাতার কংগ্রেসের তার।

উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে অমরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। বাহির হইয়া আসিয়া বলিল: কি বিজয়?

অশোক তারটা অমরের হাতে দিল।

একটা নিঃশ্ছিদ্র স্তব্ধতা আবার চারিদিকে। দুই একজন প্রতিবেশীও আসিয়া দাঁড়াইতেছে;—বিজয়ের চীৎকার তাহারা শুনিয়াছে। মৌন দৃষ্টিতে একে একে তার দেখিতেছে। চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন জ্ঞান চৌধুরী।

অমরই প্রথম কথা বলিল: কংগ্রেসের একমাত্র পোলিটিসিয়ান্‌ও গেল। কি করবে এবার তোমরা, বিজয়?—তাহার কণ্ঠে উত্তেজনা নাই।

আবার কি করবো? খুন তো করেছি তাঁকে—আর কি করব?—অদ্ভুত আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর বিজয় ঘোষের।—অমরের কণ্ঠস্বর ও কথার তুলনায় উহা যেন আর এক পৃথিবীর, আর এক বিষয়ের কথা। বিচার যুক্তির কথা নয়, একটা অশ্রুভরা আত্মবিলাপের ভাষা।

যা করবার তাঁকে তা করেছি—আমরাই তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আনলাম।—বাঁধ ভাঙিয়া যাইতেছিল বিজয়ের বেদনার এতক্ষণে। সে বলিয়া চলিল; ফরিদপুরে আমরা তাঁকে প্রায় অপমান করেছি। কী অভিমান তাঁর

আমাদের উপর। 'তোমরাও আমাকে বিশ্বাস করতে পার না?' ক্যাম্পে গিয়ে শুয়ে পড়লেন অভিমানে কাঁপতে কাঁপতে। মৃত্যুর ছায়া তাঁর মুখে পড়েছে; দেহ অচল, অবসন্ন। তবু সে দেহ নিয়ে এসেছিলেন ফরিদপুরে,—তিনি একটা কিছু করবেন। আমরা তাঁর শেষ আশা! সবাই ক্লান্ত; কর্মীরা জেলে, কে আছে আর তাঁর অনুগত—আমরা স্বদেশীরা ছাড়া? আমরা তাঁর শেষ-আশা। আর সেই আমরাই দিলাম শেষ আঘাত।

অমর বিজয়কে বাধা দিয়া বলিল: কেন তোমরা তো তাঁর কথা রেখেছ, তাঁর প্রস্তাবই গ্রহণ করেছ।

বিচলিত বিজয়ের অনুতাপ হঠাৎ ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল: কথা রাখা একে বলে না। প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, আমরা তাঁর আপনার জন নই। আর এ বোধ তাঁর মত মানুষের পক্ষে যে কী তীব্র ব্যথার কারণ, সে অন্যে বুঝবে না। পলিটিক্স্ অনেকেই করে, কিন্তু এমন করে ছোট বড় সকল কর্মীর জন্য আপনাকে ক্ষয় করতে কাউকে হয় না।

বিজয় কেন, সকলেই বিচলিত। আর সকলেই বুঝিতেছে—তাঁহার কথা বড় সত্য। জ্ঞান চৌধুরীরও যেন ইহাই মনে হইতেছিল—উন্মাদ চিত্তরঞ্জন আপনাকে শুধু বিলাইয়া দেন নাই, আপনাকে ক্ষয় না করিয়া ফেলিয়াই নিঃশ্বাস ছাড়িলেন না। বিজয় মিথ্যা কহে নাই—'আমরাই তাঁকে মেরেছি।' শুধু বিজয়েরা নয়, 'স্বদেশী' যুবকেরা নয়—না, উহারাও তো সেই মৃত্যুর পথে তাঁহার অনুযাত্রীই। জ্ঞান চৌধুরী কি জানেন না, দেখেন না, বিজয়েরাও সেই বে-হিসাবি মানুষেরই আপনার জন। তেমনি করিয়াই তাহারাও তো আপনাকে ছোট বড় নানা কাজ সঁপিয়াই দিতেছে,—নিঃশেষ করিতেছে। হয়ত এই

ভাবোন্মাদনাই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। মমতা জাগিয়া উঠিতেছিল জ্ঞান চৌধুরীর মনে বিজয়ের জন্য। বিজয় তাঁহার স্নেহভাজন, অশোকের বন্ধু;—কিন্তু সে অশোকের মত তো নয়, মায়া মমতাভরা মানুষ সে,—তাই তাহাকে সাধারণে ভালবাসে। আর অমর অশোক প্রভৃতি বুদ্ধিমান্ মানুষেরা একটু সকৌতুকে তাহার উন্মাদনাকে পরিহাস করে। —যেমন পরিহাস করিত হয়ত চিত্তরঞ্জনের বার লাইব্রেরীর বন্ধুরা তাঁহাকে। না, চিত্তরঞ্জনকে বিজয়েরা শুধু মারে নাই, মারিয়াছি আমরাও, জ্ঞান চৌধুরীরা, অমরেরা,—যাঁহারা তাঁহার উন্মাদনাকে অবজ্ঞা করি, পরিহাস করি।

অমর বিজয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, চিত্তরঞ্জন ছাড়া কংগ্রেসে আর কেহ পলিটিক্‌স্ বুঝিতেন না। অপরেরা জানেন মহাত্মাজীর পক্ষে হাত তুলিলেই হইল। তাঁহাদের এইরূপ বুদ্ধিও নাই, এইরূপ আন্তরিক আবেগও নাই।

অশোক কথা বলে নাই। একবার কথা বলিল,—পলিটিক্‌সে এবার ভাবাতিশয্যের পালা শেষ হইবে। দরিদ্রনারায়ণের সেবা লইয়া বিবেকানন্দ মাতিয়াছিলেন। সেই দরিদ্রনারায়ণের জন্য আবেগ লইয়া আইনজীবী চিত্তরঞ্জন আইন-সঙ্গত পলিটিক্‌সে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আর দরিদ্রনারায়ণ নয়, এবার দরিদ্র নরেরা নিজেরাই পলিটিক্‌সে নামিয়া পড়িবে। পলিটিক্‌স্ আর আইন-জীবীর পলিটিক্‌স্ নাই; এখন আর নিয়ম-মত নিয়ম ভাঙার-পলিটিক্‌স্‌ও থাকিবে না। এবার বুভুক্ষিতের পলিটিক্‌স্ দেখা দিবে, আর 'বুভুক্ষিত কিং ন করোতি দোষং?'

বিজয় এই সব কথায় রুষ্ট হইল। বলিল: তখন বুঝি আর এরূপ মানুষের দরকার হবে না—স্বাধীনতার সমালোচনা করলেই স্বাধীনতা আসবে?

মানুষের দরকার হবে না, কে বলে? তখনই তো দরকার হবে সত্যকারের মানুষকে—যিনি অসংখ্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা বুঝবেন, অসংখ্য মানুষকে সংগ্রামে চালিত করতে পারবেন, আর নিঃশঙ্ক চিত্তে তেমনি করবেন অন্তদের সমালোচনা। সে মানুষ আর কিন্তু দেশবন্ধু হবেন না, হবেন সর্বহারার সেনাপতি,—হবেন লেনিন।

অশোকের 'বক্তৃতা' শুনিতে বিজয় আসে নাই। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অনেক কাজ রহিয়াছে। বাজারে সংবাদ দিতে হইবে—সংবাদ পাইলে আপনা হইতেই দোকান-পাট দোকানীরা বন্ধ করিবে। অশোক কি আসিবে তাহার সঙ্গে?—অন্তত শোক-সভার আয়োজন করিবে তো, না, এখনো চিত্তরঞ্জনের সমালোনা করিবে? সমালোচনা তাহারা করিতে পারিবে—কারণ, ইহার পরে আর লোক নাই।

অশোক হাসিয়া বলিল, চলো বাজারে। সমালোচনায় যখন তোমাদের আপত্তি তখন না হয় আর কথা বল্‌ব না।

জ্ঞান চৌধুরী বসিয়া রহিলেন। অমর কি বলিতেছিল প্রতিবেশীদের সঙ্গে। কিন্তু কি অন্ধ গোঁড়ামি অশোকের—আজ এই মুহূর্তেও। এখনো সেই লেনিন। কে এই লেনিন? কে তাহাকে জানে এই দেশে? কি জানিতেন তিনি এই জাতির? এই বুদ্ধি-চাতুর্য আবেগ উন্মাদনায় অস্থির চিত্তরঞ্জনকেই আমরা জানি। হাঁ, হয়ত সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহাকে চিনিবে না। হয়ত দেশের সাধারণ মানুষও তাঁহাকে তেমন আপনার বলিয়া জানে নাই যেমন তাঁহাদের আপনার মানুষ হইয়াছেন গান্ধীজী। কিন্তু এই যে বুদ্ধির ও আবেগের মিশ্রণে গড়া মানুষ, ইহাই বাঙালী প্রকৃতি। আবেগ বাহুল্যে জ্ঞান চৌধুরী ভাসিয়া যান না,—বরং বিভূতি চৌধুরীর ছিল ভক্তিতে অনুরাগ। কিন্তু তবু কি

জ্ঞান চৌধুরী জানেন না—এই ভাবাকুলতা কত বড় শক্তি? আর, একই কালে যুক্তি ও ভাবাবেগের এমন মিলনই বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য; একই কালে নব্য ন্যায় আর বৈষ্ণব ভাবাবেগের দেশ বাঙালা। আর সেই বাঙলারই অন্তরের মানুষ চিত্তরঞ্জন,—এমন মানুষ উপনিষদের জ্ঞানমার্গী রসিক রবীন্দ্রনাথও নহেন। চিত্তরঞ্জনই বাঙলার ভাবুক, বাঙালীর প্রেমিক। সম্ভবত লাষ্ট অব্ দি রোমান্স্।—ইহার পরে আর লোক নাই—ঠিক বলিয়াছে বিজয়,—আর বাঙালী নাই।

বাড়ির ভিতরে কথাটা পৌঁছিয়াছে—হৈমবতী পর্য্যন্ত আকুল হইয়াছে। অমি' তাই বাবার নিকট আসিয়া বসিয়াছে—দেশবন্ধুর কথা শুনিবে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদ পাইয়া বসিতেছে জ্ঞানকে! অমি' বুঝি হতাশ হইবে, অভিমান করিবে। বালিকা অমি', বুঝিতে চাহে না আজ তাঁহার পিতা আর ভালো করিয়া তাহার সহিত গল্প করিতে পারিবেন না। আজ জ্ঞানের নিকট মনে হয়—কি যেন শেষ হইতেছে। সে কি তাঁহাদের কাল? চিত্তরঞ্জন প্রায় তাঁহাদের সমসাময়িক। কলেজে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন সেই সাহিত্য রসিক ভাবুক চিত্তরঞ্জনকে, স্বদেশী যুগের মধ্য দিয়া তিনিও স্বাধীনতার দীক্ষা লইয়াছিলেন, অরবিন্দের ব্যারিষ্টাররূপে আলিপুরের বোমার মামলায় আপনার দেশ-প্রীতির আলোকে আপনি বিকশিত হইয়া উঠিলেন, তারপর—অমি' কী শুনিবে? ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের বৈভব ঔদার্য্য ত্যাগ—তীক্ষ্ণবুদ্ধি? কিন্তু প্রদীপই যে নিবিয়া যাইতেছে—তাঁহাদের কালের তাঁহাদের হাতের সেই স্বদেশীর প্রদীপ।

অমর বাঙলার বাহিরে থাকে। সে তাই বলিতেছিল: মতিলাল, বিঠলভাই, শেষে গান্ধীজী পর্য্যন্ত দাশ সাহেবের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাঙালীর নেতৃত্ব এবার গেল। এর পরে আর মানুষও

নেই কোথাও। বাঙালী ছাড়া পলিটিক্সও কেউ বোঝে না, সেক্রিফাইস্‌ও এমন আর কেউ করতে পারে না।

জ্ঞানশঙ্কর যেন নিজের চিন্তা ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনিলেন এবার অমরের মুখে। বাঙালীর গৌরবের যুগের মানুষ তাঁহারা—স্বদেশী যুগের বাঙালী। সেই যুগই বুঝি শেষ হইতেছে—শেষ হইতেছে বাঙালীর দীপান্বিতা। তাঁহার বাল্যে যৌবনে সমস্ত ভারতবর্ষে বাঙালীর অপরিসীম প্রতিষ্ঠা তিনি দেখিয়াছেন। বাঙালীর তখন অদ্ভুত উদ্যম, কর্মক্ষমতা, উদারতা। স্বদেশীর দিনে সেই বাঙালীর পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে।—সেটেলড ফ্যাক্ট্‌কে বাঙালী অন-সেটেল্‌ড্‌ও করিয়াছে। তাহা ছাড়া দলে দলে বাঙালী গিয়াছে কারাগারে দীপান্তরে, ফাঁসিতে,—তখনো এমন জেল-যাওয়া পলিটিকসের দিন আসে নাই। আজ সেই গরিমাদীপ্ত বাঙালী-যুগই বুঝি শেষ হইতেছে কংগ্রেসে গান্ধীযুগের উদয়ে। ইহারও মধ্যে তবু চিত্তরঞ্জন একবার বাঙালীর ত্যাগ ও প্রেরণার প্রমাণ রাখিয়া গেলেন। সেই উদার যুগ শেষ হইতেছে—অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র—বাঙালীর সেই গৌরবের যুগের মানুষ তাঁহারা। কিন্তু কোথায় নূতন বাঙালী? শুধু নেতার সমস্যা ইহা নয়, বাঙালী সমাজের বনিয়াদআজ ধসিয়া যাইবে। এই তো অমর—বিশ্বাস করেনা কিছুতে; অশোক—সে প্রজার পক্ষে,—মনে করে কোন এক লেনিনই বুঝি পৃথিবীর সমস্ত ত্যাগমন্ত্র ও বীর্যমন্ত্রকে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে;—অরুণ, অমিতা—সামান্য বালক বালিকা তাহারা।…এই তো তাহাদের চৌধুরীদের বংশধরগণ;—বাঙালীর ভাবী সন্তানেরা কোথায়?…সংসারের অভাবে দৈন্যে নানা জাতীয় নানা ভাবনায় তাহারা বিভ্রান্ত। কে বহিবে আর তাঁহাদের স্বদেশীযুগের সেই হোমাগ্নিশিখা?

কাদম্বিনী ভাবিয়া পান না—কি করিবেন। নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়া যতটুকু করিবার তাহা তো তিনি করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কাহার সুখ হইল, কাহার উপকার হইল?

সংসারে চিরদিনের যে কর্তব্যভার তিনি স্বচ্ছন্দ নিয়মে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তো পালন করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেই বা কতটা সুখ শান্তি কাহার হইল? অমর অসুখী হইল, নিজেও কি কাদম্বিনী আর সুখী হইতে পারিয়াছেন? না, সুখী হইতে পারিয়াছেন জ্ঞান চৌধুরী? তাঁহার তো কোনো সময়েই সুখ-ভোগের অবকাশ জুটে নাই। অমরের উপর যতটুকু তাঁহার আশা ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি স্বপ্ন ছিল তাঁহার অশোকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। বাড়ির সকলেরই তাহা ছিল, কাদম্বিনীরই কি ছিল না? হাঁ, কাদম্বিনীরও বহু আশা ছিল অশোক বড় হইবে, তাহার পিতার মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহার মাতার বুক আনন্দে ভরিয়া দিবে। আর, গর্বে ভরিয়া দিবে তাহার অগ্রজ অমরের মন, তাঁহার জ্যেঠাইমা কাদম্বিনীর প্রাণ। তিনিই ছিলেন অশোকের বড় আশ্রয়দাত্রী—সমস্ত সময়, অশোকও তাঁহার বড় আপনার। সেই অশোক তাঁহাদের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে চুরমার করিয়া দিয়া একটা অদ্ভুত উন্মাদনায় বাহির হইয়া গেল। অন্যায় সে কিছু করে নাই, অপযশ তাহার নামে কেহ দিতে পারিবে না, তাহা কাদম্বিনী ভালো করিয়াই জানেন। ইহাও সত্য, হৈমবতী সেই অশোককে আপনার অঞ্চল তলে ঘিরিয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া ভুলই করিয়াছে। জ্ঞানশঙ্করও তাঁহার অশোককে

আপনার স্বপ্নানুযায়ী গড়িয়া তুলিবার আশা পোষণ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। অশোক কাহারও নিয়মে গড়িয়া উঠিবার মত মানুষ নয়; আপনার প্রকৃতিতেই আপনি সে বাড়িয়া উঠিবে। অবশ্য সে অমরের মত আপনাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিবে না। এই পৃথিবীর শত সহস্র মানুষের মন ও কত কত অদ্ভুত ধ্যানধারণা, আন্দোলন আলোড়নের মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াই অশোকের প্রকৃতি অশোককে অশোক করিয়া তুলিবে,—কাদম্বিনী তাহা জানেন। কিন্তু জানেন বলিয়াই কি তিনি মনে করিবেন—অশোক তাহাব মায়ের বুকে, তাহার পিতার প্রাণে,—হাঁ, চৌধুবী বংশের সকলের মনে,—যে নিরাশার বোঝা চাপাইয়া দিল তাহা সামান্য? কাদম্বিনী কি বলিবেন—অশোক অবিচার করে নাই তাহার মায়ের প্রতি, তাহার পিতার প্রতি—বিশেষ করিয়া সেই জ্ঞান চৌধুরীর প্রতি যিনি আশা করিয়াছিলেন অশোক তাহার স্বপ্নকে সার্থক করিবে, চৌধুবীদের এই ম্রিয়মান ভদ্রাসনে আবার আনন্দগরিমার প্রদীপ-শিখা জ্বালিয়া তুলিবে? না, কাদম্বিনী জানেন—অশোক জ্ঞান চৌধুবীর বেদনার ও নৈবাশ্যের ভার কত ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে, সাধ্য কি জ্ঞান অরুণকে লইয়া সেই নৈরাশ্য লাঘব করিবেন? কিংবা কমলা অমিতার স্নেহে মমতায় সেই বেদনা বিস্মৃত হইবেন? তাহা কি সম্ভব? সম্ভব হইলেও অশোকের জন্য যে তাঁহার কেন, হৈম'র মন পর্যন্ত বারে বারে দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে। আর অশোক তাহা বুঝিয়াও বুঝিবে না;—না বুঝিবার ভান করিয়া আরও কঠিনতর প্রতিজ্ঞায় নিজের বুক বাঁধিবে, আরও বিমূঢ় বেদনায় আঘাত করিবে হয়ত তাহার পিতার বুকে, মাতার অন্তরে।

অশোক তর্ক করিতে বসিয়াছিল, 'ধর্মটা' আপনাদের কি? 'সমাজটাই' বা আপনাদের কাকে নিয়ে? কংগ্রেসের সম্বন্ধে, অহিংসা ও চরকার

বিরুদ্ধে তাহার মতামত উগ্র। গান্ধীজী বাঙলা সফরে আসিয়াছেন, ইহাও যেন অশোকের অসহ্য। তাই সে মধুখালি হইতে চিত্রিসারে ছুটিয়া আসিয়াছে—গান্ধীজীর নামের প্রভাবে সাধারণ লোকে প্রতারিত হইবে। অশোক তাহাতে বাধা দিতে চাহিলেও বাধা দিতে পারিতেছে না; তাই মন তাহার বিক্ষোভে পূর্ণ। কিন্তু শুধু ইহাই কি অশোকের এত অধৈর্যের কারণ? কাদম্বিনী অশোককে এত কম চিনেন না যে, ইহা বিশ্বাস করিবেন। তিনি শুনিয়াছেন, কালচিতার সেনেদের সঙ্গে জেলেদের এই নদীতে জলকর লইয়া কলহ বাধিতেছে—অশোক আসিয়াছে সেই জন্য। ইহাও তাঁহাব বুঝিতে বাকী থাকে নাই—শুধু মায়ের কথাতেই গান্ধীজীর আগমন কালে অশোক মধুখালি ত্যাগ করে নাই। বরং জ্ঞান চৌধুরীর নীরব কঠিন অসম্মতিতেই প্রতিহত হইয়া সে আসিয়াছে চিত্রিসারে কাদম্বিনীব স্নেহাবেষ্টনে। কিন্তু শুধু স্নেহের মোহেও আসে নাই,—শুধু নয়াচরের জেলেদের লড়াইয়ের জন্যও নয়;—আসিয়াছে আপনার কর্তব্য-বিচার শেষ করিবার জন্য। প্রজা-বিদ্রোহ লইয়া তাহার পিতার সহিত অশোকের মত-বিরোধ অনিবার্য, ইহাও যেন সে ধরিয়াই লইয়াছে। কাদম্বিনী তাহা অনিবার্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। অশোক ন্যায়-পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহা তিনি জানেন। তবে আশঙ্কা কি তাহার? অন্যায়, অধর্ম জ্ঞান চৌধুরীও কখনো করিবেন না।

ধর্ম কাকে বলছেন আপনারা? প্রজার জমি কেড়ে নিলে ধর্ম হয়? না, জমি যে চাষ করছে তার ফসল তাকে না দিয়ে অন্যেরা ভাগ করে নিলে তা ধর্ম হয়?—অশোক তর্ক আরম্ভ করিল।

কাদম্বিনী বুঝিতে পারেন না, দুইটাই কি এক কথা? জমিদার খাজনা লয়,—তাহা তো সে লইবেই। প্রজারই অধর্ম হইবে জমিদারকে খাজনা না দিয়া তাহার জমি ভোগ করিলে।

কিন্তু অশোক বলিয়া বসে,—জমি কার ?

কাদম্বিনী তাহার তর্ক যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। নদীর জলকর আদায়ের এই চেষ্টাটা সেনেদের পক্ষে অধর্ম—ইহা তিনি বুঝেন। এই নদীতে কোনো কালে তাহাদের অধিকার ছিল না—অধিকার থাকিলে তাহা ছিল চৌধুরীদেরই। কিন্তু তাঁহারা যখন জেলেদের মাছ ধরিতে বাধা দেন না, তখন কালচিতার সেনেরা কে, যে, উহাতে তাহারা আপত্তি করিতেছে ?

কিন্তু অশোক ঘুরিয়া আবার তর্ক তুলিবে,—তা যদি অধর্ম হয় তা হলে আপনারা তা সইছেন কেন ?

কাদম্বিনী বুঝাইতে চেষ্টা করেন,—সেনেদের বিরুদ্ধে অশোক জেলেদের ক্ষেপাইলে, সেনেরা এখনই পুরাতন কালের শত্রুতার কথা তুলিবেন—কালচিতার সেনেদের সঙ্গে চিত্রিসারের চৌধুরীদের শত্রুতা পুরুষানুক্রমিক। তখন জেলেদের হইয়া অশোক কথা বলিতে গেলে জেলেদেরই বিশেষ লাভ হইবে না। সেন ও চৌধুরীদের কলহই আবার ধোঁয়াইয়া উঠিবে।

শুয়োচকের প্রজাদের জমি কেড়ে নিলেও তবে তা সইতে হবে ? —বাবা বারাহীপুরের রাজাদের উকিল, তিনি সে জন্ম আইনও বাৎলিয়ে দেবেন রাজাদের।

কাদম্বিনী বুঝাইতে চাহেন : তিনি বললেই কি রাজারা তাঁর কথা শুনবেন ? না, নৃপেনই শুনবে তাঁর শ্বশুরের কথা ? তুমি তো জানো না নৃপেনকে। আমি দেখেছি, এ বাড়িতে সেবার সে যা কাণ্ড করে গেল।

কাদম্বিনী হয়ত এই কথা বলিতেন না। নৃপেনের অপমান তাঁহার মর্ম দাহ করিয়াছে। কিন্তু তাহা নিজে হইতে বলিবার মত কি ? তথাপি অশোক যে তাহা শুনিতে এখনো আগ্রহান্বিত হইল না, ইহাও কি কম আশ্চর্য !

অশোক বলিল: নৃপেন আবার একটা মানুষ নাকি! তার কথা আলোচনা করব কি? কিন্তু কথা হল বারাহীপুরের রাজারা জমি কেড়ে নিচ্ছেন, আর বাবা সেই জমিদারদের দৌরাত্ম্য আইনের জোরে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর দোষ কি—আইনের প্রমাণে যখন সে জমি-জমা জমিদারদেরই সাব্যস্ত হচ্ছে। অর্থাৎ, নৃপেনও যা করছে বাবাও তাই করছেন—দুইই জমিদারের পক্ষে। জমিদারের ধর্ম আর প্রজার ধর্ম তাই এক নয়;—ডাকাতের ধর্ম আর গৃহস্থের ধর্ম যেমন এক নয়। তবু ডাকাতও কালীপুজা করে, গৃহস্থও কালীপুজা করে। ডাকাতও বলি দেয় কালীর নামে, গৃহস্থও বলি দেয়—কালীর নামে। ধর্মের নামে এমনি করে গরীবেরা মরতে শিখেছে। তাদের জন্য ভগবান এক রকমের আফিঙ।

একি বলে অশোক? কাদম্বিনী বুঝিতে পারেন—অশোকের সংগ্রাম-প্রবৃত্তি মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোথায় যেন সে বাধাও পাইয়াছে। আপনার মধ্যেই আপনি সে মাথা খুঁড়িতেছে। সে বাধা কি জ্ঞান চৌধুরী?—তাঁহার ধর্ম আর অশোকের ধর্ম পৃথক্? তাই অশোকের এই আহত পাখীর মত পাখা ঝাপটানি—আপনার নীড়ে, কাদম্বিনীর এই গৃহচ্ছায়ায়?

কিন্তু ধর্ম আবার কি করিয়া পৃথক হয়, কাদম্বিনী ভাবিয়া পান না। ধর্ম অনাদি, অনন্ত, সনাতন। অবশ্য সেই ধর্মে আর সাধারণ ধর্মে তফাৎ আছে। তাহা না হইলে হিন্দুর ধর্ম ও খৃষ্টানের ধর্মে তফাৎ হয় কেন? শুধু দুই সমাজের দুই জীবন-যাত্রার জন্য এই পার্থক্য? ইহা আচার ধর্মের পার্থক্য। কিন্তু আচার তো দেশে দেশে বদলায়, কালে কালে বদলায়। ইহা অমরের অশোকের কথা; কিন্তু ইহা জ্ঞানশঙ্করও বলিতেন।

তাই কাদম্বিনী তাহা অনেক পূর্বেই শুনিয়াছেন, আর মানিয়া লইয়াছেন। মহাভারত রামায়ণ পড়িতে গিয়া এই সত্যই তাঁহার আরও বেশি করিয়া আজকাল মনে হইয়াছে। আবার তাঁহার মনে পড়ে—অত দূরে যাইবার কি প্রয়োজন? আপনার জীবনেই কাদম্বিনী এই সমাজের কত পরিবর্তন দেখিতেছেন। তখনো তিনি চৌধুরী বাড়ির বধূ, এই বাড়ির রাজীব চৌধুরী অনেক আগেই ব্রাহ্ম হইয়া পৈতা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। ধনে মানে প্রতিষ্ঠায় এখন রাজীব চৌধুরী প্রসিদ্ধ। কিন্তু তখনো বাড়ির বড় কর্ত্রী সেই পৈতা ছেঁড়ার কথা উল্লেখ করিয়া রাজীবকে 'মহাপাপিষ্ঠ' বলিয়া ঘোষণা করিতেন। আর আজ এই গ্রামেই পূজার বাড়িতে যদি বা অমর জামা-গায়ে থাকে, অশোক বিনা পৈতায় খালি গায়েই ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ দেখিয়াও তাহা প্রায় দেখিতে চাহে না,—জ্ঞান চৌধুরীই শুধু ক্ষুণ্ণ হন। একদিন চাটুজ্জেদের বাড়ির মেয়েকে তাহার কলেজে-পড়া স্বামী জোর করিয়া জ্যাকেট পরাইয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিল বলিয়া গ্রামের লোক সে অন্যায় সহ্য করিতে চাহে নাই। বিভূতিশঙ্কর, জ্ঞানশঙ্কর তখন তাহাদের কত করিয়া বুঝান—শহরে এইরূপই নিয়ম। আর আজ চৌধুরী বাড়িরই মেয়ে ইন্দিরা কলিকাতা হইতে এই গ্রামে ফিরিয়া আসে জুতা পায়ে, এই ভদ্রাসনে অশোক ছত্রিশ জাতের শ্রীক্ষেত্রে জমাইয়া তোলে। অবশ্য এখনো কেহ কেহ নিন্দা করে, তাহারা নৃপেনের মতই মানুষ। তাহাদের কাহারও তুলনায় অশোক অমর কি অধার্মিক, না, অসামাজিক? অমর অশোক কোনো ধর্মই মানে না—ভগবানেও বিশ্বাস করে না। ভগবান নাকি আফিংএর মত।

কাদম্বিনী জানিতেন হিন্দুর ভগবান, খ্রীষ্টানের ভগবান—আসলে এক, আসলে সকল ধর্মও এক। অশোক বলিতেছে হিন্দুর ভগবান,

খ্রীষ্টানের ভগবান আসলে এক, দুইই আকিং, ধর্মও তা'ই। অশোক বলিয়া গেল—বড় লোকের ধর্ম ও গরীবের ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। তাহা কি করিয়া হয়? সত্য মিথ্যা, পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, এই সব কি বড় লোকের একরূপ, গরীবের অন্যরূপ? কিন্তু সত্য, মিথ্যা, পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়, কি অত সহজে নিশ্চিত বুঝা যায়? কাদম্বিনী যেন তাহাও স্থির বুঝিতে পারেন না।

গ্রীষ্মের ছুটির শেষে অমর আসিল—মায়ের সহিত দেখা করিয়া সে কর্মস্থলে ফিরিবে। তখন বর্ষা নামিয়াছে। নদী ভরিয়া উঠিতেছে। খালে বিলে নূতন জল আসিতেছে—এবাড়ি ওবাড়ি যাতায়াতে বড় অসুবিধা। চৌধুরী বাড়ীর বৈঠকখানা তাই এবার আর অমর গ্রামের দশজন যুবককে লইয়া সরগরম করিয়া তুলিতে পারে না। বাড়িতে সে একা—ইন্দিরা আগেই চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই দুইটি সপ্তাহের মধ্যে অমর বুঝিল বাড়িতে সে আর একা নাই, অন্য আরও একটি মানুষও আছে। না, কাদম্বিনীর কথা নয়, তিনি আবার অমরের নিকট কবে একটা বিশেষ স্বতন্ত্র মানুষ? কিন্তু কাদম্বিনী ছাড়াও চৌধুরী বাড়িতে আরও একটি মানুষ তাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। একজোড়া কান তাহার পদধ্বনির জন্য বুঝি উৎকর্ণ হইয়া ছিল, আর অভ্রান্ত রূপে তাহা চিনিয়া লইয়াছে। এক জোড়া পদ অবনত কম্পিত একটি দেহকে বহন করিয়া তাহার দৃষ্টি-পথটিতে কারণে-অকারণে বারে বারে গতায়াত করে। রুচি ও প্রয়োজন বুঝিয়া একজোড়া হাত নেপথ্য হইতে তাহার জন্য সযত্নে আয়োজন করে—পান নয়, সিগারেট নয়,—তাহা অমর অভ্যাস করে নাই,—চা। এ বাড়িতে তাহাও আজকাল কয় বৎসর যাবৎ আর নূতন

নয়। কিন্তু উহার সঙ্গে এই বর্ষার দিনে বড় সুসময়েই আসে গরম গরম ভাজা চিঁড়া, কখনো সদ্য ভাজা মুড়ি, তেলে লঙ্কায় মাখা; কাঁঠাল বীচি ভাজা;—কফির মত যাহার গন্ধ নাসিকাকে প্রলুব্ধ করে, কখনো গরম নিমকি; অথবা সেই 'শাশ্বত সম্পদ বাঙালী সভ্যতার' নারিকেলের চিঁড়াকুচা, কিংবা নারিকেলের সন্দেশ পিঠা।

মা রাঁধিতে জানেন; আর প্রবাসে থাকিয়া অমর জানে ভারতবর্ষে বাঙালী ছাড়া কেহ খাইতে শিখে নাই। পুষ্টির প্রয়োজনকে রসনার রসে উত্তীর্ণ করিতে পারাই রান্নার আদর্শ। তাহাতে সামান্যকে অসামান্যের কোঠায় তুলিতে পারেন বাঙালী মেয়ে, বাঙালী মেয়ের শিল্প প্রতিভা এইখানে। অবশ্য এই শিল্প-প্রতিভার অধিকারী কাদম্বিনীই, অন্তত চৌধুরী কর্ত্রীরা, অন্য কেহ নয়; তাহাও জানিত অমর। কিন্তু এই বর্ষার কচুর লতি ও ইলিশের রান্না খাইতে খাইতে মানিতে হয়—আরও কেহ এই প্রতিভার পরিচয় দিতে কম সমর্থ নন, এবং কম আগ্রহান্বিতও নন।

কাদম্বিনী তত্ত্বটা পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই কি করিবেন, ইহার শুভাশুভ কি। ইন্দুমতীকে আপনার করিয়া লইবার জন্যই তো তিনি এই গৃহে তাহাকে আনিয়াছেন। শুধু নিরাশ্রয় বলিয়া তাহাকে আশ্রয় দিতেছেন, এ ধারণা তাঁহার কোনো সময়ে ছিল না। ইন্দুকে ভ্রাতৃগৃহে দেখিয়া আবার তাহার জন্য মমতা বোধ করিয়াছিলেন;—পার্বতীর মত তাহার মুখখানা! তারপর তাহাকে ইন্দিরার মত আপনার কাছে রাখিতে চাহিয়াছেন, আপনার অন্তরের দরদ ও বিচার বুদ্ধি দিয়া আপনার মত করিয়া কাদম্বিনী ইন্দিরার অভাবে ইন্দুমতীকে গড়িতে গিয়াছেন। গড়িতে গড়িতে আবার সত্য সত্যই ইন্দুমতী তাঁহার অনেক বেশি আপনার হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মধ্যে নিজেও সে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। কাদম্বিনী কি না বুঝিয়া পারেন

ইন্দুর সেই শঙ্কিত বঞ্চিত দিন রাত্রির সংগ্রাম···আপনার মধ্যে আপনার দিন রাত্রি লজ্জায় ভয়ে কুণ্ঠায় মরিয়া যাওয়া? হতভাগিনী ইন্দু পূর্বে সংযম নিয়মের মধ্যে আপনাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, হয়ত মারিয়া ফেলিতেও পারিত। কিন্তু কাদম্বিনীর তাহার উপর মায়া পড়িল, তিনি চাহিলেন ইন্দুকে বাঁচাইতে। তিনি জীবনের দিকে ইন্দুর মুখ ঘুরাইয়া দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাশ্চর্য দৃষ্টিতে দেখিলেন—ইন্দু শুধু জীবনকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পায় নাই, তারা দেখিতে দেখিতে সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনাময় বিচিত্র জীবনাকাঙ্ক্ষায়ও উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। আর তারপর দেখিতে না-দেখিতে কখন সেই বিচিত্র পৃথিবীর মোহজালে সে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। সেই আলোক-প্রত্যাশী চিত্তদলের সম্মুখে যেন কোন পূর্বাকাশের সূর্য্যের মত আপনার আলোক আপনি বিকীরণ করিয়া চলিয়াছে অমর···কাদম্বিনী কি করিবেন? একবার চিন্তাকুল হইয়াছেন, আবার নিজেকে শান্ত করিয়াছেন—ইন্দুমতী সংযমে শিক্ষায় আপনার মধ্যেই আপনি সীমাবদ্ধ, আপনার মর্য্যাদাবোধ, কল্যাণবোধ তাহার ভাঙিবে না।—কাদম্বিনী বাহির হইতে তাহাকে কেন বাধা দিয়া সঙ্কুচিত, অপমানিত করিবেন? আব কাদম্বিনী জানেন—অমর বিজাতীয়া কন্যার পাণিপ্রার্থী। সে ইন্দুমতীর দিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না। ভয় তাঁহার মনে জাগে নাই, ইন্দুর জন্য আরও বেশি মমতা, আরও বেশি বেদনাই বোধ করিয়াছেন। অমর যদি তাহা বিন্দুমাত্র বুঝিত!

এমন ইলিশ ভাতে, পৃথিবীতে আর হয় না। অমর বলিয়াছিল।

কাদম্বিনী বললেন, কিন্তু তোমার তো চপ-কাটলেটই ভালো লাগে।

অমনি অমর বলিল:—ইলিশ-ভাতে পাই না বলে।

বেশ তা হলে ইলিশ-ভাতে রাঁধিয়ে কাউকে খোঁজ করি।

করো। পরীক্ষা দিক্। আগেকার দিনে এ পরীক্ষা কিন্তু দিতে হত। আর তোমাদের ছ'পাতা পড়ার থেকে সে পরীক্ষা অনেক বেশি কাজের।

তা হলে বোঝো, রাঁধুনি বউ দেখি এবার—মা বলেন।

সে তোমরা জানো নাকি দেখতে? আমারই খোঁজ নিতে হবে—ফার্পোতে, কিংবা বোম্বাইর গোয়ানিজ অঞ্চলে।—বলিয়া অমর গল্প জুড়িয়া দিল। স্যার উইলিয়ম অরপেন—নাম শোনে নাই তাঁহার কাদম্বিনী?' বড় শিল্পী। বড় বড় লর্ড ঘরের মেয়েরা তাঁহাকে দিয়া প্রতিকৃতি আঁকাইবার জন্য ব্যস্ত। তিনি আঁকেন না। অথচ প্যারির হোটেলের এক শে'র বা রাঁধুনির প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন বহু আদর করিয়া। সুন্দরীরা বলিলেন—'রাঁধুনীর ছবি তুমি আঁকছ, আমাদেরটা আঁকবে না কেন?' অরপেন উত্তর দিলেন, 'বটে! রাঁধো দেখি ওর মত! তখন বুঝবে।'

গল্পে বাধা দিয়া কাদম্বিনী বলিলেন: তা হলে ভালো রাঁধুনি মেয়ে চাই?

অমর গল্প জমাইতে পারিলে আর কিছু চাহে না। বলিল:

মেয়ে? মেয়েরা আবার রাঁধতে পারে নাকি? শুনেছ দেশবিদেশের কোন হোটেলে কোনো হেড শে' বা প্রধান রাঁধুনি মেয়ে? মেয়েরা জানে দাগা বুলোতে—ক্র্যাফ্‌ট অব কুকিং, নট্ দি আর্ট।

আবার গল্প জুড়িয়া দেয় অমর। রাঁধা কখন ক্র্যাফট কখন আর্ট। কিন্তু কাদম্বিনী জানেন—অমর এই ভাবেই আত্ম-গোপন করে। ইহাই ইহাদের প্রকৃতি—উহারও, অশোকেরও।

কিন্তু আত্মগোপন করিলেও অমর অচেতন নয়, অন্ধ নয়।

আর ইন্দুমতীই বা কত আত্ম-গোপন করিবে? কেহ না বলুক, চৌধুরী-বাড়ির এই বর্ষার নিঃসঙ্গ দিনের অতি-সযত্ন অতি-সতর্ক সমাদরের মধ্য দিয়া ইন্দুমতী আপনার মনকে যে প্রতিনিয়ত মেলিয়া দিতেছে, তাহা তো কেহই না দেখিবার ভান করিতে পারে না আর।

কাদম্বিনী আপনার মনে অনেক বিচার করিলেন। অমর কি তবে শান্তাকে ছাড়াও আর কাহাকে গ্রহণ করিতে পারে?

শান্তা দেশে নাই। হয়ত শান্তা তাহাকে ভুলিতে বসিয়াছে। অমরের অন্তত নূতন দিকে আগ্রহও দেখা দিতেছে…অমর জাতিধর্মের আপত্তি গ্রাহ্য করে না। এই সামাজিক কুসংস্কার বিধি নিষেধ দূর করিতেই তাহারও উৎসাহ। অশোকের মত সে উন্মাদ না হউক, সেও আসলে তেমনি সমাজ-সংস্কারক—হয়ত রাজীব চৌধুরীর মত তত উগ্র সে নয়, কিন্তু হয়ত বিভূতিশঙ্করের মতই একটা সহজ সদিচ্ছা ও উন্নতি—কামিতা তাহার আছে। আর এই তো কাদম্বিনী দেখিতেছেন অমরকে এই গৃহে এই স্বগৃহের সহজ পরিবেশে, ইন্দুমতীর সংযত যত্নের মধ্যে অতি নিশ্চিন্ত, অতি-স্বচ্ছন্দ।

কাদম্বিনী সাহস সঞ্চয় করিলেন। বলিলেন: তোমার যদি মত থাকে বলো—

কি বিষয়ে?

কাদম্বিনী পশ্চাৎপদ হইবেন না। বলিয়া ফেলিলেন: ইন্দুকে তোমার কেমন লাগে?

কাদম্বিনীর চক্ষু এড়াইল না—অমরের চোখের দৃষ্টি সতর্ক, চকিত। কিন্তু কথায় তাহার আভাস পাইবার উপায় নাই। সহজ ভাবে অমর বলিল: বেশ ভালো।

ভালো লাগে ওকে?

সহজ ভাবে অমর বলিতেছে: লাগে বৈ কি।

কাদম্বিনী বলিল, তুমি ওকে বিয়ে করবে তা হলে?

প্রস্তুত হইয়াই ছিল, হাসিয়া ফেলিল অমর: ভালো লাগ্‌লেই বিয়ে করতে হবে নাকি? তা হলে যে পৃথিবীতে বিয়ে করেই বেড়াতে হবে আমাকে।

এই সেই অমর! কাদম্বিনী তাহার এই লঘু পরিহাস-কৌশলের সঙ্গে সুপরিচিত। এই ভাবেই সে আপনাকে দূরে সরাইয়া লয়। কিন্তু কাদম্বিনী ছাড়িবেন না। বলিলেন: কেন? ভয় কি তোমার? ও বিধবা? তা এবার আমরা বুঝব। আর তোমরা কত বড় বড় কথা বলো, তোমরা বিধবা-বিবাহ করতে চাইবে না কেন?

সর্বনাশ, মা। ওসব অশোককে বলো—দেশোদ্ধার, সমাজ-বিপ্লব এসব তার প্রোগ্রাম। কিন্তু এদেশে বিধবা কি এক-আধটি? বিধবা বিবাহের সঙ্কল্প নিয়ে বেরুলেও আমি বেশি আর কি করব? বড় জোর একটি ছেড়ে দু'ইটিকে নয় উদ্ধার করলাম।—

কাদম্বিনী নিষ্ঠুর ভাবে পরাহত হইলেন। অনেক দূর তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন—অনেক দুঃসাহসের বশে; কিন্তু অমরকে তথাপি নাগাল পাইলেন না। আর ইন্দু? সে অবশ্য প্রত্যক্ষ্যে কিছুই জানে নাই, জানিল না। কিন্তু আপনার মনে মনে সে তবু বুঝিয়া লইল—কিছু একটা ঘটিয়াছে,—তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ঘটিয়াছে কি? অমর কেমন সাবধান অথচ অন্যমনস্ক মানুষের মত। অমর নৌকা করিয়া গল্প করিতে চলিল কেন স্কুলের বাড়িতে? বাড়িতেই এখন তাহার সময় কম—স্কুলটির উন্নতির কথা হইতেছে। তাহার পর চলিয়া গেল কর্মস্থলে।

আর অমর বাড়ি আসে নাই।

শান্তা ফিরিয়া আসিয়াছে। বারাণসীতে সে কাজ লইয়াছে। অমরও নূতন কাজ লইয়া এখন আসিয়াছে এলাহাবাদে। পূজায়ও সে এবার বাড়ি আসিবে না জানাইল—ছুটি কম, নূতন কর্মস্থলে এত শীঘ্র ছুটি চাহিলে হইবে কেন? সে জানাইল, 'তুমি ইন্দি' দু'জনাতেই এসো এদিকে। না হয় থাক্‌বে বারাণসীতে। দেখবে তোমাদের বিশ্বেশ্বরকে। এ সময়ে কাশী চমৎকার।' তারপর 'পুনশ্চ': 'ইন্দুমতী যদি আসতে চান তা হলে তাঁকে নিয়ে আসবে, তা বলাই বাহুল্য।' কাদম্বিনী পূজার বাড়ি ফেলিয়া যাইবেন, ইহাই কি অমর আশা করে? তাহা হইলে অমর এরূপ লিখিল কেন? অমরেরর পূজায় বাড়ি না আসিবার ইহা একটা ছলনা। কেন? ইন্দুমতী আছে বলিয়া? না, শান্তাকে একবার কাদম্বিনীর নিকট সশরীরে উপস্থিত করিতে চাহে সে?

সত্যই নাকি শান্তা ভালো মেয়ে দেখিলে, যাহার উপর মায়া পড়ে। বড়দিনে সে কলিকাতায় আসিয়া অশোকের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। অশোককে লইয়া পরে ইন্দি' অমি'র সহিত পরিচয় করে। বড় দিনের নানা খেলায় উৎসবে তাহাদের লইয়া গিয়াছে, আসিয়াছে। অমি' তাঁহার প্রশংসায় মুখর,—অমি' ছেলেমানুষ পাগলী। কিন্তু ইন্দি'র কথার মূল্য আছে।—সেও মাকে লিখিয়াছে যেমন শান্তা সুশ্রী, তেমনি ভালো; বুদ্ধি ও আন্তরিকতা, দুই-ই তাহার যথেষ্ট। কাদম্বিনীও বিশ্বাস করেন—হয়ত অশোক সত্যই বলিয়াছিল, দেখিলে কেহ শান্তাকে আর পসন্দ না করিয়া পারিতেন না। না দেখিলেও কাদম্বিনী তাহাকে পসন্দ করেন,—দেখিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি কি অমর এইবার সেই আয়োজন করিয়াছে? না! শুধু তাহাই নয়, অমর হয়ত আর এই গৃহে স্বচ্ছন্দে পদার্পণ করিতে পারিবে না। ইন্দুর সম্মুখে সে আর বুঝি

আবিভূ্ত হইতে চাহে না। কাদম্বিনী জানেন—যে শোভনতা ও কল্যাণ-বোধ অমরের মজ্জাগত তাহাতে সে আর এই গৃহে ইন্দুমতীর সম্মুখে সহজে পদার্পণ করিবে না। অথচ এই তো তাহার গৃহ। পিতৃ- পুরুষের ভদ্রাসন বলিয়া অমর ইহার প্রতি মমতা রাখে কিংবা রাখে না, তাহা বলা কঠিন; কিন্তু যতক্ষণ কাদম্বিনী এই গৃহে আছেন ততক্ষণ চিত্রিসারের এই গৃহই তো অমরের বাড়ি। তথাপি অমর পূজায় চিত্রিসার আসিল না।

জ্ঞানশঙ্করও এবার আসিতে পারিলেন না। মধুখালিতে হিন্দু-মুসলমানে কি মনোমালিন্ত হইয়াছে—কলিকাতার মত দাঙ্গা বাধে নাই, তাই কাদম্বিনী জানেন। কিন্তু কেহ জ্ঞানশঙ্করকে পূজায় সেখান হইতে ছাড়িতে চাহে না। হৈমই বা তবে আসিবে কিরূপে? শুধু ইন্দিরা একা আসিয়াছে বাড়িতে—কালচিতার সেনেদের বাড়ির মেয়ে ও ছেলেদের সঙ্গে। আর সে আসিয়া আবার শান্তার গল্পও কাদম্বিনীর নিকট, ইন্দুমতীর নিকট করিয়াছে: শান্তা বলেন, তুমি আর্টস পড়বে কেন? পড়ো বরং ডাক্তারি। সব চেয়ে নোবল্ প্রোফেসন। আর আমাকে নিয়ে যেতে চান—বেনারসে; হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে।

কিন্তু পূজা বাড়িতে এবার কেহ নাই, জ্ঞান চৌধুরী আসেন নাই, অমর আসে নাই, কেমন যেন ম্রিয়মান নিরুৎসাহ মনে হয় চৌধুরীদের বাড়ি।

কাদম্বিনী কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এই পৃথিবী বড় জটিল। ভালো-মন্দ, শুভাশুভ, পাপপুণ্য কিছুই যেন আপনার বিচারবুদ্ধির সহায়ে তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। একদিন এই পূজাবাড়ি লোকজনে গমগম করিত। আত্মীয় কুটুম্বরা আসিতেন; গ্রামের অনুগত অনুগৃহীতরা কাজকর্ম করিত, দুইবেলা দুই থালা ভাত তাহাদের জুটিতই। গ্রামের লোকেরা নিজ হইতে আসিয়া পূজায় যোগ দিতেন। গ্রামের গরীব

দুঃখীরাও আপনা হইতে আসিয়া পাতা পাতিয়া বসিয়া যাইত—পূজা কি শুধু চৌধুরীদের একার? ইহা যে গ্রামের পূজা, গ্রামের সকলকে লইয়াই পূজা—নিমন্ত্রণ করিতে হইবে কেন? ওইখানে—নাটমন্দিরের এই দীর্ঘসারে—বসিতেন কর্তারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে; তাঁহাদের পার্শ্বে বসিতেন বৈদ্যরা, সম্মুখে কায়স্থরা। আর নাটমন্দিরের বাহিরে ছায়ায় বসিত নানা জাতের শূদ্ররা। আজ নিমন্ত্রণ না করিলে তাহারাও কেহ আর আসে না। মুসলমানরা গত দুই বৎসর হইতেই প্রতিমা দেখিতেও আসিতে ভয় পাইত,—মৌলবীরা নিষেধ করিয়াছে। কলিকাতার দাঙ্গার ফলে এবার প্রায় কেহ আসে নাই। তবু তাহারা বিজয়ার ভাসান দেখিতে গেল দলে দলে। কিন্তু সেই বিজয়ার প্রতিমাকে বিদায় দিতে গিয়া কাদম্বিনী আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন—বাড়িতে জ্ঞান ও হৈমও এবার নাই। আর কেহ কি এই দেবী-প্রতিমাকে আদরও করিবেন না তাঁহার পরে?

ইন্দুমতী বলিল: এই বিধবাশ্রমে আমি যেতে চাই।—হাতে তাহার একখণ্ড চিঠি। ঠিকানাটা কলিকাতার সংবাদ পত্র হইতে সংগৃহীত; একালের এক গুরুবাদী সম্প্রদায়ের আশ্রম।

কাদম্বিনী চমকিত হইলেন: কেন?

ইন্দুমতী বলিতেছিল—সে মন্ত্র লইতে চায়, সাধন ভজন করিতে চায়; এজন্ম গিয়াছে, পরজন্মের কথা ভাবিতে চায়। বলিতে সে বলিতে সে মুখ লুকাইল। তারপর চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আর সে বলিতে পারিল না। বলিবার প্রয়োজনও রহিল না। কাদম্বিনী নিরুদ্দেশ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষে তাঁহারও জল।

ভালো ভাবিয়াই তিনি আজীবন কাজ করিয়াছেন; সৎপথেই চলিতে চাহিয়াছেন, চলিতে সাহায্য করিয়াছেন সকলকে। কিন্তু তাঁহার

সাধ্য কি তিনি বিধাতার সংসারের এই জটিলতা বুঝিয়া উঠিবেন? ইহার পাপপুণ্য, শুভাশুভ ন্যায়ান্যায় বুঝিবেন কি করিয়া তিনি? কি করিয়া বুঝিবেন ধর্ম কি? ইন্দু কি করিবে এই মন্ত্র লইয়া? আশ্রমে, ক্রিয়াকলাপে সান্ত্বনা কোথায় তাহার, যে জীবনে বঞ্চিত? শূন্যতা ভরিবে কি ভাঙা পাঠশালা দিয়া? জ্ঞান চৌধুরীর মত কাদম্বিনীর শাস্ত্র-জ্ঞান নাই, তেমন দূরদৃষ্টি নাই। তাহা হইলে ইন্দুমতীকে এমন নিদারুণ আবর্তে তিনি ফেলিয়া দিতে এই বাড়িতে টানিয়া আনিতেন না। তেমন মানসিক দৃঢ়তাই বা কাদম্বিনীর কোথায়? তাহা থাকিলে ইন্দুর এই মানসিক জ্বালায় আজ কাদম্বিনীকেও বেদনা পাইতে হইত না। তাঁহার অন্তরের মধ্যে তীব্র আলোড়ন জাগে, আর তিনি তাহা সহিতে পারেন না। বুকে তাঁহার বেদনা গুমরাইতে থাকে—সেই পার্বতীর কথা মনে পড়ে। কিছুতেই তিনি বুঝিতেও পারেন না, এত দুর্বলতা ভগবান্ দিলেন কেন মানুষকে? দিলেন তো তিনি মেয়েদের মানুষ করিলেন কেন? পুরুষদের মত কঠিন পাথর করিলেন না কেন? ইন্দুমতীকে লইয়া তিনি কি করিবেন এখন? কোনো তীর্থে যাইবেন কি? পুরীতে, কিংবা হরিদ্বারে! আর অমর যদি চাহে আসুক স্বদেশে স্বগৃহে! শুধু সে সুখী হউক, সুখী হউক সকলে, সুখী হউক।

কাদম্বিনী নিজ হাতে পত্র লিখিতে বসিলেন। চশমা সত্ত্বেও এখন ঝাপসা দেখিতেছেন—চোখে জল আসে। কিন্তু তথাপি লিখিতে পারিলেন।

অমরকে কাদম্বিনী লিখিলেন—তিনি হরিদ্বার বা পুরীতে আপাতত তীর্থবাস করিতে চাহেন। তাঁহার সঙ্গে অবশ্যই ইন্দুমতী থাকিবে; সে না থাকিলে এই বয়সে কাদম্বিনীকে কে আর সেবাযত্ন করিবে? কিন্তু ইন্দি'র নিকট হইতেও বেশিদিন দূরে থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়;

তাই কালিঘাটেও থাকিতে পারেন। কিন্তু বোধ হয় এত নিকটে থাকিলে সত্যই সংসার হইতে তিনি মুক্তি পাইবেন না। তাঁহার নিজের আকাঙ্ক্ষা—হরিদ্বার, না হয় পুরী।

জ্ঞানশঙ্করকে কাদম্বিনী লিখিলেন: তাঁহার বয়স হইতেছে। তাহার বড় ইচ্ছা এবার তীর্থবাস করেন। অন্তত কিছুদিনের মত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিলেও মন হয়ত শান্তিলাভ করিবে। কিন্তু কাহার উপর নীলমাধবের ভার দিয়া যাইবেন? কে দেখিবে এই বাড়িঘর? একবার হৈমমতী আসিয়া বাড়ির ভার গ্রহণ করিতে পারে কি? সরযূ কি পারে না কিছু দিন পিত্রালয়ে থাকিতে—অন্তত কিছুদিনের মত? না হইলে পূজারী চক্রবর্তী ঠাকুর ও ভৃত্য সাধু দাসের হাতেই আপাতত কাদম্বিনী ভার দিয়া যাইবেন।

কাদম্বিনী এইবার এই গৃহ সংসারের নিকট হইতে মনে মনে বিদায় লইবার জন্য উদ্যোগী হইতে লাগিলেন। আবার, কিছু পরেই মনে হইল—বিদায় লইবেন কি করিয়া তিনি? ইন্দিরাকে ছাড়িয়া দূরে তিনি কয়দিন থাকিতে পারিবেন? অমরকে সংসারী না দেখিয়াই কি যাইতে পারিবেন? আর এই চৌধুরী সংসার—সেই ভাঙা মন্দির, ভাঙা বাড়িঘর এই সবেরই বা কি হইবে?

জ্ঞানশঙ্করই প্রথম উত্তর দিলেন:—হিন্দু-মুসলমান ও নানা বিষয় লইয়া এত সেখানে গোলমাল যে জ্ঞানকে রাখিয়া হৈম একপদও নড়িবে না। সত্য বটে সকলেরই সংসারের নিকট হইতে এক সময়ে মুক্তি লইতে হয়। কিন্তু সে মুক্তির দিন না আসিতে সাধ্য কি কেহ মুক্তি গ্রহণ করে? তাহা হইলে এত দিনে জ্ঞান চৌধুরীও অমর অশোকের হাতে সংসারের ভার দিয়া কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারিতেন; আর কাদম্বিনীর তো কথাই নাই। কিন্তু এই সংসারের এই দায়িত্ব ফেলিয়া ইহার

বাহিরে তিনিই বা তীর্থ আর কোথায় দেখিতেছেন? তিনি গৃহকর্ত্রী, কোথায় যাইবেন সেই গৃহভার ফেলিয়া? অন্তত, পুত্র-বধূদের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা তাঁহাদের করিতেই হইবে—কাদম্বিনীর ও হৈমবতীরও। সংসারের বাহিরে আবার তীর্থ কোথায়? ধর্ম কোথায়?

অমরেরও উত্তর আসিল: উত্তম সংকল্প মায়ের। কাশীতেই মা থাকিবেন, ইন্দিরাও পাশ করিয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবে। আর ইন্দুমতীও মায়ের সঙ্গিনী থাকিবেন। কিন্তু ইন্দুমতী শুধু মায়ের রান্নাবান্না করিয়া জীবন কাটাইবেন কেন? কলিকাতায় অশোককে অমর লিখিয়েছে ইন্দুমতী একটা ট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিং লউক। কিন্তু তার পূর্বে মা কেন অমরের নিকট আসেন না? এইটাও প্রয়াগক্ষেত্র। অমরের বাড়িতে কোনো খ্রীষ্টানি ব্যবস্থা নাই—মা বিশুদ্ধ হিন্দুমতেই থাকিতে পারিবেন।

কাশী—অনেক দিনের স্বপ্ন কাদম্বিনীর,—তাঁহার, মহেশ্বরীর, বিভূতিশঙ্করের, জ্ঞানশঙ্করের—বুঝি সমস্ত মানুষের।···কিন্তু এই ঘর দুয়ার? মহেশ্বরী কি ভাবিতেন তাহা ফেলিয়া গেলে? কি ভাবিতেন বিভূতিশঙ্কর? আর কি ভাবিবে শান্তা—কাশীতে তাঁহাকে দেখিলে?

কাদম্বিনী স্থির করিলেন—তিনি কোথাও যাইবেন না।

১১

বাহিরে ব্রজমাধব বাবু আসিয়াছেন, চাকরেরা খবর দিতে জ্ঞান চৌধুরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। ব্রজমাধব বাবু গজুর বাবা। তাঁহারা ছোটখাট জমিদার। অবস্থা এখন তত ভালো না থাকিলেও চাল সাবেকি দিনের মতই রহিয়াছে। বাড়িতে আড্ডা বসে, তাস পাশা

চলে, গান-বাজনার আসরও আছে। খাইয়া বসিয়া যতটুকু সময় থাকে তাহাতেই যায়; ব্রজমাধব বাবু নিজে উদ্যোগী হইয়া বড় কাহারও বাড়িতে যাইতে পারেন না। পান তামাক চা-এর ব্যবস্থা করিতে বলিয়া জ্ঞানশঙ্কর বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। কুশল প্রশ্নাদি হইতে লাগিল,—বর্ষা নামিতেছে, আষাঢ় আসিয়াছে। কিন্তু ব্রজবাবু একটু গম্ভীর। জ্ঞানশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন: কি মনে করে? কাজকর্ম কিছু আছে নাকি?

ব্রজবাবু বলিলেন: একটু জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে। গোপনে হলেই ভালো।

ছুটির দিন। লোক জন ছিল না। ব্রজবাবু তাহা জানিয়া বলিলেন: আপনার অরুণের সম্বন্ধে কথাটা—

ব্যাপার কি? এত গম্ভীর কেন ব্রজবাবু? অরুণ তাঁহার গৃহে গল্প করিত, আড্ডা দিত, ছুটি শেষ না হইতেই সে এবার চলিয়া গিয়াছে। খেলার সীজন্ নাকি সম্মুখে, লীগ্ আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্বে সে মফঃস্বলে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

ব্রজবাবু বলিলেন: আপনার অরুণ কি আমার নিকটে গজুর থেকে আলাদা?

ব্রজমাধব বাবু পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিলেন। জ্ঞান চৌধুরী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। ব্রজবাবু বলিলেন: দেখুন কাণ্ডটা। অরুণ এই চিঠি লিখেছে চিনুকে—আমার মেয়ে চিনু। সে বিবাহিতা মেয়ে—গত বৎসর বিবাহ হয়েছে, এখন সে, শ্বশুর বাড়ি—তাকে অরুণ চিঠি লিখেছে। আর পড়বি তো পড়্ সে চিঠি পড়েছে গিয়ে একেবারে জামাইএর হাতে। পড়ে দেখুন আপনি—

অস্ফুট কণ্ঠে জ্ঞান বলিলেন: আপনি পড়ুন।

না, আপনিই পড়ুন।

জ্ঞান চৌধুরীর সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক, চোখ দৃষ্টিহীন, কিছুই তিনি দেখিতে পান না—দেখিতে তিনি চাহেন না, শুনিতে তিনি চাহেন না; এখানে বসিতেও চাহেন না আর। তিনি পালাইতে চান। আপাতত ব্রজমাধব বাবুর সম্মুখ হইতে পালাইতে পারিলেই বাঁচেন।

জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন: তার আর প্রয়োজন কি? আপনি দেখেছেন তো। তবেই হয়েছে।

না, না। তবু আপনি নিজে একবার দেখুন—সত্যই তার হাতের লেখা কি না।

খামের ঠিকানা-লেখা দেখেই আমি চিনেছি—অরুণের লেখা।

দেখুন—প্রথমেই লিখেছে চিনুকে।—'তোমার পত্র যে এখনই আবার পাব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।' যেন চিনুই আগে লিখেছিল চিঠি। জামাইও তা বিশ্বাস করে বসে আছে। তার অপরাধ কি, ও রকম কথা চিঠিতে থাকলে? চিনুকে নিয়ে তার জা, ননদ সবাই কত জেরা করেছে। জামাই'র পা ছুঁয়ে দিব্যি গালতে হয়েছে—চিনু কোন কালে লেখেনি কাউকে চিঠি; অরুণকে সে জানেও না। জামাই তবু কতকটা ঠাণ্ডা হয়েছে; কিন্তু বাড়ির লোকেরা তা বুঝবে কেন? বলুন তো কি বিপদ! তাঁদেরই বা দোষ বলি কি করে?

না, কি দোষ?

এমনিতেই আমাদের বাড়িতে তাঁরা বউকে পাঠাতে চান না। এর পরে আর দেবেনও না। কি করে তাঁদের দোষ দিই? কিন্তু অরুণকে বিশেষ করে সাবধান করা দরকার। অবশ্য সে ছেলেমানুষ;—গজু রাজুর বন্ধু। সব সময়ে আমাদের বাড়ীতে যায় আসে। ছেলেপিলেরা তাকে ডাকে 'অরুণদা'। আপনার ছেলে, সে কি আর পর আমাদের বাড়ির?

কথা কহিতে পারিতেছিলেন না জ্ঞান চৌধুরী। অন্ত দিকে তাকাইয়া ছিলেন। লজ্জায়, গ্লানিতে, ধিক্কারে তিনি আপনার মধ্যে আপনি মিশাইয়া যাইতে চাহিতেছিলেন। ব্রজমাধববাবু জোর করিয়াই চিঠিটা তাঁহাকে দিলেন। জ্ঞান চৌধুরী ফিরাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, কিছু দরকার নেই।—চিঠিটা ছুঁইলেও তাঁহার দেহ মন যেন বাঁকিয়া যাইবে। একটা অপরিচ্ছন্ন জীবের অপরিচ্ছন্ন হাত বুঝি স্পর্শ করিতে হইবে। গঙ্গাজলে ধুইলেও বুঝি তাহা পরিষ্কার বিশুদ্ধ হইবে না।

এই তাঁহার অরুণ—অশোক নয়, অরুণ। যে অরুণের সরল কল্পনাহীন প্রকৃতি দেখিয়া জ্ঞান চৌধুরী আশান্বিত হইয়াছিলেন—ভবিষ্যতের আশার জালও বুনিতেছিলেন,—সেই অরুণ,—তাঁহার পুত্র অরুণ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অরুণ,—তাঁহার শেষ ভরসা অরুণ—

ব্ল্যাড্ প্রেসার বাড়িয়া গেল কি না তাহা মনে রহিল না।

অন্ধকার ঘরে কেহ নাই মনে করিয়া বিজয় ও অমর বাহিরে চলিয়া গেল। জ্ঞানশঙ্কর বাঁচিলেন। উহাদের চোখে না পড়ায় তিনি যেন নিষ্কৃতি পাইতেছেন।

ভৃত্য আলো লইয়া ঘরে ঢুকিয়া চমকাইয়া গেল—অন্ধকারে একা বসিয়া আছেন বাবু! জ্ঞানশঙ্করের মনে হইল—আলো যেন চোখে সহ্য হইতেছে না। চোখে সূচ বিঁধিতেছে, মাথায় আগুন জ্বলিতেছে। কিন্তু সে কথা ভৃত্যকে বলিতেও তিনি পারেন না, সংকুচিত বোধ করেন। টেবিলের উপরে আলো জ্বলিতে লাগিল। শূন্য দৃষ্টিতে বসিয়া রহিলেন জ্ঞান চৌধুরী। আষাঢ়ের আকাশ ছাইয়া বৃষ্টি আসিল। বাতাস শোঁ শোঁ করিয়া বহিতেছে—বর্ষার ভরপুর নদীর গর্জনও শোনা যায় অদূরে। 'কুঠির মাঠ' ভাঙিয়া 'লাল কুঠির' এ পাড়ায় আসিয়া পড়িয়াছে মেঘনা। জ্ঞানশঙ্করের গৃহ হইতেও তাহার আভাস এখন দেখা যায়—মাঠের

শেষে সেই বন-জঙ্গলের দিকটা যেন আগেই ফাঁকা হইয়া গিয়াছে—মাঠও শেষ হইতে চলিয়াছে। এখন শুধু এইখানকার বাড়ি, দুই একখানি বাগান বাকী— তারপর তাঁহার অচিনতলার বাড়ি!—তীরের উপর দুর্দান্ত তেজে আঘাত করিতেছে বর্ষাস্ফীত মেঘনার তরঙ্গ!

আর পারেন না জ্ঞানশঙ্কর। নিজের মধ্যে নিজেকে ধিক্কার দিয়াও আর সান্ত্বনা পান না। কাহারও সহিত এই কথা না বলিয়া বুঝি তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না আর—তীরের মত ক্ষয় হইয়া পড়িতেছেন তরঙ্গাঘাতে, ক্ষয় হইয়া যাইবেন। কাহাকে বলিবেন তিনি? কে বুঝিবে তাঁহার যাতনা? অমর, অশোক তো অরুণকে জানে; তাহারাও কি জানিত না অরুণের এইরূপ মতিগতি?

জ্ঞান চৌধুরী অমরকে বলিলেন: একটা গোপন কথা—বিশ্রী ব্যাপার। ব্রজমাধব বাবু এসেছিলেন, তাঁর মেয়ে চিনুকে অরুণ চিঠি-পত্র লিখছে। চিনু বয়স্থা, বিবাহিতা মেয়ে। তাকে চিঠি লিখ্‌ছে কেন অরুণ?—অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার বেশী তিনি বলিতে পারিলেন না। ইহা কি অমর অশোকের নিকট বলিবার মত কথা?

কিন্তু অমর বুঝিল—হয়ত বুঝিবার কারণ ছিল। খুব শান্ত ভাবেই সে বলিল: অন্যায় কথা।

আমার যে শুনে অবধি গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করছে।

কেন? যা তা কিছু লিখেছে কি? অভদ্র ইতরের মত!

কি লিখেছে, আমি পড়িনি।

তবে? অন্যায় কিছু লিখেছে তাও বলা যায় না।

ব্রজমাধব বাবু আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। আমি তা পড়ব

নাকি? সে চিঠি আমি ছুঁতে চাই না। একজন ভদ্রলোকের ছেলে আর একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে এ ভাবে চিঠি লিখতে পারে?

কি লিখেছে? কি ভাবে লিখেছে? ছেলেমানুষের ইন্‌নোসেণ্ট্ প্রেমের কথাও তো হতে পারে।

'ইন্‌নোসেণ্ট্ প্রেমের কথা'—অমর বলে কি!—জ্ঞান চৌধুরী বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

কি বলছ তুমি অমর?—বিস্ময়ের অবধি নাই তাঁহার কণ্ঠে।

হয়ত নিছক 'কাফ-লভ্।' ছেলেমানুষ ওরকম করেই।

জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী বিমূঢ় হইলেন—'কাফ্‌লভ্!' অশ্রুতপূর্ব এই শব্দ, তাঁহাদের কালে তিনি অভিধানে ছাড়া ইহার সন্ধানও পাইতেন না। আর অমর অবলীলাক্রমে বলিতেছে 'ছেলেমানুষ ও রকম করেই।' তিনি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তারপর জ্ঞান চৌধুরীর বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল। ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনার স্বরে তিনি বলিলেন:

তোমার কাণ্ড-জ্ঞান নেই, কি বলছ? ভদ্রলোকের মেয়ে, বয়স্থা, বিবাহিতা। তার কাছে পত্র লেখা আর 'কাফ্ লভ্।' এর পরে কি শুন্‌তে হবে আবার ভদ্রলোকের ছেলের সম্বন্ধে? মদ খাবে, মেয়েমানুষ নিয়ে উচ্ছন্ন যাবে—

কিন্তু এ কি কথা জ্ঞান চৌধুরীর মুখে? অমরও নির্বাক হইল বিস্ময়ে। এত দীর্ঘ দিনের অকুণ্ঠিত পরিচয়ে আলোচনায় কোন দিনও সে মনে করিতে পারে না জ্ঞান চৌধুরী এমন কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিহাস পর্যন্ত নির্মল। এই জন্যই না অমর বলিত—তিনি ব্রাহ্মযুগের মানুষ, যখন কালিদাসও ছিল অশ্লীল। অমর তাঁহার ক্রোধ বুঝিয়া বলিল: অরুণ ভুল করেছে।

কিন্তু এমনও হতে পারে। ভুল দু'পক্ষেরই আছে।—এতক্ষণে এইবার বলিল অশোক।

অমর তৎক্ষণাৎ বলিল: সম্ভবত। সম্ভবত কেন, প্রায়ই সেটাই ঘটে।

জ্ঞান চৌধুরী আবার বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলেন। কিন্তু আর তিনি ক্রোধ-পরবশ হইবেন না। যথা-সম্ভব রুষ্ট ভাবেই তাই বলিলেন: অরুণ লিখলেই হল—কিন্তু বলিতে গিয়া থামিলেন, পত্রোল্লিখিত কথাগুলি আসিয়া যাইতেছিল। ছিঃ ছিঃ! তিনি কি করিয়া তাহা উচ্চারণ করিবেন। জ্ঞান চৌধুরী পরোক্ষ ভাষায় বলিলেন, লিখলেই হল যে, তার চিঠি শুধু পত্রের উত্তর।

অমর এবার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলিল: তা'ই লিখেছে নাকি? তবে তো বোঝাই গেল সব স্পষ্ট।

কি বোঝা গেল?

অশোক বলিল: চিনুই উস্‌কিয়েছে, তাই অরুণ দিয়েছে উত্তর।

জ্ঞান চৌধুরী আগুন হইলেন: তুমি এত ইতর হয়েছ, অশোক? ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে এমন কথা উচ্চারণ করতে তোমার বাধল না?

অশোক বলিল: বাধছিল বলেই আগে বলিনি, কিন্তু বলাই উচিত ছিল।

অশোক কথাটা জানাইল—অরুণের হোষ্টেলের সাহেব সুপারিন্‌-টেন্‌ডেন্‌ট্‌ অশোককে বলিয়াছিলেন, 'আমি গ্রস্‌ কিছুই দেখি না। অ্যার অরুণ ইজ্‌ এ স্পোর্টস্‌ম্যান, ইউ নো। বাট্‌ দি গাল মাষ্ট ষ্টপ্‌।' ব্রজবাবুকে চিনুর একখানা চিঠি তিনি আগেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাড়ির কেহ তাহা চাপা দিয়াছে, ব্রজবাবু পান নাই; না হইলে ব্রজবাবু আগেই সব জানিতে পারিতেন।

জ্ঞানশঙ্কর একটা ব্যক্তিগত সান্ত্বনালাভের অবকাশ পাইলেন;—তাহা

প্রত্যাশা করিয়াই কি তিনি অমর অশোকের নিকট এই কথাটা তুলিয়াছিলেন ? ছিঃ, তাহাও কি সম্ভব ! অরুণের আচরণ গর্হিত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আর জ্ঞানশঙ্করের মন যে গ্লানিতে লজ্জায় ভরিয়া যাইতেছে, তাহাও এই কথায় দূর হইবার মত নয়। বরং নূতন এক আশঙ্কা নৈরাশ্য তাঁহাকে আরও আকুল দিশাহারা করিয়া তুলিতে চাহিতেছে—ভাবনাহীন, নিয়মহীন, যে আদর্শভ্রষ্ট অনাচারে সমাজের বাহিরের মহলে পুরুষদের জীবন বিভ্রান্ত হইতেছে, কিংবা মূলহীন দুই একটি নরনারীর জীবন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে, সে অনিয়ম অনাচার কি ভদ্র পরিবারের অন্তঃপুরের আঙিনায়ও আসিয়া প্রবেশ করিতে পারে, ক্ষয় করিতে শুরু করিতে পারে এই সমাজের সেই শাশ্বত গৃহাভক্তি ?

না, জ্ঞানশঙ্কর তাহা মানিবেন না। ব্রজবাবুদের বাড়ির কোন খানেই নিয়ম শৃঙ্খলার চিহ্ন নাই ; সর্বত্র শিথিলতা, চারিদিকে আড্ডা আর ইয়ার্কি। তাই তো গজুদের সহিত অরুণের অত মেলামেশাও জ্ঞান পসন্দ করিতেন না। ভিতরে-বাহিরে যে সংসারে কোনো বাঁধন নাই সেখানে সব ছত্রখান হইয়া পড়িবে—ইহা আর নূতন কি ?

তবু সমস্ত শুনিয়া কেমন ঠাণ্ডা হইতেছে মাথাটা। রাত্রিতে ঘুম বাধা পাইল না।

পূজায় অরুণ বাড়ি আসে নাই, এবার পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষার পূর্বেই জানা গেল—অরুণ কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও পলায়ন করিয়াছে। পরীক্ষার ফিও সে জমা দেয় নাই।

হৈমবতী আকুল হইল। জ্ঞানশঙ্করকেও মুখ ফুটিয়া সে বলিতে পারে না—অরুণের মতিভ্রমে সে শুধু লজ্জিত নয়, একেবারে নিরাশ হইয়াছে। হৈম ভাবিয়া পায় না—কি করিবে সে।

অশোককে লইয়াই হৈম'র ভাবনা ছিল বেশি। চিরদিন সে তাহার মাকে দূরে দূরে রাখিয়া চলে; হৈমবতী তাহার নাগাল পায় নাই। হৈম'র কোন সাধই সে পূর্ণ করে নাই—সে ভালো করিয়া পাশ করিয়া দশজনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিল না; সে দশজনের মত ঘর সংসার করিয়া তাহার মাতার মনের আশা আকাঙ্ক্ষার কোনো সুস্থির অবলম্বনও জোগাইল না; সে বারে বারে নানা বিপদে জড়াইয়া পড়িয়া তাঁহার মাতার জীবনকে চিন্তায় ভাবনায় অস্থির করিয়া দেয়; সে কোথাকার যত সৃষ্টি ছাড়া কথা ও কাজ জুটাইয়া তাহার পিতার মন ও প্রাণকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে।—কিন্তু অরুণ যে হৈমকে জ্ঞানকে লজ্জায় গ্লানিতে, সঙ্কোচে দুশ্চিন্তায় আরও পীড়িত করিয়া তুলিল! তাহার কথা যে কাহারও কাছে বলিবার মত নয়; হৈমবতী পর্যন্ত তাহা জ্ঞান শঙ্করকেও বলিতে কেমন বাধা পায়। সেবার জ্ঞান মর্মাহত হইয়াছিলেন—অরুণ যখন পরীক্ষায় নকল করিয়াছে শোনা গেল। তারপর চিনুর নিকট অরুণের চিঠি লেখার কথা শুনিয়াই তিনি লজ্জায় গ্লানিতে প্রায় মরিয়া গিয়াছিলেন। এখন সে পরীক্ষা না দিয়া পলাইয়া গেল,—কোথায় গেল ঠিক নাই।—তাহা জানিয়াও কিন্তু জ্ঞান বিশেষ অস্থিরতা প্রকাশ করেন নাই। হৈম'র তথাপি জানিতে বাকী নাই—অরুণের আচরণ তাহার পিতাকে কতটা আলোড়িত করিতেছে।—এখনো তিনি শুধুই বলেন, 'ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া না শিখলে, মানুষ না হলে, তার কথা ব'লে কি হবে?'…সেই চিনুর নিকট চিঠি লেখার কথা জানিয়া অবধি তিনি আর অরুণকে মনে মনে ক্ষমা করিতে পারেন নাই।—অমর অশোক যাহাই বলুক, জ্ঞান চৌধুরী অন্তত মানুষ না হইলে অরুণের নামও আর মুখে উচ্চারণ করিতে চাহেন না।

হৈম সেই অবধিই শঙ্কিত ছিল। সে ভাবিয়া পায় নাই—সত্যই

তাহার অরুণ কি করিয়া পরের মেয়েকে চিঠি লেখে? অরুণও ভাবে ঐ সব কথা? অরুণ—কিই বা তাহার বয়স? আঠারো বছর হইয়াছে কি হয় নাই—দেখিতে না হয় আজ সে বেশ বড় সড়, বলিষ্ঠ। কিন্তু এই সেদিন সে হৈমর ক্রোড়ে আসিয়াছিল— সরযূ ও কমলার পরে তাহার জন্ম। দুইটি মেয়ের পরে, জ্ঞানশঙ্করের দ্বিতীয় পুত্র। কত আনন্দিত হইয়াছিলেন সেদিন মহেশ্বরী,—'বিভূতিশঙ্কর। বাড়িতে কত আদর ছিল তাহার, সে বাড়ির কনিষ্ঠ ছেলে। আজ না হয় অমি' তাহারও পরে আসিয়া তাহার পিতার আদর আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তখনো বিভূতিশঙ্কর জীবিত, আর তাঁহার স্নেহ আদরের ভাগ অরুণ আব শিশু ইন্দি'ই তখন অজস্র লাভ করিয়াছে। দেখিতে সে উজ্জ্বল গৌর, পরিপুষ্ট সুন্দর দেহ,—বাড়িতে যে কেহ সেদিন আসিত অরুণকে ডাকিয়া কাছে টানিয়া লইত। হৈমও গর্ববোধ করিত তাহার দিকে তাকাইয়া—সে তো অশোকের মত দেখিতে সাধারণ শ্যামবর্ণ নয়। মাষ্টাররা পর্যন্ত তাহাকে স্নেহ করিতেন,—সে বুঝি অশোক অমবকেও ছাড়াইয়া যাইবে লেখাপড়ায়। শম্ভু পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন অরুণকে, 'তোমাকে কে ভালোবাসে বেশি, অরুণ?' ছয়-সাত বৎসর পূর্বে তিনি যখন এই প্রশ্ন অশোককে করিয়াছিলেন, অশোক বলিয়াছিল, 'ঠাকুরমা,'। কিন্তু অরুণ বলিল, 'মা,'। অথচ তখন অমি' ছোট, তাহার মায়ের কোল জুড়িয়া বসিয়াছে। তবু অরুণ জানিত তাহাকে ভালোবাসেন মা। শম্ভু পণ্ডিত সেই গল্প তুলিয়া জ্ঞানের সম্মুখে তখন অশোককে পরিহাস করিতেন 'অশোকের তো মা নয়, মা অরুণের।' আড়াল হইতে হৈম তাহা শুনিয়া পুলকিত হইয়াছে। অরুণ তখনকার দিনে সেই পরিহাস না বুঝিতে পারিয়া বহির্বাটি হইতে পালাইয়া আসিয়া লজ্জায় মায়ের অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়াছে।

আর তাহার সেই মুখ খানির দিকে তাকাইয়া স্নেহ ও হর্ষে হৈমর বুক উথলিয়া উঠিয়াছে।

সত্যই অরুণ জানিত—অরুণেরই মা হৈম। অরুণের তাহাকে না হইলে চলিত না। সে খেলা করুক, যেখানে গল্প করুক, যত দৌরাত্ম্য করুক, শেষ পর্য্যন্ত বাড়ি ফিরিয়া মাকে তাহার পাইতে হইবে, মায়ের হাতের রান্না খাইতে হইবে, আর খাইতে খাইতে মায়ের সহিত রাগও করিতে হইবে। মায়ের কথা সে শুনিতে চাহিবে না, রাগ করিবে। পড়িতে বলিলে উল্টা বলিবে, 'লেখা পড়ার তুমি কি বোঝো?' তারপরে লেখাপড়ার কথা তুলিলে অভিমান করিয়া বলিবে, 'তোমার অশোকই তো আছে বিদ্বান ছেলে, আমরা নয় মুর্খই হলাম।' আসলে হৈম জানে—অরুণ অবুঝ; কিন্তু সে তাহার মাকেই আপন বলিয়া জানে, মায়ের সান্নিধ্যই চায়, মায়ের স্নেহঅক্ষরেখার বাহিরে সে থাকিতে চায় না। তাই তাহার বিষয়ে হৈমও ছিল নির্ভাবনা।

অশোককে লইয়া এমন নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ এক মুহূর্তও হৈমর ছিল না। সে কিছুতেই হৈমর নৈকট্য স্বীকার করে নাই। তাহার কথার ও কাজের অন্ত নাই, বিদ্যাও বুদ্ধিরও খ্যাতি আছে—নানাগুণী লোকের নিকট। কলিকাতার কত লোক তাহাকে চিনে, কত লোক তাহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা করে। সে কাগজে লিখে, কাগজ চালায়—কি যে লিখে কি যে করে, তাহা সেই জানে, হৈমকে বলিবে না। সে কাগজ চালাইবার জন্য ছাত্রী পড়ায়। বি, এ ক্লাশের একটি ছাত্রী নাকি এখন অশোকের নিকটে পড়ে। অবশ্য জ্ঞান চৌধুরীর হাতে টাকা বেশি নাই;—সেদিনও ধার করিয়া নৃপেনের জামিন জোগাইতে হইয়াছে, কত আর পারিবেন তিনি? অশোকের সেই বিচার বিবেচনা আছে। কিন্তু এই সব কাগজ কি না চালাইলেই নয়? আর একবার হৈমকে সে লিখিলও

না কেন টাকার জন্য? লিখিল না সে ছাত্রী পড়ায়, আর—কে সেই ছাত্রী? হৈম জানিয়াছে মালিনী নয়,—যে মালিনী এখান হইতে আই-এ, পড়িবার জন্য অশোককে ধরিত। তাহার পূর্বে এখানেই অশোকের কাছে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিত ললিতা, অশোক তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছে মাত্র—সে পড়িত এক ক্লাশ নীচে। এখন ললিতার স্বামী কলিকাতায়। অমরকে তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিল বলিয়া হৈম জানিল—অশোক তাহাদেরই কোন্ আত্মীয় কন্যাকে পড়ায়।—আর 'আমাদের সঙ্গে দেখা করবার সময়ও পান না।'—বলিয়াছে ললিতা। মালিনীও অমি' ইন্দিরার নিকট বলে, 'অশোকবাবুর দেখা নাই এক যুগ।'—অশোকের তো এইরূপই স্বভাব—তাহার খোঁজ কেহ পাইবে না;—হৈমও না। আর, তাহা পাইবে নাকি ললিতা নিমন্ত্রণ করিয়াছে বলিয়া? কিংবা মালিনী বি-এ পরীক্ষা দিতে চাহে বলিয়া? কিন্তু কত মিথ্যা ললিতা আর মালিনীকে লইয়া অশোকের জন্য হৈমর যে ভয় হইয়াছিল।—অবশ্য অশোক সকল অন্যায়ের অতীত তাহা হৈম জানিত। কিন্তু একটা বাজে মেয়ের জালে পড়িল কিনা অরুণ—যে অরুণ মাকে অত আপনার বলিয়া জানিত?

জ্ঞানের নিকট হৈম মুখ ফুটিয়া তাহার সন্দেহ প্রকাশ করে নাই, কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস—চিনু মেয়েটাই ভালো নয়। ভালো হইবে কিরূপে? তাহাদের বাড়িটাই ভালো নয় যে। চিনুকেও হৈম দেখিয়াছে। তখন অবশ্য হৈম কিছুই মনে করে নাই। কি করিয়া সে জানিবে অতটুকু মেয়ের পেটে অত কুবুদ্ধি? অমিতার বয়সেরই মেয়ে চিনু, কিন্তু অমিতা তো এই সবের কিছুই জানে না। সে এখনো ছেলেমানুষ—জ্ঞান চৌধুরী সত্যই বলেন, সে 'পাগ্‌লী'। অথচ কি রকম সর্বনেশে মেয়ে এই চিনু! জ্ঞান চৌধুরী যতই রাগ করুন্ অরুণের উপরে, হৈমবতীর সন্দেহ নাই—

তিনি বুঝিতে পারেন নাই—চিন্ময়ই নষ্টের গোড়া। নির্মল নিষ্কলঙ্ক মানুষ তাঁহারা, স্ত্রীলোকের ধার-ধারিতেন না, কাছেও যাইতেন না। তাই ভাবেন পৃথিবী বুঝি ঐরূপই। সকলেই বুঝি অমিতার মত সরল ও আত্মভোলা; ইন্দিরার মত ধীরবুদ্ধি ও স্থিরমতি; কমলার মত কর্ত্তব্যপরায়ণা ও বুদ্ধিমতী। এ কালের ছেলেমেয়েদের তিনি দেখেন নাই, জানেন না। তাঁহাদের কালই ছিল অন্যরূপ। সে মানুষও ছিল অন্যরূপ। তাঁহারা ছিলেন অন্য মানুষ!

তেমন মানুষ আর একালে হইবে না। অরুণ কেন, অশোকও হইবে না, অমরও হয় নাই। সেকালই ছিল একরূপ; একালই অন্যরূপ। জ্ঞানশঙ্করও তাহা জানেন, কিন্তু বুঝিতে চাহেন না—কেন এইরূপ হইবে। হৈমও তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু সে বুঝিতে পারে—আজকালকার ছেলেরা মেয়েরা আগেকার দিনের মত হয় না। অশোকই হয় নাই, আর অরুণ। অমরের মত মানুষই স্থির করিয়াছে—খ্রীষ্টান মেয়েকে বিবাহ করিবে, না হইলে বিবাহ করিবে না। অরুণের আর বুদ্ধি কি? কিই বা তাহার বয়স? না হইলে পরীক্ষা না দিয়া সে এমন হঠাৎ পালাইয়া যাইত না। পরীক্ষা না দিয়াছিল এখানে আসিলেই পারিত, অবশ্য হৈমবতী তিরস্কার করিত। আর জ্ঞান চৌধুরী তাহার উপর সেই আপত্তিকর পত্রের জন্য রুষ্ট হইয়া আছেন, এখন হয়ত তিনি বাক্যালাপও বিশেষ করিতেন না।—হৈম জানে, আসলে এই ভয়েই অরুণ পূজায়ও তাঁহাদের নিকট আসে নাই। এই কারণেই এখনো সে এখানে আসিল না। কিন্তু অবুঝ অরুণ, গেল সে কোথায়? সে কি বোঝে না—একটা খবর না পাইলে তাহার মা কি করিয়া বাঁচেন? সে হয়ত তেমনি মনে করে—'পিতামাতা কেহই, তাহাকে সুনজরে দেখেন না।' অথচ হৈমবতী তাহার একটা

মঙ্গল সংবাদ না পাইলে আজ ঘরে ফিরিতে পারিতেছে না। কোথায় অরুণ?

দিন পনের পরে জানা গেল—অরুণ এক বন্ধুর সঙ্গে পুরী গিয়াছে।

১২

কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধিল—মসজিদের পথে বাজনা উপলক্ষ করিয়া হিন্দু মুসলমানে খুনা-খুনি হইতেছে। হৈমবতী ছেলে-মেয়েদের জন্য চিন্তিতা; অমি,' ইন্দি' মেয়ে-হোষ্টেলে আছে, অরুণ এখন কলিকাতায় নাই, কিন্তু বিশেষ চিন্তা অশোকের জন্য—সে নীরব থাকিতে জানে না। কি করিয়া বসিবে কে জানে? কিন্তু অশোক কিছুই করিল না; বরং এমন সব কথা কাগজে লিখিতেছে যাহা পড়িয়া মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু তাহাও ভাবিবার সময় রহিল না। দাঙ্গার তরঙ্গ আসিয়া লাগিল পূর্ব বাঙলার এই শহরে। সেই মেনকা সুন্দরীর মামলার জের এখনো মিটে নাই, মেয়েটা বারে বারে হিন্দুর হাত ফসকাইয়া মুসলমানদের হাতে গিয়া পড়িতেছে—আইনের ও বুদ্ধির জোরে হিন্দুরা তাহা ঠেকাইতেছিল। কলিকাতার সংবাদে এখন তাহাতে যেন ইন্ধন দিতেছে। কী উত্তেজনা মুসলমানদের চোখে মুখে। কলিকাতার হিন্দুরা তাহাদের মস্জিদ অপবিত্র করিয়াছে! এত সাহস বিধর্মীর! সাড়ে সাত শত বৎসর ধরিয়া যে মুসলমান জাতি দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারতের রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছে, ইরাণ, তুরান, মিশর, মরক্কো হিস্পানি যাহাদের পদভরে কাঁপিয়াছে—তাহাদের একমাত্র আল্লাহ র পবিত্র উপাসনাস্থান অপবিত্র করে এখন ভারতবর্ষের বিধর্মীরা!

মসজিদে মসজিদে সভা হইতেছে। দোকানে বাজারে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, মাতব্বরদের গৃহে গৃহে সেই একই আলোচনা, একই পরামর্শ— মোসলমান, হিন্দুকে বাধা দিতে প্রস্তুত হও; হিন্দুর সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করো।

চারিদিকে যেন বারুদ জমিয়া উঠিতেছে। কখন কোথা হইতে একটা স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া আসিয়া পড়িবে এক নিমেষের মধ্যে ফাটিয়া পড়িবে বারুদের স্তূপ। হিন্দুরা চিন্তিত, সংখ্যায় তাহারা অল্প; প্রায়ই ভদ্রলোক, ঐক্যশক্তি বা রক্ষাশক্তি কোনোটাই তাহাদের প্রচুর নয়। তাহাদের মান-মর্য্যাদা যে অতি সহজেই নষ্ট হইতে পারে; এবং একবার নষ্ট হইলে তাহা আর উদ্ধার করাও যায় না। বুদ্ধিমান্ লোকের এই সময়ে উত্তেজিত মুসলমানদেব কথাবার্তা কানে শুনিয়াও না শুনিবার ভান করিতে হয়; গোলমালের কারণ দেখিলে কৌশলে পাশ কাটাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু শুধু পাশ কাটাইয়া গেলেও চলিবে না, আত্মরক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে—অবশ্য খুব কৌশলে আর খুব গোপনে। সতর্ক থাকিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া উগ্রতা বা অসহিষ্ণুতা দেখাইলে হইবে না।

জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজ। তিনি সাবধানতা অবলম্বন করিতে জানেন। ব্রিটিশ রাজের প্রয়োজন যে এই জাতির পক্ষে শাশ্বত, সে বিষয়ে স্বভাবতই তিনি নিঃসংশয়। এইবার তাহা এই আনগ্রেটফুল দেশের লোকদেরও তিনি বুঝাইয়া দিতে পারেন। হিন্দু ও মুসলমান শহরের দুই দলের প্রতিনিধিকে তিনি ডাকাইলেন; তাঁহার নির্দেশ মতই শহর-কোতোয়াল নামের তালিকা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে।

মুসলমান প্রতিনিধিরা বলিলেন, হিন্দুদের শুদ্ধি ও সংগঠন বন্ধ না করিয়া দিলে শান্তিরক্ষা অসম্ভব। কিন্তু শুদ্ধি এই অঞ্চলে কোথায়?

সংগঠনই বা কোথায়? মুসলমান প্রতিনিধিরা উত্তর দিল—কেন, হিন্দুরক্ষা সভা আছে; সেদিনও তো তাহার কোন প্রচারক আসিয়া শহরে বক্তৃতা দিল।

হিন্দুরক্ষা সভার অস্তিত্বটা কাগজপত্রেই ছিল। কিন্তু উাহার বিরুদ্ধেই বা প্রচার চলিবে কেন? কাহারও উত্তর দেওয়া উচিত। জ্ঞান চৌধুরীই বলিলেন—হিন্দুরক্ষা সভা হিন্দুর সামাজিক সমস্যা হইয়া ব্যাপৃত, সমাজ-সংস্কারই তাহার উদ্দেশ্য। অন্য কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সে কেন বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিবে?

মুসলমানেরা বলিলেন: বরাবর তো এই হিন্দুরক্ষা সভা ছিল না। এ জিনিসটাই তাই মুসলমানের চক্ষে সন্দেহজনক।—এক গাদা হিন্দু-সংবাদপত্র সম্মুখে ফেলিয়া সাহেবকে একজন বলিলেন, এগুলি বন্ধ করা দরকার।

হিন্দুদেরও একজন একখানা 'ছোলতান' সাহেবের কাছে দিয়া বলিলেন,—হুজুর আমরা আপনাকে এ কাগজখানা পড়ে দেখতে বলি।

দুই পক্ষে কেহ কাহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। দুই পক্ষই সাহেবকে সাড়ম্বরে জানায়, 'সাহেব, আমরা শান্তিপ্রিয়। গভর্ণমেণ্টের আমরা বাধ্য প্রজা।'

ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া বলেন: ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার সাহায্য-প্রার্থীদের ভোলে না। তুলাদণ্ড ঠিক ধ'রে রাখতে সে জানে। শান্তি আমি বজায় রাখব—দেশের বদমাস এলিমেণ্ট গত কয় বৎসরে এজিটেটরদের সাহায্য পেয়ে বেড়ে গিয়েছে। আপনারা দেখবেন পীস্ ও জাষ্টিস্ কাকে বলে।

উভয় পক্ষই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

বিজয় উপস্থিত ছিল। সে কংগ্রেসের প্রতিনিধি—কেহই তাহার

কথা শোনে না। সভার শেষ দিকে সে রাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কী লজ্জা! যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সমস্ত অনর্থের মূল, উভয়েই তাহার পদলেহনে এত আগ্রহান্বিত। ইহারা কি মানুষ? অন্তত এদেশের মানুষ?

জ্ঞান বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, আমরা ত নন-কোঅপারেটর নই! শান্তি ও স্বস্তি বজায় রাখতে হবে না?

দিন দুই পূর্বে নৃপেন্ও বিজয়কে উপহাস করিয়াছে। গুয়োচকের মুসলমান প্রজাদের সে ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে। তাহারা বাবুর হাটের বাবু. কি করিয়া শেখ তুরুককে শাসন করিতে হয় তাহা জানে। এই শহরে বিজয়ের মত হিন্দুরা মুসলমানের ডবে আড়ষ্ট। ল্যাজ পায়ের তলে দিয়া ঘরে গিয়া থাকুক তাহারা। জ্ঞান চৌধুরীর কথায় বিজয়ও এথন ক্রুদ্ধ হইল, বলিল: তবে মুসলমানদের সম্পর্কে বলেন কেন, 'স্বরাজের জন্য ওদের কোন মাথা ব্যথা নেই —ওরা চিনে খেলাফৎ।'

বলি সত্য কথা বলে।

আপনাদেরই বা কি মাথাব্যথা স্বরাজের জন্য? কিছু হতে না হতেই ছুটে গিয়ে সাহেবের কাছে পড়লেন—'সাহেব বাঁচাও! আমরা লয়্যাল সাবজেক্ট।'

বিজয় রাগ করুক, কিন্তু একটা দায়িত্ববোধ তো জ্ঞান চৌধুরীর আছে।

হৈমবতী কিছু জানিত না। যথন জানিল তথনো জ্ঞানকে জানাইতে পারিল না। গ্লানিতে তাহার নিজের মনই ভরিয়া গিয়াছে। আর, ঘরে বাহিরে এত দুশ্চিন্তা জ্ঞানের যে, এই সময়ে তাহাকে এই সংবাদ জানাইলে ইহা তাঁহার পক্ষে মৃত্যুতুল্য হইবে। হৈম রাত্রিদিন দেখিয়াছে জ্ঞান চৌধুরীর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট;—শহরের উত্তেজনা কমে নাই; বরং গ্রামেও আবার তাহা ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বিজয়ই আসিয়া বলিল : কাকাবাবুর সঙ্গে সে দিন বেয়াদবের মত মুখে মুখে কথা বলে এসেছি। কি করব ? এই হিন্দু মুসলমানের কাণ্ড দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। এদিকে জানেন, নৃপেন বাবুকে নিয়ে বিশ্রী গোলমাল হচ্ছে।

হৈমর মুখ পাংশু হইয়া গেল। এইজন্যই তো সে বিজয়কে ডাকাইয়াছিল। অথচ বিজয় নিজ হইতেই যখন কথাটা পাড়িতেছে তখন কেমন যেন তাহার সমস্ত মন আপনার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে। হৈম ভীত কণ্ঠে বলিল : তুমি বলেছ নাকি কর্তাকে কিছু ?

বিজয় বলে নাই,—বাঁচিল হৈম। কিন্তু হৈম কি উপায় করিবে ?

মিস্ মণ্ডলকে নৃপেন এই বাড়িতেই প্রথম দেখে। কমলা তখন সুতিকাগারে, এই ধাত্রীটির বন্দোবস্ত করিয়া দেন ডাক্তার। চালাকচতুর মেয়ে লিলি, কাজের লোক। কিন্তু দুই-একদিনের মধ্যেই হৈমর যেন মেয়েটিকে কেমন-কেমন ঠেকিয়াছিল। সুযোগ পাইলেই সে ছেলেদের পড়ার ঘরে গিয়া বসে, অরুণের পড়াশুনায়ও বাধা দেয়। অরুণ না থাকিলেও সেই ঘরে সে কি করে ? পড়িবার বই খোঁজে—অশোকদের বই সেই ঘরে রহিয়াছে। কাজের অবসরে লিলি পড়িবার বই চায়। কিন্তু তাহাতে নৃপেনকে লাগিবে কেন ? নৃপেন তাহার বই বাছিয়া দেয়। নৃপেনও হৈমকে দেখিয়া এমন কুণ্ঠিত লজ্জিত বোধ করে কেন ?

'এই তো মাসীমা এসে গিয়েছেন।'—বলে লিলি। 'দেখুন তো মাসীমা কি বই কমলা পড়েনি। আপনারা জান্‌বেন্ আমি তো জানি না।'

গম্ভীরভাবেই হৈমবতী বলে, এঘরে কমলার পড়ার বই কোথায় ? কমলাকে পড়ার বই কর্তাই দেবেন তাঁর নিজের আলমারী থেকে। তোমরা তা পাবে না।

কিন্তু তবু লিলির একাজে ওকাজে নৃপেন সাহায্য করিতে

আগাইয়া যায়। কখন যে লিলি কি জন্য সে কাজ করিতে নৃপেনকে বলে, হৈমবতী বুঝিতেও পারিত না। খ্রীষ্টান মেয়েদের চাল-চলন হৈম কি করিয়া জানিবে? মেনকাসুন্দরীকেও তাই তখন হৈম নিজগৃহে স্থান দিতে চাহে নাই। কি করিয়া সেই লিলি পরে সরযূর সঙ্গে পরিচয় করে, তাহার বাড়িতে প্রায়ই গিয়া গল্প করিতে বসে, নৃপেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে;—এই সব হৈমবতী যখন জানিল তাহার অনেক আগেই সরযূর পক্ষেই অসহ্য হইয়াছে লিলির হাব-ভাব। নৃপেনের সঙ্গেও সরযূর দুই চারিবার কলহ হইয়া গিয়াছে—অর্থাৎ প্রতিবেশীরা পূর্বে না জানিয়া থাকিলে তাহা সেই উপলক্ষে যথেষ্ট জানিয়াছে। জানিত না শুধু হৈম। আর জানিয়াও সে এখন জানাইতে পারিল না জ্ঞান চৌধুরীকে,—তাঁহাদের প্রথম কন্যা সরযূ, সে ছিল বড় আদরের। অনেক উৎসাহে তাঁহারা সরযূকে বড় ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। নৃপেনকেও বুদ্ধিমান মনে হইত। তবে মনে হইত সে একটু চিন্তা-ভাবনা শূন্য। বি-এ সে পাশ করিল না, বুদ্ধি-বিবেচনাও তাহার আব হইল না। বারাহীপুরের রাজারা তাহার কাজে সন্তুষ্ট, কিন্তু প্রজা-পাইক গোমস্তা-কর্মচারী কেহ খুশী নয়। সে যেন এখানেও বাবুর হাটের বাবু। এদিকে লিলির সঙ্গে এই ব্যাপারে সে জুটিয়াছে।—চারিদিকে তাহাকে লইয়া কানাকানি, হাসাহাসি, টিটকারী। সরযূকে প্রতিবেশিনীরা চোখ ঘুরাইয়া কি রকম ইঙ্গিত করিয়া যায়। সরযূ কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলে: আমি গলায় দড়ি দোব।

হৈম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, নৃপেনকে ডাকাইল। একথায়-ওকথায় একটু সাবধান করিল, নৃপেন কিন্তু তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। হৈম স্পষ্ট করিয়াই বলিল: এই সব খ্রীষ্টান মেয়েদের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ?

নৃপেন বাবুর হাটের বাবু ; স্পষ্ট কথা সেও বলিতে জানে। হৈম খাশুড়ী বলিয়া কি ? সে বলিল : বলেন কি, তারা হবে আপনাদের বাড়ির বউ !

তৎক্ষণাৎ হৈম কঠিন হইল। বড় ঘরে জন্মিয়াছে নৃপেন, কিন্তু মান্যগণ্য শিখে নাই। এই জায়গা বাবুর হাট নয় ; শহর। এখানে জ্ঞান ও হৈম'র কথা মতই তাহাকে চলিতে হইবে—আর কোন কথা উঠিলে তাঁহারা সহ্য করিবেন না।

হৈম'র মধ্যে যে এতখানি শক্তি ও দৃঢ়তা আছে তাহা নৃপেনের জানা ছিল না। উহার সম্মুখে সে নিজেরই থই পাইল না। অপরাধীর মত পালাইয়া গেল, কিন্তু মনে মনে চটিল। হৈম ডাকাইলেও আর নৃপেন ইহার পরে আসে না। হৈম শুনিয়াছে সে বলে : ঘরে আছেন মেয়ে-মনসা। আবার এখন মায়ের কাছেও হাতজোড় করে কি হিতোপদেশ শুনতে হবে ? এত পোষাবে না আমাকে দিয়ে।

হৈম হতাশ হইয়াছে ; কাঁদিয়াছে। এখনো বিজয়ের সম্মুখে হৈম কাঁদিয়া ফেলিল :—ঘরে বাইরে শান্তি নেই তোমার কাকাবাবুর, বিজয়। এখানে এই দেখ্ছ, ওখানে অশোক কি লেখে ছাইভস্ম। কর্তা পড়ে গম্ভীর হয়ে যান। অমি' তো বাড়ি ফিরে মুসলমানদের খুন করতে চায়। অরুণ নাকি ফিরেছে, এখন না থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখেই বেড়ায় কলকাতায়।

সবই সত্য। বিজয় আরও জানে—গণেশ বাবু বারলাইব্রেরীতে বলিয়া বলেন, জ্ঞান চৌধুরী অত বাইবেল ভক্ত। গোষ্ঠীশুদ্ধ ওরা যীশু ভজ্বেই তো। ওরা তো হিঁদেন্ নয়।

হৈমবতী বলিল : কর্তা জানবার আগে ওই মেয়েটাকে তোমরা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পার না ?

বিজয় বলিল : দেখছি।

কিন্তু নানা কাজের মানুষ বিজয়, হয়ত সময় পাইল না। হিন্দুরক্ষা সভার কাজে তখন বারাহীপুরের ম্যানেজার ও নৃপেন মিলিয়া খুব মাতিয়া উঠিয়াছে। শহরে ভদ্রলোকেরাও জানে—নৃপেন গাঙুলী একটা ভদ্রলোক। এক-আধটুকু তাহার নামে যাহা শোনা গিয়াছে, তাহা এমন কি? সেই মেনকাসুন্দরীর ব্যাপারে ম্যানেজার বাবুর নামেও অমন শোনা গিয়েছিল, ওরকম কথা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে ম্যানেজার বাবুর নূতন কিছু দুর্নাম হইবে না। আসলে সেই মেয়েটাও নষ্ট মেয়ে তো। আর যদি সত্যই কিছু থাকে এই সব কথায়, তাহাতে আপত্তি করিবার কি? পুরুষমানুষের এমন এক আধটুকু এদিক-সেদিক থাকিবেই, না হইলে পুরুষ কি?

বিজয়ই জ্ঞান চৌধুরীকে বলিল : হিন্দুরক্ষা সভার কাজটা আপনি ছাড়বেন না, কাকাবাবু।

জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন : তুমি তো সেই সভা ভেঙে দিতে বলো।

তা এখনো বলি।

অশোকও তাই বলে বোধ হয়। দেখেছ সে কি লেখে?

সে যা বলে তা আমি মানি না। সে বলে দাঙ্গা বাধায় দ্বিতীয় পক্ষ—ইংরেজ শাসক আর দেশের বড় লোকেরা একত্রে ব'সে পরামর্শ করে। তারা এক পক্ষ, আর অন্য পক্ষে গরীবেরা, যাঁরা দাঙ্গায় মরে। আমি বলি, দাঙ্গা বাধায় তৃতীয়-পক্ষ—ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট।

জ্ঞান বলেন : তবু হিন্দুরক্ষা সভায় থাকতে বলছ কেন আমাকে?

হিন্দুরক্ষা সভা যখন তুলে দিতে পারছি না, তখন যাতে তা অনিষ্টকারীদের হাতে অন্তত না পড়ে, তাই চাই। আপনি ভার না দিলে বারাহীপুরের ম্যানেজার বাবুরা আর গণেশ বাবু রাজেনবাবু মিলে দাঙ্গায় উৎসাহ দেবেন।

কিন্তু জমিদারদের লোকজনের অভাব নেই। হিন্দুরা কি তাদের সাহায্য না হলে চলতে পারে ?

অবশ্য হৈম বুঝিতেছে, মামলা মক্কেল আছে, ইস্কুল কলেজ পরিচালনা আছে, ব্যাঙ্ক কো-অপারেটিভও আছে। ইহার উপরে কেন আবার জ্ঞান চৌধুরী এই সব হিন্দু মুসলমানের গোলমালের কাজে যান ? হৈম তাহা ভাবিয়াও উদ্বিগ্ন হয়। মুহুরি মশায় বলেন, মুসলমানেরা বলে, 'জ্ঞানবাবু মুসলমানদের শত্রু।' কি ভয়ঙ্কর কথা। শুনিয়া হৈম রাত্রিতে যেন ভালো করিয়া ঘুমাইতেও পারে না। একটু শব্দ হইলেই উঠিয়া বসে। তাহার কান খাড়া হয়, বুক কাঁপিতে থাকে। অশোকের কথা আজ মনে পড়ে না, অরুণের কথাও না—শুধু মনে পড়ে জ্ঞান চৌধুরীর দায়িত্ব, বিপদ। কি গুরুতর উদ্বেগের কথা।

জ্ঞান বুঝিতে পারেন, বলেন ; বড় গুমোট পড়েছে আজ, না ? ঘুম পাচ্ছে না বুঝি ?

হৈম বলে : হুঁ !

ঘুমাইতে না পারিয়া হৈমর মনে পড়ে সরযূর কথা ; আবার মনে পড়ে অমি'র সারা দিনের হৈ হৈ, কথাবার্তা। কলিকাতায় মুসলমানদের হিন্দুরা কিরূপ 'কচুকাটা' করিয়াছে সে গল্প মহোৎসাহে বলিয়া বেড়ায় সে ও সুমন্ত্ররা। ইহারা বুঝিতে চাহে না—এই জায়গায় এই সব গল্প কত অনিষ্টের সৃষ্টি করে। তিরস্কার করে সুমন্ত্রদের বিজয়, অমি'কে বুঝাইয়া বলিতে যায়—ছেলেমানুষ তো।

অমি' মাথা ঝাঁকা দিয়া বলে : আমরাও জানি বোমা পিস্তল কি।

গম্ভীর হয় বিজয় ; শিহরিয়া উঠে হৈম।

প্রথম প্রথম শুনিয়া জ্ঞান চৌধুরী হাসিতেন—পাগলী অমি' কি বলে ? পরে সাদরে শাসন করিতে গেলেন : ছিঃ, এমন কথা ভাবতে আছে ?

কলিকাতায় মুসলমান মরিয়াছে বলিয়া কি উল্লাস করা সাজে? সত্য হইলেও তাহা লজ্জার কথা। ইহা লইয়া বড়াই করা কেন? বিকৃত রুচি কেন হইবে মানুষের?

কিন্তু অগ্নি' কি কিছু শোনে, না, বোঝে?

হৈমবতী কোনো দিকে যেন শান্তি খুঁজিয়া পায় না।

পূজা আসিল। জ্ঞান চৌধুরী এবার পূজায় চিত্রিলাবেও যাইতে পারিলেন না। শহর হইতে তিনি এই সময়ে অনুপস্থিত থাকিলে সকলেই তাঁহাকে ভীরু বলিবেন, কিছু ঘটিলে অপরাধী করিবেন। কিন্তু পূজা নিয়মিত ভাবেই কাটিল—শুধু সবাই একটু বেশি সচকিত ছিল, এইমাত্র। শীত আসিল, শেষ হইল। উত্তেজনা আপনার নিয়মেই কমিতেছিল, কিন্তু ভিক্টোরিয়া স্কুলে সরস্বতীপূজা উপলক্ষ করিয়া তাহা আবার একটু ধোঁয়াইয়া উঠিল। মুসলমান ছাত্রদের আপত্তিতে জিলা ইস্কুলে প্রতিমা পূজা হয় না; কিন্তু ভিক্টোরিয়া স্কুলের মুসলমান ছাত্ররা কি মুসলমান নয়?—স্কুলের ভিতরে তাহারা সহ্য করে সরস্বতী পূজা? তাহাদের আপত্তি সত্ত্বেও পূজা সেখানে হইল। চিরদিন হইয়াছে, এবারই বা হইবে না কেন? সেক্রেটারি জ্ঞান চৌধুরী শান্তভাবে এই ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতে গিয়াও কিন্তু মুসলমান ছাত্রদেব তাহা বুঝাইতে পারিলেন না। ইহাই মনে মনে বুঝিলেন, মুসলমান ছাত্ররা আপত্তি করিলে ভবিষ্যতে স্কুলের বাহিরে অন্যত্রই ছাত্রদের পূজা করা উচিত হইবে। স্কুলে ধর্ম না ঢোকানই এদেশে মঙ্গল।

তথাপি যাহা ধোঁয়াইতেছিল হঠাৎ তাহা একদিন জ্বলিয়া উঠিল একটা সামান্য কারণে। বাজারের বারোয়ারিতলায় যাত্রা-গানের আসরে জন

দুই তিন মুসলমান ছোকরার সঙ্গে হিন্দু ছাত্রদের কথা কাটাকাটি হইতে একটা হাতাহাতি হয়। হঠাৎ তারপর আলো নিভিয়া গেল—সত্যই মারামারি হইল। সম্ভবত হিন্দু যুবকেরা সেদিন প্রস্তুত ছিল—জানিত মুসলমানেরা আসরের গান ভাঙিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। তারপর প্রতিমাও ভগ্ন করিবে। মুসলমানদের নানা আব্দার উপদ্রব তাহারা মুখ বুজিয়া সহিয়াছে। এবার তাহাদের একটু শিক্ষা দিবে, এই উপলক্ষে। শিক্ষা হয়ত দিল—দুই এক জনের মাথা ফাটিল। তাহা গুরুতর কিছুই নয়। কিন্তু তাহার পরে আগুন বুঝি জ্বলে। পরদিন বাজারের সময় উত্তেজনায় কাটিল। দুপুরে বারোয়ারি তলার দেবতার খড়ো ঘর পুড়িয়া গেল। তারপর দুই একটি ছোটখাট দোকান লুঠও হইল। আফিস আদালতের ফেরতা দুই একজন হিন্দু ভদ্রলোক মুসলমানদের হাতে অপদস্থও হইলেন। সেদিন এই পর্যন্ত। কিন্তু হিন্দুদের ক্রোধটা বাড়িতেছিল। বার লাইব্রেরীতে হিন্দু মুসলমান উকিলরাই দুই পক্ষ হইয়া কথা কাটাকাটি হইতে হাতাহাতি করিবার উপক্রম করিলেন। পরদিন জুম্মার নমাজ। নমাজের পরেই মসজিদ্ হইতে বাহির হইয়া একদল মুসলমান প্রথম লুঠ করিল হিন্দুদের মিষ্টান্নের দোকানগুলি। তারপর গোয়ালাদের দুধ ক্ষীর শেষ করিয়া হাঁড়ি ভাঁড় ভাঙিতে লাগিল। অন্য দোকানপাট সেই অবসরে বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। তথাপি লুঠতরাজ থামাইতে গিয়া মাথা ফাটিল বিজয় ঘোষের; তাহাকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিতে হইল। সংবাদ আসিল—লালকুঠির হিন্দু ছেলেদের আখড়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে মুসলমানেরা। জ্ঞান চৌধুরীর বাড়িতে সেই ক্লাব, তিনি তাড়াতাড়ি গৃহে ছুটিলেন। অন্তক্ষণে মারামারি সত্যই আরম্ভ হইত, কিন্তু মুসলমানদের আটকাইয়া রাখিয়াছিল একজন মৌলবী, জ্ঞানেরই পুরাতন

মক্কেল। জ্ঞান দেখিলেন, সমস্ত পাড়া সন্ত্রস্ত। জন-কয় হিন্দু ছাত্র তাঁহারই বাড়ির ভিতরে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা সুমন্ত্রদের আখড়ার ছেলে ঘরের মধ্যে দুইজন ডেগার লইয়া বসিয়া আছে। একজন জ্ঞানের বন্দুকটা হাতে লইয়া হৈমকে টোটার খবর জিজ্ঞাস করিতেছে, সে সুমন্ত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র সুহৃৎ। জ্ঞান বন্দুকটা কাড়িয়া লইল.; ডেগার লুকাইয়া ফেলিল,—পাগলেরা করিতেছে কি? এখনি পুলিশ আসিবে, এবং প্রথমেই ধরিবে ইহাদের।

সত্যই পুলিশ আসিল। স্বয়ং সফৌজ পুলিশ সাহেব দেখা দিলেন। জ্ঞানকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: এ পাড়ায় আখড়া কোনটা? জ্ঞান দেখাইয়া দিল।

সাহেব বলিলেন, ওয়েল, আই এডভাইস্ ইউ টু ক্লোজ ইট্। আপাতত অবশ্য ১৪৪ এর নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছি। শহরেও ১৪৪ ধারা জারি করছি।

ইহার পরে, হিন্দুদের 'শান্তি সৈনিক' ও মুসলমানদের 'খাদেম ফৌজ' মহড়া করিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব 'পীস্ কমিটি' ডাকাইলেন।

মুসলমানেরা তাহাতে বলিল, শান্তি হইবে কিরূপে? জ্ঞানবাবুর মত লোক ছেলেদের লাঠি খেলিতে প্ররোচনা দেন।

'প্ররোচনা'!—জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন,—ও কথাটা তুলে নিতে হবে।

একজন প্রধান মুসলমান উকিল বল্লেন, কিন্তু উৎসাহ দেন। এন্কারেজ করেন তো?

সাহেব রায় দিলেন: লাঠি খেলা বন্ধ করতে হবে।

জ্ঞান চৌধুরী বলিলেন: কেন? তা সাধারণ ব্যায়াম মাত্র।

আমি হতে দোব না। আখড়া বন্ধ করব।

একজন হিন্দু উকিল সাহেবকে বলিলেন: মুসলমানদেরও তো লাঠি খেলার আখড়া আছে।

সাহেব বলিলেন : সে, জিম্‌নেসিয়াম। কিন্তু আপনাদের হিন্দুদের এই আখড়া, ক্লাব, লাইব্রেরী, এ সব 'ব্রিডিং গ্রাউণ্ড অব্‌ এনার্কিজম্‌।'

জ্ঞানশঙ্কর "প্রোটেষ্ট' করিলেন।

সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। একটু পরে বলিলেন, যা'ই হোক আমি আপনাদের থেকে এসব সংবাদ বেশি রাখি। শান্তিরক্ষার জন্ম আপনারাই দায়ী থাকবেন। কিছু ঘটলে আপনাদের তার জন্ম আমরা দায়ী করব।

কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে পরদিনই ব্যবসায়ীদের দুইটা বড় গোলা লুঠ হইল।—কে কি পাইল ঠিক নাই, তবে চাল ডাল আর কেরোসিন তেল নষ্ট হইল। তেলের গুদামের সম্মুখে গোলমালে একজন মুসলমান জখম হইল সাহাদের লোকজনের হাতে। গুজব রটিল সে খুন হইয়াছে—গুর্খা দারোয়ান কুকরি চালাইয়াছে। এবার ঝড় ঘুরিয়া আসিয়া গিয়াছে। একদল বন্দুকধারী পুলিশ শহরের বাজারে টহল দিতে লাগিল। স্পেশ্যাল পুলিশ আসিল। সাতজন হিন্দু ও সাতজন মুসলমানের নামে জামিন মুচলিকার আদেশ হইল। জ্ঞান চৌধুরী তাহার একজন; তাঁহার বন্দুকও কোতয়ালিতে জমা দিতে হইবে।

রাত্রিদিনে জ্ঞান চৌধুরীর চোখে ঘুম নাই, হৈম'র প্রাণ ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে। কেন এই গোলমাল? মুসলমানের সঙ্গে কেহ কলহ করিতে পারে? তাহারা হৃদয়হীন, নৃশংস, তাহারা কি না করিতে পারে? জ্ঞান তাহাকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করেন,—তিনি কলহ করিতে চান না, কলহ তিনি থামাইতেই চান। তাঁহাকে তবু যে মুসলমানরা জড়াইয়া ফেলিতেছে উহাদের এই সব গোলমালে, তাহা নিতান্তই উহাদের ভুল ধারণার বশে। কিন্তু হৈম তাহাতে কি আশ্বাস পাইবে? রাত্রি জাগিয়া হৈম বসিয়া থাকে। চাকরদের পালা করিয়া

বাড় পাহারা দিতে বলে। জ্ঞানকে সাবধানে আপিসে পৌঁছিয়া দিবার ও আপিস হইতে গাড়ীতে আনিবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু হৈম'র স্বস্তি কোথায়? আর জ্ঞান চৌধুরী? চুপ করিয়া রাত্রিতে তিনি নিদ্রাহীন শয্যায় ঘুমাইবার ভান করেন, প্রভাতে হাসিয়া প্রতিবেশীদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন; কাহাকেও উৎকট উগ্রতার জন্য শাসন করেন, 'এ সব ঠিক নয়। বাড়াবাড়ির কি দরকার?' কিন্তু কে বুঝিবে তাঁহার দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তার ভার? কলিকাতা হইতে অশোক অমিতা আসিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু উহারা নাই বলিয়াই তিনি বরং একটু নিশ্চিন্ত।

সুমন্ত্র চলিয়া আসিয়াছিল—বিজয়দা'র মাথা ফাটিয়াছে। দুই একটা মাথা না লইলে ইহার প্রতিশোধ লওয়া হইবে না। সে অশোকদা'র মত 'সাম্য' বোঝে না। আসিবার পূর্বে ঝগড়া করিয়াছে: 'চুলোয় যাক তোমার ধনের বৈষম্য। তোমার বাড়ি লুট হচ্ছে, এর পরে মেয়েদের গায়ে হাত দেবে।' অশোক ধমক দেয়—'বাজে কথা বলিস না—কি হবে আর কি না হবে। কথায় কথায় মেয়েদেব নাম। কেন তোদের মেয়েগুলো কি মোমের পুতুল—গায়ে হাত দিলে গ'লে যায়? তা হলে যাক্ তারা গ'লে।'

কিন্তু সুমন্ত্র শেখর দেবব্রতও শেষ কথা বলিয়া আসিয়াছে,—তোমার সাম্যবাদকেও ডাণ্ডার জোরেই দেশ থেকে তাড়াতে হবে। তোমরা স্বাধীনতার শত্রু। কেন কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলকে গাল দাও বুঝলাম। এস্-আর দাসের টাকায় তোমরা প্রোপাগাণ্ডা করো।'

বড় আশা করিয়া সুমন্ত্র আসিয়াছে—বিজয়দা' আর জ্ঞান চৌধুরী তাহাদের নেতৃত্ব ভার এখন গ্রহণ করিবেন। কিন্তু বিজয় চটিয়া আগুন—হতভাগাদের এইরূপ স্বাধীনতাযুদ্ধের ধারণা—মুসলমানকে ঠাণ্ডা করিবে। আর জ্ঞান চৌধুরীর মুখে শান্তির উপদেশ শুনিয়া তাহারা মর্মাহত।

বলিল: আপনাদের 'বাউণ্ড ডাউন' করেছে। আমাদের বন্দুকগুলি সীজ্ করেছে। আখড়া বন্ধ করেছে।—

জ্ঞান বলিলেন: সে তো আইনের ব্যাপার। মুসলমানরা তা করে নি; করেছে পুলিশ। এর বিরুদ্ধে আইন-সঙ্গত চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানদের সঙ্গে মারামারি করলে হবে কি?

বিজয় তাহাদের জোর করিয়া কলিকাতা ফেরৎ পাঠাইয়া দিল।

আরম্ভ হইল এদিকে মামলা। লুঠ-মারামারি রাহাজানি, পরস্পরের সম্বন্ধে পরস্পরের নালিশ পাল্টা-নালিশ, পুলিশের অতি মন্থর তদন্ত, আর বহুলোকের দিনের পর দিন হয়রানি।

মাস দুই পরে নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন। মুচলিকার হুকুম তিনি নাকচ করিলেন। তিনি দুই পক্ষকে মামলা মিটাইয়া ফেলিতে ডাকিলেন।

অশোক আসিয়াছিল, সেও বিজয়কে এ পরামর্শ দিতেছিল। কিন্তু উত্তেজনা না কমিতে তাহা কেহ শুনিবে না। এখন ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপে সহজেই আপোষ হইল। বিজয়ও হইল অগ্রণী, আর তাহার সহিত হিন্দুদের পক্ষ হইতে জ্ঞান চৌধুরী একমত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলেন, তাই আপত্তি থাকিলেও ম্যানেজার বাবুরা আপত্তি করিলেন না।

হিন্দুরা বলিল: আমাদের যে দোকান লুঠ হল, আমাদের ঠাকুর ঘর অপবিত্র হল, সে সবের কি?

জ্ঞান চৌধুরী বুঝাইতে চাহিলেন: এসব তো মামলা করলে ফিরে আসবে না। তা ছাড়া এক দেশে আমাদের থাকতে হবে। আমাদের নয় ব্যবসাপাট, কিন্তু ওরাই তো তার ক্রেতা। ওরা না হলে আমাদের কোন কাজ চলে না।

আমাদের না হলে ওদের ক'দিন চলে দেখতাম—কার জমি ওরা চাষ করত, কার কাছে দাঁড়ায় কাজের জন্য, ভিক্ষার জন্য—

হিন্দুরাও কেনো কথা শুনিবে না। জ্ঞান চৌধুরী বুঝাইতে পারিলেন না। দেখিলেন বিজয় ছাড়া একটা লোকও নাই যাহার সাধারণ দূরদৃষ্টি আছে। একবার মনে হইয়াছিল, বুঝি অশোক তাঁহার সঙ্গে একমত। কিন্তু একটু পরেই বুঝিলেন অশোক তাহার সেই পুরাতন বাঁধাবুলিই আওড়াইতেছে: দুই পক্ষের বড় লোকেরা গরীবদের উস্‌কাইয়া দিয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছে। মনে মনে জ্ঞান চৌধুরী অপমানিত বোধ করেন;— কাহার স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছেন তিনি জ্ঞান চৌধুরী?—বারাহীপুরের রাজাদের, ম্যানেজারদের? অশোকের মতে শুয়োচকের মুসলমান প্রজা ও হিন্দু প্রজার বিচ্ছেদ বাধাইবার চক্রান্তটা এখানে দাঙ্গা বাধাইয়া পাকা করিয়া ফেলিতেছেন হিন্দুরক্ষা সভার নেতা, বারাহীপুরের ম্যানেজার উকিলেরা—উঁহার রাজাদের স্বার্থে।—এই কি সত্য? লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া যান জ্ঞান চৌধুরী! 'কস্তু হৈম স্বস্তি পাইতেছে। সে সান্ত্বনা দেয়: তুমি তো জানো তুমি ন্যায় কাজ করেছ। তবে আবার কি?—

সত্যই তো তবে আর কি?

শহরে হিন্দুরা জটলা করিতেছে—জামিন মুচলিকার হুকুম হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই জ্ঞান চৌধুরী হিন্দু স্বার্থকে বলি দিয়াছেন। বার লাইব্রেরীতে গণেশ বাবু ও রাজেন সেনের সঙ্গে ইহা লইয়া মণীন্দ্র পরেশের কথা কাটাকাটি হয়! ভদ্রলোকেরাও সকলেই অল্পাধিক হতাশ —হিন্দুর দশাই এই, কেবল 'উদারতা'। তাহাদের সহিত নৃপেনও যোগ দেয়;—শ্বশুর মহাশয়ের প্রজা ঠ্যাঙাইবার অভিজ্ঞতা থাকিলে তাঁহার এইসব দুর্বলতা দেখা যাইত না। কিন্তু নৃপেনের আর দোষ কি? সে নির্বোধ, উগ্র প্রকৃতির। অশোকই তো বলে জ্ঞান স্বার্থ বশে কাজ করে;—তবে সে স্বার্থ জমিদারের, শুধু একা জ্ঞানের নয়।

ঘরে বাইরে জ্ঞান শুধু আঘাত পাইতেছেন। নদীর ভাঙন আসিয়া গিয়াছে তাহার গৃহ-সীমানায়। তিনি আশ্রয় করিবেন?

জমিদার হইলেই কি সে মানুষ নয়?—জ্ঞান বুঝিতে পারেন না। অশোকও বলে, মানুষ সকলেই। কিন্তু মানুষের শত্রুও যে মানুষ,—আর সেই শত্রু জমিদার।

পুরাতন তর্ক আবার জীয়াইয়া উঠে। রমেশ দত্তের আমল হইতে জ্ঞান চৌধুরী জানেন—জমিদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকায় কেমন করিয়া উত্তর ভারতের রায়তদের ব্রিটিশ সরকার সর্বনাশ করিয়াছে;—জমি খোয়াইয়া তাহারা তাই কুলি হইয়া গিয়াছে ফিজি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ট্রিনিডাড। অশোকও তাহাকে বুঝাইতে বসে তিন শত বৎসর আগেই সভ্য দেশে শেষ হইতে থাকে জমিদারীর যুগ, তাহার পর আসে ধনিকের যুগ। ইংরেজ নিজে একা ধনিক থাকিবে বলিয়াই এদেশে জমিদারীর যুগ বজায় রাখিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের পরে সামন্ত ভূমি-সম্পর্ক টিকাইয়া রাখিবার প্রশ্নই ওঠে না।

জ্ঞান বলিলেন, ফরাসী-বিপ্লবের ফলে স্থাপিত হয়েছে মানুষের অধিকার; তাও একটা অর্ধসত্য। ধর্মই হল মানুষের আসল সত্য। তার প্রথম অর্ধ মানুষের কর্তব্য; পরের অর্ধ মানুষের অধিকার। আমাদের সমাজ এই পূর্ণ ধর্ম চায়। ওদের সামন্ততন্ত্র আর আমাদের জমিদারী-প্রথা এক নয়। মানুষের অধিকার আমাদের জমিদারী প্রথায় বাধা পায় কিসে?

বলিয়া জ্ঞান চৌধুরী সকরুণ ভাবে হাসেন। তিনি আইনজ্ঞ; তাই তিনি বলেন, জমিদার মহাজন করবে কি? ষ্টেটাস্ থেকে যখন সমাজে কন্ট্রাক্টে পৌঁছয় তখনই মানুষের অধিকার আয়ত্ত হয়ে যায়।

তা হয় না—সব সময়ে। যেখানে আমরা সমাজের বনিয়াদ বদ্‌লাই না, জমিদার-কৃষকের সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কে ঠিক রাখি, আর

আইনের প্যাঁচে বলি 'কৃষক, তুমি ইচ্ছা করলে জমি ইস্তফা দিতে পার,' সেখানে আসলে কৃষক মানুষের অধিকার পায় না, পায় মৃত মানুষ হবার অধিকার। আর এই গোড়ার ভূমি-সম্পর্ক বদলায় না বলেই সে সমাজে অন্য সব স্তরে, অন্য সব দিকেও মানুষের অধিকার আরও খর্বিত থেকে যায়। কে কার থেকে ক হাত দূরে দাঁড়াবে, কার পাত পড়বে কার পাত বন্ধ হবে, কার জল চলে কার জল চলে না, কাকে কে বিয়ে করতে পারে কাকে কে বিয়ে করলে ধর্ম যায়,—আমাদের এ সব আচার-বিচারে মানুষের কোন্ অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে?

জ্ঞান বলেন, কিন্তু এ তো অমরের যুক্তি—উনবিংশ শতাব্দীর কথা।

ঠিক। কিন্তু এদেশে বিংশ শতাব্দীতেও একথাই মাত্র বলেন অমরদা'। এর বেশি কিছু নয়। তবু তিনিও মনে করেন, মা কাকা মানা করলে বিয়ে করা যায় না। জ্যেঠাই মা মনে করেন—ছোট কর্তা না বুঝে কি অমরের বিবাহপ্রস্তাবে বাধা দিয়েছেন? অতএব অমরদা'র কাজ—ওয়ান্ ষ্টেপ্ ফরওয়ার্ড, টু ষ্টেপস্ ব্যাক। তিনি মরবেন বিদেশে ঘুরে ঘুরে, আর জ্যেঠাইমাও মুখ বুজে থাকবেন। সেই উনবিংশ শতাব্দীর কথা এই বিংশ শতাব্দীতেও, এখনো, ভারতবর্ষে গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি।

কোনো কালে তা ভারতবর্ষে গ্রাহ্য হয়ে উঠ্তে পারবে না।

হবেই। তবে যত দেরী হবে, ততই আমাদের দুর্ভাগ্য। আপনাদের আপত্তিতে অমরদা'ও অসুখী হচ্ছেন; আর জ্যেঠাইমাও এখন তীর্থে গিয়ে তাঁর দুঃখ ভুলতে চাইছেন।

কি কহিল অশোক? ইহাই কি তবে কাদম্বিনীর সেই চিঠির মর্ম? পুত্রের বিজাতীয় কন্যা বিবাহে কি কাদম্বিনীর নিজের আপত্তি তত প্রবল নয়? কাদম্বিনী চিরদিন বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীলা। কিন্তু তিনি

কি পুত্রের স্নেহবশে আর এই গৃহ, এই সংসারের দায়িত্ব হৃদয় দিয়া, বুদ্ধি দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়াই তীর্থবাসের কথা লিখিয়াছিলেন!

হৈম কি ইহার কিছু জানে? না, হৈম জানে না।

আপনার কর্তব্যপথ সম্বন্ধে জ্ঞানশঙ্করের মনে সন্দেহ নাই,—এই তো তাঁহার ধর্ম। কিন্তু কি সমাজে, কি সংসারে কাহাকে তিনি বুঝাইতে পারেন সেই কথা! বাহিরে একমাত্র বিজয় মনোজ তাঁহার সান্ত্বনা—ঘরে বুঝি হৈমবতী;—অশোকও নয়। কাদম্বিনীও কি নয় তবে? কোথায় চলিয়াছে একাল—আকাশে? শূন্যে? অকূল সাগরের জলে?

অমিতা গর্বিত মনে বাড়ি আসিয়াছে। মুসলমানরা তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইবেই তো, মানুষের মত মানুষ তিনি, হিন্দুদের নেতা। লাঠি খেলায় তাহাদের স্কুলে এবার ইন্দি' প্রথম হইয়াছে। সে যদি বাড়ি থাকিত, আর অমিতার হাতে থাকিত একটা বন্দুক, তাহা হইলে দেখিত অমিতা 'নেড়েরা' প্রাণ লইয়া কেমন ফিরিয়া যায়।

হৈম ধমক দিয়া বলেন: রাখো তোমার ফাজলামি। কি বলো কি না বলো ঠিক নেই।

অমিতা গলা দ্বিগুণ চড়াইয়া দেয়। পূর্বেও সে শুনিয়াছিল জ্ঞান-শঙ্কর নাকি সুমন্ত্র দেবব্রতদের 'বাড়াবাড়ি' থামাইয়া দিয়াছিলেন। অমিতা তখন তাহা বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু এখন দেখিল সত্যই তাহার বাবা মুসলমান-নিপাতের জন্য তেমন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যান নাই। চিরদিনকার মতই তেমনি আছেন। কেবল এবার যেন আরও বেশি স্থির, বেশি গম্ভীর। ভয় পাইয়াছেন নাকি? না, শরীর সুস্থ নাই? হৈম বলিল: নানা ভাবনায় ওঁর কি শান্তি আছে?

অমিতা বলে: ভাবনা আবার কিসে?

ভাবনা নয়? এদিকে এই গোলমাল, নানা মামলা ওঁর নামে। ও দিকে—হৈম থামিল। না—না, হৈম নৃপেন-সবষুর কথা প্রাণ থাকিতেও বলিবে না। হৈম তাই বলিল, মুসলমানরা ওঁর উপর ক্ষেপে আছে। এ পাড়া লুঠ করতে আসছিল তারা—

অমিতা মায়ের ভয় দেখিয়া আমোদ পায়। বলিল: তোমরা বুঝি তখন দুর্গা নাম জপ করছিলে সেদিন?

কি করব তা না হলে?

ঘরে বন্দুক ছিল কেন?

তবু জ্ঞান চৌধুরীর মনে অমিতা কোন উত্তেজনা দেখিতে পায় না। হৈম তিরস্কার করে; এক দিকে এই কাণ্ড, আর তোমরা এক-একজন যা হয়েছ! যেমন অশোক, তেমনি অরুণ। আর তেমনি এখন তুমি—আসতে না আসতেই সুমন্ত্রদের সঙ্গে পাড়া মাথায় করে বেড়াচ্ছ।

অমিতা ক্ষেপিয়া গেল: আমি তোমাদের মত ভীরু নই। আমার সঙ্গে আছে ডেগার।

হৈম ধমক দেয়: বাহাদুরি রাখ্। কর্তা শুনে সে দিন দুঃখ করলেন। বল্লেন, 'ভাবলাম কলকাতায় গিয়ে বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে। দেখছি যে-কে সেই।'

সত্যই অমিতাও পিতার আচরণে বিরক্ত হইয়াছে। একটা বীরের মত কথা বাবার মুখে নাই! আবার পদে পদে অমি' ইন্দি' বাহিরে নদীর ভাঙন-কূলে বেড়াইতে গেলে বাধা দেন। অমিতা বুঝিতে পারে না এত ভয় কেন? গুণ্ডাকে ভয়? তবে তো বাঁচাই দায়। এই ভাবে ভয়ে ভয়ে কি মানুষ বাঁচে?

তীব্রস্বরে অমিতা জ্ঞানকে শুনাইয়াই মাকে বলিল: ভয়, ভয়, ভয়—বুড়োদের দশাই এমন। না দেখতে পারেন, চুপ করে থাকলেই হয়।

অমিতা শহরে মুখ দেখাইতে পারে না লজ্জায়।

'বুড়ো'

মুখে হাসি মিলাইয়া যাইতে চায়, তবু জ্ঞানশঙ্কর হাসিতেছিলেন। ভয়, ভয়, ভয় : 'বুড়োদের দশাই এমন'। কথাগুলি তাঁহার কানে গিয়াছে, কানে না যাইবার মত করিয়া বলিতে জানে না অমি', বলিতে সে চাহেও নাই।

বিজয় আসিয়াছিল। জ্ঞানশঙ্কর তাহাকেই বলিলেন,—বাহিরে ঝড়েব মত হাওয়া বহিতেছে; বৃষ্টির ছাট আসিতেছে, নদীর ভাঙন ও গর্জন শোনা যায়।—জ্ঞান বলিলেন: তোমাকে বোঝান শক্ত। অথচ তুমি বল্‌বে—আমি ঠিকই করেছি। আমিও তা জানি। কিন্তু তবু তেমন জোর আর পাই না নিজের ভিতরে। মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের ভাই-ভাই ভাব থাকবে,—বলেছি তো, কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করে? সেদিন হিন্দুদের সভা হল—সংবাদটা পর্যন্ত আমাকে পাঠাল না কেউ;—'হিন্দুরক্ষা সভা'র এখন 'হিন্দুসভা' নাম হবে। অমিতাও বলে, নেড়েদের আবার বিশ্বাস? আর ভাবে বুড়োদের দশাই এমন, ভয়েই তারা মরল। না, অমি'কে দোষ দোব কি? সে ছেলেমানুষ। বড়দের মধ্যেই আর সেই স্থিরতা নেই, দৃঢ়তা নেই, শৃঙ্খলা-বোধ নেই। আত্মবিস্মৃতি চারিদিকে।—The homely beauty of the good old cause is gone.—সেই দত্ত সাহেবের কথা। অমি' তো ছেলেমানুষ। হিন্দু ঘরের মেয়ে, স্বভাবতই ওদের অন্তর কোমল, প্রকৃতি নিরীহ। শিক্ষা দীক্ষায় আমরা হিন্দুরা সত্যই শান্তিপ্রিয়। তবু ছাখো, এই অমি'র মত, ছোট ছোট মেয়েদের মনেও আজ কী তীব্র বিদ্বেষ মুসলমানের বিরুদ্ধে। সমস্ত সমাজে এ বিষ ছড়িয়ে পড়ছে।

আপোষ রফা নিষ্পত্তি করবে কি করে? করলেই বা তা টি*ঁকবে কত দিন? বলো, এ ভ্রাতৃ-বিদ্বেষের অবসান কোথায়?

আসলে এই হতাশা, এই জিজ্ঞাসা বিজয়েরই নিজের। সে কংগ্রেসের প্রধান কর্মী; তাহাকে না বিশ্বাস করে হিন্দুরা, না মুসলমানরা। সমস্ত কংগ্রেস আজ মুসলমানের সন্দেহের বস্তু। গান্ধীজীকে তাহারা মনে করে মুসলমানের শত্রু;—হিন্দুর রামরাজ্য টিকি, গীতা, গো-পূজা প্রভৃতি বলবৎ করিবার চক্রান্তই কংগ্রেসের মারফৎ তিনি করিতেছেন। —তাই নীরবে চিন্তাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বিজয় বসিয়া রহিল।

জ্ঞানশঙ্করও ভাবিতে লাগিলেন—'মিল' হয়ত হইবে,—সে গোঁজামিল; মিলন নয়। গান্ধী আলিভ্রাতাদের 'মিল' যেমন রাজনৈতিক প্রয়োজনে হইয়াছে, তেমনি একটা 'মিল' হইতে পারে। কিংবা আরও পরে—হয়ত যেমন অশোকেরা বলে—তাহাদের রক্তস্নানের পরে 'মিল' হইবে সকলকে একাকার করিয়া। তখন আর হিন্দুও নাই, মুসলমানও নাই, তাই 'মিলনের' আর প্রশ্নও আসলে নাই। যে মিলন জ্ঞান চাহেন,—দুই জনার সত্যকারের ধর্মবোধ ও শ্রদ্ধার উপরে, একই দেশের একই জাতির মানুষ হিসাবে স্বাজাত্যবোধের বন্ধনে যে মিলন গড়িয়া উঠা প্রয়োজন—তাহা বুঝি আর কোনো কালেই সম্ভব হইবে না। সেই ধর্মবোধ আর মানুষের মনে নাই, সমাজেও নাই। সেই শ্রদ্ধা আজ নিজের উপরও আমাদের নাই, পরের উপরও নাই। আর জাতীয়তা? আগামী যুগের মানুষদের চিত্ত যে এখনি বাল্য হইতে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। এ দেশের ভবিষ্যতে তবে সেই শান্তি, সেই সৌহার্দ্য ফিরিয়া আসিবে কি করিয়া?

বিজয়ও ভাবিয়া পায় না, কি হইবে তবে? এক দেশে পাশাপাশি থাকিয়া পরস্পরের শত্রু থাকিবে কি করিয়া হিন্দু মুসলমান?

জ্ঞান চৌধুরীও বুঝাইতে পারেন না বিজয়কে। তিনি বুঝিতেছেন —দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি থাকিবে, রেশারেশি করিবে, মাঝে মাঝে খুনাখুনি করিবে, বিদেশী মধ্যপক্ষ এক একবার নিজেদের স্বার্থে তাহাদের ছাড়াইয়া দিবে, আবার লাগাইয়া দিবে। বিষক্ষয়ে কিছুদিন নিস্তেজ থাকিয়া আবার দুইপক্ষ করিবে রেশারেশি, মারামারি, খুনাখুনি।—এমনি করিয়াই হয়ত দিন কাটিবে, ইহাই হয়ত এই জাতির ভবিষ্যৎ।

বিজয় বিশ্বাস করিল না, তারপর হাসিয়া বলিল: দূর! কত দিন আর তা হবে?

ম্লান হাস্যে জ্ঞান বলেন: বিশ বৎসর, ত্রিশ বৎসর। 'থার্টি ইয়ার্স ওয়ার';—না আরও বেশি? দেখ্ছো মুলতান, শাহরাণপুর, কানপুর, কোহাট আর কলকাতা। আর আমি তো যতদূর তাকাই দেখি—এই রেশারেশি মারামারি আর মধ্যপক্ষের মধ্যস্থতার আত্ম-সমর্পণ!

বিজয় চমকিয়া উঠিল!—না, না, তার চেয়ে যেন আমরা পরস্পরকে শেষ করে ফেলি। তাও ভালো, তাও সম্মানের।

জ্ঞান বলিলেন, কিন্তু তাও আমরা করব না। তাই বলি—আমার কথা আর শুনো না, বিজয়। বুড়ো হয়েছি আমি—বুড়োদের দশাই এমন।

বুড়ো,—হাসিয়া ফেলিল বিজয়।—আপনি বুড়ো?

হাঁ, বিজয়। শোনোনি অমি'র কথা? সাতান্নর দিকে চলেছি—অনেক আগেই তো বনে যাবার কথা।

কেন যাবেন বনে, শুনি?

আমাদের দিন নেই বলে। আমরা সেই যুগের মানুষ—অমর যাদের বলে 'ভিক্টোরিয়ান্।' ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা, সেই লিবারল্ এডুকেশান্ আমাদের দেহ মন গঠন করেছে। মতের স্বাধীনতা,

জাতীয়তায় বিশ্বাস, মানুষের নৈতিক বুদ্ধিতে আস্থা,—এসব তাই আমাদের চিন্তার মূলসূত্র হয়ে গিয়েছে। রামমোহন থেকে বঙ্কিম ভূদেব বিবেকানন্দ অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের মুখে আমরা এই ভারতীয় ধর্মের ও এ ধরণের ব্যাখ্যাই লাভ করেছি; বুঝেছি—এই আমাদের ভারতবর্ষীয়তা, আমাদের জাতির ইথোস্, আমাদের সাধনা। গত এক শ বছর এই শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মন এই ভাবে গড়ে উঠেছিল—ইংরেজের অধীনে। ভিক্টোরিয়ার রাজকালে এই নূতন আলোকে হিন্দুর জীবনাদর্শ, তার জীবন-শিল্প, ভেঙে না গিয়ে বরং নতুন হয়ে উঠেছিল। আমরা প্রাণে-মনে সেই 'লিবারল'—তোমরা যাদের বলো 'মডারেট্'। আসলে তোমাদের গান্ধীজীও তাই—অমর যাদের বলে 'পার্সোনস্ উইদাউট্ পার্সোনালিটি'; অশোক যাদের বলে 'বুর্জোয়া' ও 'পাতি বুর্জোয়া' আর অমি'রা যাদের দেখছে 'বুড়ো'। তোমরা চাও অভিযান, আমরা চাই সাধনা। তোমাদের সব চেয়ে বড় ভয় শৃঙ্খল, আমাদের সব চেয়ে বড় ভয় বিশৃঙ্খলা। চিন্তায় কাজে, কল্পনায়, আবেগে যে এনার্কি এখন আত্মপ্রকাশ করছে, তাই নাকি এই শতাব্দীর স্রোত। আমরা গত শতাব্দীর ভাঙন-ধরা কূলে বসে আছি—আমাদের কালের ভিত্তিই বুঝি ধ্বসে পড়ছে।

ঝড়ের বেগে বায়ু বহিতেছিল। পিছনের দিকে প্রমত্ত নদীর তরঙ্গাভিঘাতে মাটি চিড় খাইয়া নদীগর্ভে পড়িতেছে। জ্ঞান চৌধুরী শুনিলেন বলিলেন: শুন্‌ছ তো? এবার ভাঙনের পালা। সত্যই বনে যাবার দিন আমাদের। বুড়োদের এমনি দশা!

এ কি হতাশা জ্ঞান চৌধুরীর মুখে? বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল: অমি' পাগলী কোথায়? তাকে দেখ্‌ছি একবার—

বিজয় কক্ষান্তরে চলিল।

বেচারী হৈম! জ্ঞানকে সে জানিতেও দিতে চাহে নাই—কি অশান্তি তাহার মনে। বাহিরে এত বিপদ বিরোধ, আর গৃহ মধ্যেই বা শান্তি কোথায়? অথচ জ্ঞান চৌধুরীর বিন্দুমাত্র উদ্বেগ অস্বস্তিও কি হৈমর নিকট হইতে গোপন করিবার উপায় আছে? অসম্ভব। হৈম'র চক্ষু সব ধরিয়া ফেলে;—ফাঁকি দিবার উপায় নাই। সে ধরিয়া ফেলিয়াছে জ্ঞানের এই আয়াস-সাধ্য আত্মসংযম, অন্তরের ক্ষত স্থান হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বাহিরের কর্তব্যকে নত শিরে গ্রহণ করিবার প্রয়াস। সবই জানে হৈম, কিন্তু মুখ ফুটিয়া হৈম তাহার আভাস তথাপি দেয় না। মনে হইবে সে বুঝি কিছুই জানে না, ভালোমানুষ, অর্থাৎ বোকা!

জ্ঞানও একদিন কি এইরূপ ভুল করিতেন না যখন হৈম ছিল বধূ? তাহার চোখে তখনো শান্ত দৃষ্টি, মুখে স্বল্প কথা; কোথাও কোনো চপল দৃষ্টির রেখাটি ছিল না। সেদিন জ্ঞানও মনে করিতেন—হৈম বুঝি কিছুই বোঝে না। আজও সে হৈম তেমনি আছে, তাহার স্থূলদেহ, কোমল প্রসন্ন মুখ, শান্ত সরল দৃষ্টি,—কোথাও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার আভাস আছে কি? কিন্তু জ্ঞানশঙ্করের মত মানুষকে আর কোনো মানুষ বুঝিতে পারিত কি? নির্বাক সেবা ও সহস্র প্রয়াসের মধ্য দিয়া হৈম জ্ঞান চৌধুরীর মনকে স্নিগ্ধ সুস্থ করিতে চাহিয়াছে। আহারে, শয়নে, বিশ্রামে এই কয় মাস কোথাও সে একবিন্দু ত্রুটি ঘটিতে দেয় নাই। অথচ জ্ঞান চৌধুরীও তাহা লক্ষণীয় বলিয়া মনে করেন নাই—হৈম তো চিরদিনই এইরূপ; তাঁহাকে এইরূপে সহজেই সে বুঝিয়া লয়। কিন্তু তিনি তো চিরদিন হৈম'র পরিচিত ছিলেন না। সেই অপরিচিত জ্ঞান চৌধুরীকে চিরদিনের পরিচিত করিয়া লইবার মত হৈম'র গভীর গোপন অনায়াস সাধনার কথাটা জ্ঞান চৌধুরীর কোনদিন মনেও পড়ে নাই। কী সে সাধনা! অথচ বুদ্ধিতে হৈম কাদম্বিনীর তো কথাই নাই; অনেকের নিকটই পরাস্ত হয়।

চতুর তাহাকে বলা চলে না। কাদম্বিনীর মত ভাব-সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বও তাহার নয়। সংসারের প্রতিদিনকার কাজ-কর্মে সেও কাদম্বিনীর মত রাগ করিয়াছে, বিরক্ত হইয়াছে, দুঃখ পাইয়াছে। বৃহৎ সংসারে নিজের পাওনা সেও কোনো দিন পায় নাই। কিন্তু কাদম্বিনীর মত পাইবার আকাঙ্ক্ষাও কি সে বিসর্জন দিয়াছিল? হাঁ, সেই ক্ষতি হৈম মানিয়াই লইয়াছে—জ্ঞান চৌধুরী তাহার একার নয়, সে চৌধুরীদের ছোটবাবু,—সংসারের, সমাজের, আরও দশজনেরও। অথচ হৈম'র জ্ঞান চৌধুরী ছাড়াও আর কিছু নাই।—না, সে চৌধুরী বাড়িকেও কাদম্বিনীর মত তেমন আপনার করিতে পারে নাই। সে আপনার স্বামী পুত্রকন্যা ছাড়াইয়া তেমন বড় করিয়া কিছুই ভাবিতে পারে নাই, বড় ভাবে চাহে নাই। অথচ এই সমাজ সংসারের বিধানও সে মানিয়া লইয়াছে।—সে যদি অধীর হইত,—অবুঝ হইত সরযুর মত, অসহিষ্ণু হইত তাহার অমিতার মত,—তাহা হইলে জ্ঞানশঙ্করের সংসার এতদিনে কোথায় বিলীন হইয়া যাইত। মায়ের এই ধৈর্য হয়ত কমলা পাইবে কিন্তু অমি' পায় নাই,—এ কালের মেয়েরা এই ধৈর্যের মূল্য আর বুঝিতে পারিবে না।

আর ছেলেদের জীবন? তাহাতো আজ আবর্ত-মথিত।

অমর ভাবে, সমাজে ব্যক্তিসত্তা বুঝি আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই মুক্তি লাভ করে; আত্মপ্রসারই বুঝি আত্মার প্রসার,—আত্মদানে নয়। তবু তো অশোকের মত অমর আত্ম-ভ্রষ্ট নয়। একালের দ্বন্দ্ব সংশয়ে অমর আন্দোলিত, কিন্তু সে উন্মূলিত হয় নাই। এই অশান্ত শতাব্দীর স্রোত অমরদের সময়েও এমন আবর্ত্ত সৃষ্টি করে নাই। অমর, বিজয়, মনোজ ইহারা তাই স্রোত—মুখে ভাসিয়া যায় নাই, কুল কিনারার হিসাব তাহাদের ছিল। কিন্তু সেই হিসাবও বুঝি আর থাকিবে না। অমরের কথা আর ভাবিবেন না জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী। ভাবিবেন না

অরুণের কথাও ; সে পাশ করিবে কি না করিবে ভাবিয়া লাভ কি? ভাবিয়া লাভ কি আর অশোকের কথা ? সে-ই তো এই বিশৃঙ্খল কালের বড় এক নিশানা !—স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাওয়া নৌকা।

'বুড়ো'—

না, আর্শী দেখিবার প্রয়োজন নাই। চোখের একান্ত চেনা বলিয়াই জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী দেখিয়াও দেখেন নাই—দেখিতে চাহেন না বলিয়াই দেখেন নাই—বয়সের নিশানা কত সুস্পষ্ট। মাথার চুল কবেই পাকিতে শুরু করিয়াছিল—সে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে। আজ আর কাঁচাই বিশেষ নাই। শ্মশ্রুগুম্ফও একদিন ক্ষৌর কার্যের অভাব ঘটিলেই শ্বেত নিশান তুলিয়া দাঁড়ায়। চোখেও তাঁহার সেই উজ্জ্বল্য নাই, তেমন করিয়া হাসি ফোটে না আর সমস্ত মুখমণ্ডলে,—চোখ ও কপালে, ওষ্ঠে ও অধরে। গাল কি থুবড়াইয়া পড়িতেছে না আরও ? সেই গৌর বর্ণ তো তামাটে ম্লান হইয়া গিয়াছে। দেহ শ্লথ হইয়া আসিয়াছে, শরীর বড় শ্রান্ত, বড় অবসন্ন। শান্তি চায়, বিশ্রাম চায় তাহার দেহ। কোথায় পাইবেন তিনি বিশ্রাম ? অশোক, অরুণ, অমর—আবর্ত-মথিত সেই যুবকেরা, কে দিবে তাহাকে বিশ্রাম ?

জ্ঞান চৌধুরী একবার সস্নেহে তাকাইল টেবিলের উপরকার কাগজের দিকে—অমরের প্রেরিত তাহার প্রথম গ্রন্থের প্রুফ। পার্সোনালিটি ইন্ সোশ্যাল ট্রানজিশান—ইহাই অমরের থীসিস। হয়ত ইহারাই তাঁহাকে তথাপি বুঝিতে পারে—মনোজ, বিজয় আর এই অমর।—ব্যক্তি সত্তায় তাহারা বিশ্বাসী, উনবিংশ শতাব্দীর সেই মানুষের অধিকারে বিশ্বাসী। বিংশ শতাব্দীর অশোকের মত বলিবে না—মানুষের অধিকারেরও আসলে অর্থ নাই, 'সর্বহারার একাধিপত্যই' হইল সর্বোত্তম ব্যবস্থা। হয়ত অমরই জ্ঞানের নিকটতর—তাঁহার আত্মজ ; অশোক নয়, অরুণ নয়। কিন্তু

জ্ঞানশঙ্করই কি বুঝিয়াছেন অমরকে? বুঝিয়াছেন তাহার সত্তার সেই সত্যকে? এই হিন্দু-মুসলমান বিরোধে তবু বিজয়কে বুঝিলেন,— 'স্বরাজের' নামে পাগল যে বিজয়।—

বিজয় গেল কোথায়?—জ্ঞানের কানে গেল প্রশ্ন।

জ্ঞানশঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন হৈম।

হৈম হাসিয়া বলিল: কি আঁৎকে উঠ্‌লে যে! বাঘ নাকি?

রীতিমত ম্যান-ইটার।

হাসিয়া চা হাতে লইয়া বিজয়কে হৈম খুঁজিতেছে। জ্ঞানের জন্ম চা দিয়া সে আবার গৃহকর্মে চলিল।

এই হৈম···জ্ঞানশঙ্কর আবার চোখ তুলিয়া দেখিলেন— সে অমর নয়, সে মনোজ নয়,—সে বিজয়ও নয়।—হৈম এ যুগকে চিনে না, কোনো যুগকে সে চিনে না।—তবুও সে বুঝি চিরযুগের। কারণ, সে মানুষকে চিনে। না, না; অত বড় কিছুও হৈম চিনে না। সে চিনে জ্ঞানকে, চিনে আপন সংসারকে, আর চিনে না আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে। প্রাণ দিয়া সে চিনে—আর তাই সে চেনা অক্ষয়, অপরিমেয়। একমাত্র হৈম জানে জ্ঞান চৌধুরী কি সহিয়াছেন। আর সে-ই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নীরবে সহিয়াছে তাঁহার সেই বেদনা অস্বস্তি। এই অনুভূত সত্য, এই গভীর উপলব্ধিই বুঝি জ্ঞানকেও সমস্ত সহিতে শক্তি দান করিয়াছে। না হইলে সাধ্য কি জ্ঞান চৌধুরীর আজ এই বার্ধক্যের তীরে দাঁড়াইয়াও এখনো ভাঙিয়া পড়েন নাই পৃথিবীর এই বিচারে—তিনি 'বুড়ো' তিনি ভয়ার্ত; অমিতারও নিকটে তিনি বাতিল।

রাত্রির জোয়ার আসিতেছে বুঝি। বাতাস বাড়িয়া উঠিতেছে। নদীর জলে একটা ক্ষুব্ধ গর্জন শোনা যায়।—দুর্দমনীয় আঘাতে এখনি

তীর চূর্ণ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিবে জোয়ার—এক একটা তরঙ্গ তীরের উপর আছড়াইয়া পড়িবে ভৈরব গর্জনে। এক একবার মাটি আর্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িবে নদীর পায়। মহাকালীর পায়ে পৃথিবী গুঁড়াইয়া যাইতেছে।

জ্ঞান চৌধুরী চোখ বুজিয়া শুনিতেছেন। খোলা বই পড়িয়া আছে শয্যা পার্শ্বে; আজ আর পড়িবেন না। পড়িবেন না সেক্‌স্‌পীয়র। টাইম্ ইজ্ আউট্ অব জয়েন্ট। টাইম ইজ্ আউট্ অব জয়েণ্ট। আর হৃতশক্তি তাঁহারা, কি করিয়া বোধ করিবেন এই প্লাবন? কে বুঝিবে তাঁহাদের কথা?—কে বুঝিবে এই 'বুড়োদের'! কে জানিবে শতাব্দীর ওপারের স্বচ্ছবহা সেই নদী তীরের স্বপ্নভরা-চক্ষু শিশু জ্ঞানশঙ্করকে? জানিবে সেই রামায়ণ মহাভারতের শৌর্য-বীর্য গাথায় উদ্‌বুদ্ধ গ্রাম্য বালককে? বুঝিবে—বারাণসীর ঘাটে সেই পলকহীন এক কিশোরের বিচিত্র ভারত-চিত্তের সঙ্গে রহস্যময় পরিচয়ে? দেখিবে—বঙ্কিম মধুসূদনের জগতের মধ্য দিয়া তাহার জাগরণ সেক্‌স্‌পীয়রের বিরাট বিশ্বলোকে? তাঁহার যৌবনের নবজন্ম এক কিশোরী বালিকার দুইটি ভীরু লজ্জা-কুণ্ঠিত চক্ষের আলোকে? তাঁহার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এই বিংশ শতকের প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া অগ্নিময়, ঐশ্বর্যময়, সম্ভবনাময় 'স্বদেশী যুগের' স্বর্ণপ্রভাতে?...দেশের সেই মহত্তম দিনের মহত্তম কর্মের সাক্ষী তাঁহারা—'বুড়োরা'—তাঁহারাই সেই স্বাক্ষর। 'বুড়ো'...কে বুঝিবে এই স্বাক্ষর?

World, world, world !
But that thy strange mutations make us hate thee,
Life would not yield to age.

হৈম বলিল, অমি'র হল কি? বিকালে চা খায়নি। রাত্রিতেও না খেয়ে শুয়ে পড়ছে। আমি কিছু বলতে গেলে উল্টো ক্ষেপে ওঠে। বিজয়কে কি বলেছ তুমি? যাও ছাখো গে, নইলে তোমার আদরের কন্যার অভিমান ভাঙবে না।

জ্ঞান চৌধুরী লজ্জিত হইলেন। তাই তো, কেহ তাঁহাকে বুঝিবে না? অথচ বিজয়ও কেমন করিয়া জানিয়া ফেলিয়াছে অমি'র কথায় জ্ঞান চৌধুরী আঘাত পাইয়াছেন। কেন? 'বুড়ো' বলিয়াছে বলিয়া? আর সেই অমি'—বিজয়ের তিরস্কারে এখন বুঝি এই পাগলামি আরম্ভ করিয়াছে। কী অভিমানিনী ছেলেমানুষ আর পাগলী এই তাঁহার অমিতা! জ্ঞান কি তাহা জানিতেন না যে, অমি'র কথায়ও দুঃখ পাইয়াছিলেন আর সে দুঃখ বিজয়কে পর্যন্ত না বলিয়া পারেন নাই? ছিঃ, ছিঃ, কি হইয়াছে তাঁহার?

জ্ঞান চৌধুরী অমিতার হাত ধরিয়া সাধ্যসাধনা করিতেই অমিতা কাঁদিয়া ফেলিল।—তোমাকে কি বলেছি আমি, তুমি বিজয়দার কাছে নালিশ করতে গেলে?

বাঃ! তুমি আমাকে কি বল্‌বে আবার? আর, আমি যাব বিজয়ের কাছে নালিশ করতে—তোমার কথার জন্য? কি বলো তুমি?

কিন্তু অমিতা শুনিবে না, মানিবে না। তাহার অভিমান প্রচণ্ড। জ্ঞান চৌধুরীরই কি সাধ্য আছে সে অভিমান তিনি না ভাঙিয়া পারেন? আর সত্যই, অমিতা কতক্ষণ অভিমান পোষণ করিবে তাহার বাবার

সম্মুখে? জ্ঞান তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, নিজের পাশে বসাইয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। তারপর নিজের ঘরে নিজের বিছানায় তাহাকে পার্শ্বে লইয়া বসিলেন। হৈম সকৌতুকে দেখিল, কত ভাবে জ্ঞানও অমিতাকে সাধ্য-সাধনা করিতেছেন,—পড়িয়া শোনাক অমিতা তাঁহাকে কিছু, এই তো বই ধরিয়াছে সম্মুখে। হউক সেক্‌স্‌পীয়ার, তাহাতে কি? পড়ে নাকি অমিতাও 'মার্চেন্ট অব ভেনিস্'? ক্লাশে পড়ায়—ল্যাম্বস্ টেল্‌স্ ফ্রম্ সেক্‌স্‌পীয়র! বেশ তো, আনুক দেখি অমিতা সেই বই। পড়িয়া শোনাক জ্ঞানকে। কিন্তু বই আনিবার জন্য তখন তখনি ব্যস্ত হইল না অমি'। গল্প বলিতে লাগিল মার্চেন্ট অব্ ভেনিসের। তারপর কখন পিতার শয্যা পার্শ্বেই ঘুমাইয়া পড়িল।

জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী লজ্জিত হইলেন। সত্যই তিনি বুড়া হইয়াছেন; না হইলে এই অমি'কে তিনি চিনিতে পারেন না? কেমন তখন অদ্ভুত শোনাইয়াছিল কথাটা—'বুড়ো।' লোকে তাহাকে প্রবীণ বলে কিছুকাল হইতে, তাহা শুনিতে মন্দ লাগে নাই। সেই কথাটার মধ্যে যেন একটা শ্রদ্ধা নিহিত আছে। প্রবীণ: জীবন যে বেশি দেখিয়াছে, জীবনের নিকট হইতে যে বেশি শিখিয়াছে, পৃথিবীরও তাই তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার মত প্রয়োজন আছে, তাঁহার নিকট শিক্ষার্থী পৃথিবী; বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট প্রার্থী। কিন্তু 'বুড়ো',—না, কথাটার মধ্যে শ্রদ্ধা খুঁজিয়া পান না জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী। খানিকটা দেখিয়াছিলেন অবজ্ঞা, খানিকটা কৃপা। শুধু তাহাই নয়, দেখিয়াছিলেন—তাঁহার সমস্ত জীবনের প্রতি তাঁহারই পুত্র-কন্যার অনাস্থা। কিন্তু এত ভাবিবার কি ছিল ওই কথাটায়?

আসলে হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধ ও তাহায় আপোষ-রক্ষার

ঝামেলায় জ্ঞান চৌধুরী বড় বেশি মনে-মনে ক্লিষ্ট হইয়াছেন, সংসারেরও নানা দিকে, নানা পীড়া অনুভব করিতেছেন ; তাই ঐ সাধারণ কথাটাতেই অত লাগিয়াছিল। না হইলে অমি'র কথায় ও দুঃখ পান? আর অমি' তো মিথ্যাও কহে নাই : 'প্রবীণ' আর 'বুড়ো'তে তফাৎ কি? সরল অকপট অমিতা সাদা কথাটাই বলিয়াছে তাহার বাবাকে : বাবাকেও সত্য কথা বলিবে না? ছেলেমানুষ, ক্ষ্যাপা মেয়ে সে ; কিন্তু সে স্নেহের মর্যাদা বোঝে, জানে আদরের দাম,—এই তো মেয়েগুলির স্বভাব। ছেলেরা সেদিকে অচেতন—তাহারা বাহিরের পৃথিবী লইয়াই মত্ত, দিশাহারা,—শুধু অশোক, অরুণ কেন, অমরই বা কি? বিজয়ই বা কি? কিই বা মনোজ? কিংবা স্বয়ং তিনি জ্ঞান চৌধুরী?—যিনি এখনো 'স্বদেশীর' আর 'স্বাজাত্যের' নামে এত মাতিয়া উঠেন? অথচ তাঁহারই গৃহমধ্যে হৈম, কাদম্বিনী, কমলা, অমিতা ও সরযূ—হাঁ সরযূও,—আর ইন্দিরা,—ততদিনে—কেহ তাহারা স্কুলে পড়ে, ক্ষ্যাপামি করে, অবুঝপনা করে ; আর কেহ বা একান্ত মনে গৃহ রচনা করে, ঠাকুর দেবতার সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দেয় ;—কিন্তু যাহাই যে করুক্, একই স্নেহময়ী নারী-প্রকৃতি আপন-জনকে আপনার করিয়া লইয়া সংসারকে কল্যাণে ঘিরিয়া রাখে। এই তো তাঁহার কত জাগ্রত রাত্রির সাক্ষী এই শয্যা, অমিতা যখন উহার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তখন মনে হইয়াছিল এমন শান্তির নীড় বুঝি আর কোথাও নাই।

অমিতা সকাল বেলা জ্ঞান চৌধুরীর নিকট বই লইয়া আসিয়া বসিল। —এই তো তাহার পাঠ্য বই—'শোনো বাবা।'

কিন্তু জ্ঞান চৌধুরী যেন অসুস্থ বোধ করিতেছিলেন। কাল রাত্রিতে কেমন শীত শীত ঠেকিতেছিল। অমিতাই গায়ে হাত দিয়া বলিল : গা গরম যে, বাবা।

হয়ত ম্যালেরিয়া। তাপ আরও একটু বাড়িল। কিন্তু কুইনাইনে বিশেষ কাজ দিল না, বরং মাথায় একটু গোলমাল বাধাইল। আরও গোলমাল বাধাইল অমি'। হৈমকে সে শুশ্রূষা হইতে বাতিল করিয়া দিল—হৈম জানে কি রোগীর সেবার? জানালা দুয়ার খুলিয়া না দিলে হাওয়া চলাচল করিবে কি করিয়া ঘরে? রোগীর ঘরে হাওয়া চলাচল না করিলে হয়? হাওয়া লাগিলেই মানুষের নিউমোনিয়া হয় এই ডাক্তারি তথ্য হৈমকে কে শিখাইয়াছে? থার্মোমিটার যখন দেখিতে জানে না হৈম,—চোখে ভালো দেখে না?—বেশ তবে এই যন্ত্রটা লইয়া হৈম'র নাড়াচাড়া করা কেন? অমি'ই তো আছে।

জ্বরটা ছিল মাত্র তিন দিন। কিন্তু তবু অমি'র তাহাতে সুবিধা হইল। যে অমি' সারাদিন খেলিয়া বেড়াইয়া সন্ধ্যা হইলেই ঘুমাইয়া পড়ে, যাহাকে এখনো হৈম'র রাত্রিতে ডাকিয়া তুলিয়া খাওয়াইতে হয়, সে জ্ঞানের শয্যাপার্শ্ব ছাড়িবে না, রাত্রি জাগিয়া নার্স করিবে। নার্সিং কি ছেলেরা জানে? দেখুক সুমন্ত্ররা অমিতাকে। নার্সিংএর হৈমই বা জানিবে কি? দেখুক সে অমিতাকে। মাথায় বরফের ব্যাগ চাপাইতে হৈম জানে না, দেখুক অমিতাকে। অবশ্য জ্বর প্রথম দিন মাঝ রাত্রেই কমিতে লাগিল, হৈম'রও উদ্বেগের অবসান হইল। কিন্তু অমি'র এবারকার কাণ্ডে তবু সে অবাক হইয়াছে। অমি' এক ঠাঁই বসিয়া সারাদিন কাটাইতে পারে—রাত্রিতে ঘুমায় না?

জ্বর কমিলেও নার্সিং কমিল না। অমি ঠিক করে—জ্ঞান চৌধুরীর এবার চেঞ্জে যাওয়া দরকার। জ্ঞান হাসিতে থাকেন—সত্যই তো, বড় বড় লোকেরা চেঞ্জে যায়। অমি'র বাবা চেঞ্জে না গেলে অমি'র চলে?

তবু দুর্বল বোধ করিতেছেন জ্ঞান চৌধুরী, তাহাতে ভুল নাই। এবার আর ভুলিতে পারিবেন না,—বয়স হইয়াছে। অমি' 'বুড়ো' বলিলে

মনে লাগে, কিন্তু তাই বলিয়া বার্ধক্যকে অস্বীকার করিবেন কিরূপে? নিজেকেও বুঝাইতে এখন আর মনে ক্ষোভ জাগিল না—তিনি যে সাতান্ন বৎসর উত্তীর্ণ হইতেছেন। পঞ্চাশেই তো 'প্রবীণ' হইয়াছিলেন, এখন ষাটের দিকে আসিয়া গিয়াছেন; বুড়ো নয় তো কি তবে জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী? চুল প্রায় সব পাকিয়াছে; দাঁত প্রায় সবই পড়-পড়, চশমার তেজ সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতেছে। মুখমণ্ডল এখনো নিষ্প্রভ নয়; রক্তের চাপ বেশি বলিয়া বুঝি তাহা বেশিই রক্তাভ দেখায়; মাংসল দেহের পেশী শিথিল হইতেছে—অবশ্য তবু তিনি টান হইয়া বসেন, টান হইয়া দাঁড়ান, সুদৃঢ় পদে চলেন—ইহা তাঁহাদের কালের মানুষের অভ্যাস—আজকালকার ছেলেদের মত ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবেন না। তবু বয়সকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাঁহার কালের মানুষেরা অনেকেই তো ইতিপূর্বে প্রস্থান করিয়াছেন,—কবে চলিয়া গিয়াছেন রেবতী, বিনোদ। তাঁহারই বা সে শক্তি কোথায় আজ? বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে—আয়ু খরচ করিয়া তিনিও লাভ করিতেছেন অভিজ্ঞতা, তাই তো এখন পাইতেছেন এই নাম 'বুড়ো'—

Grow old along with me!
The best is yet to be,
The last of life, for which the first was made.

হাঁ, The best is yet to be: আর Then welcome each rebuff.

আসুক না আঘাত। আর সত্যই কতটুকু সেই আঘাত জ্ঞানের জীবনে? এমনিই বা কি নূতন তাহা এই দেশের যুগ-যুগান্ত-স্থায়ী প্রবহমান ইতিহাসে?

হৈম নিষেধ করিলে কি শোনেন জ্ঞান চৌধুরী! হাসিয়া বই হইতে মুখ তুলিয়া বলেন: পড়তে না পারলে তো পড়বই না।

হৈমও হাসে। আবার মনে মনে বুঝে—বই, বই, বই। চির-জীবনই ইহাদের বই।

কিন্তু এবার জ্ঞান চৌধুরী পরাজিত হইলেন।—হৈম'র কাছে নয়, অমি'র কাছে। হৈম'র তাহা সাধ্য হইত কি? জ্ঞান চৌধুরী পড়িতে পাইবেন না, তাঁহাকে শুনিতে হইবে; পড়িয়া শুনাইবে অমি'।

প্রথম থেকেই আরম্ভ করব কি?—বই লইয়া বসে অমিতা।

বেশ তো, মন্দ কি?—সকৌতুকে বলেন জ্ঞান।

শায়লক দি জু লিব্‌ড্‌ এ্যাট্‌ ভেনিস্—

কিন্তু ভেনিস্ কোথায় জানো অমি'?

অমিতা জানে না বুঝি? কিন্তু তবু নূতন কথাও সে অনেক শুনিল। এই ভেনিস্ যে এমন জলপুরী তাহা কি জানিত অমিতা? অনেকটা চিত্রিসারের মত—কিন্তু উহা শহর; বড় বন্দর। তেমন ঝোপ-জঙ্গল নাই!

...বাঁশ বন ছাইয়া আছে চিত্রিসারের গ্রাম, বেত বন খালের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—এখন নতুন জল আসিয়াছে সেই খালে, কল কল করিতেছে জল। নতুন জলের সেই প্রথম ধ্বনি কী আনন্দলোকের বার্তা বহিয়া আনে গ্রামের মানুষের নিকট; যেন দূর দূরান্তরের ডাক আসে গ্রামের কানে। নৌক ভাসিবে এবার, ইহার পরই আসিবে বর্ষা, আর নাগপঞ্চমী, মনসার ভাসান গান আর বাইচ খেলা—

অমিতা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে বুঝি। কি পড়িতেছে সে?

না, না, ঠিক হল না, অমি'—জ্ঞানশঙ্কর বাধা দিয়া বলিলেন, মূল লেখা না শুনলে ঠিক বুঝবে না।

অমিতা মুখ তুলিয়া বলিল।

I hold the world but as the world, Gratiano,

A stage where everyman must play a part,

And mine a sad one.

কিন্তু কেন 'sad, অমি'? মন খারাপ কেন এণ্টোনিওর? ভালোবাসা নয়; জাহাজের খবরের জন্য নয়; তবে কেন? অকারণে?— কেমন উৎসাহ পাইতেছেন জ্ঞান চৌধুরী। অমিতাও হাসিয়া বলিল: অকারণে মানুষ মন খারাপ করে না কি?

করে না?—মজা পাইতেছেন জ্ঞানশঙ্কর;—অকারণে মানুষ হাসে কেন তবে? পাগলী অমিতাও মন খারাপ করে—অকারণে। আসলে অকারণে নয়,—কারণ না জেনে। তবে এখানে অদূর ভবিষ্যতের ঘটনার আভাস—নাটকের মূল সুরটি—সেকস্‌পীয়র ধরিয়ে দিলেন গোড়াতেই; এই তাঁর নিয়ম। কি সেই সুর? বিষাদের? তবে কি এ নাটক বিয়োগান্ত? তা তো নয়। কিন্তু এ নাটক কি মিলনান্ত? তাও কি বলা যায়? তবে এণ্টোনিওর এ বিষাদ কেন?

অমি' হাসিয়া বলে—সে আমরা কি করে জান্‌ব?

ঠিক, ঠিক। এ তর্কে আমাদের দরকার কি? তুমি বরং পড়ো— আমি শুনছি।

অমিতা আবার পড়িতে থাকে। আর জ্ঞান চৌধুরীর আবার মনে পড়ে:

Her name is Portia; nothing undervalued

To Cato's daughter, Brutus' Portia....

হার নেম্ ইজ অমিতা, নাথিং আণ্ডারভেল্যুড্...সত্যই তাই। কোনো পোর্সিয়ার অপেক্ষা সে খাটো নয়, কোনো ক্যাটো-কন্যার অপেক্ষা কম সৌভাগ্যবতী হইবে না।...

অমিতা পড়িতেছে। আনত মুখের উপর, খোলা চুলের উপর সকাল বেলার মেঘ-ভাঙা সূর্যালোক আসিয়া পড়িয়াছে। নির্মল-সুন্দর, স্বচ্ছ মুখ।—কে না মানিবে!

And she is fair, and fairer than the word,

Of wondrous virtues.

অব্ ওয়াণ্ড্রাস্ ভারচুজ্—তাহাই তো আসল কথা। হৈমকে দেখিয়া তাহা বুঝিয়াছেন জ্ঞান চৌধুরী। বুঝিয়াছেন দিনের পর দিন আপনার জীবন-যাত্রার মধ্যে।—আর আরও বুঝিবেন সেই সত্য অমিতাকে দেখিয়া—তাঁহার কন্যা-বধূদের দেখিয়া।…এই বয়সে অশোক ল্যাম্বস্ টেল্‌স্ পড়িবার সময়ে মূল সেক্‌স্‌পীয়র খুঁজিয়া লইত—এত ছিল তাহার ঔৎসুক্য। অমিতার তত আগ্রহ নাই—না, সে ক্ষ্যাপা, সে পাগ্‌লী,—কিন্তু সে 'অব্ ওয়াণ্ড্রাস্ ভারচুজ্।'

না, একবার থামো, অমিতা। সে বইটা আন্‌তে পারবে? এক খণ্ডের সেক্‌স্‌পীয়র খানা নয়। ছোট অক্ষর পড়তে পারব না এখন। পাঁচ খণ্ডে যে সেক্‌স্‌পীয়র খানা আছে—ও ঘরের আলমরায়—আনবে?

অমিতা লাফাইয়া উঠিল—এখখুনি'—

দ্যাখো, কি রকম পাগলের মত ছুটছে।—হৈম সকৌতুক উৎকণ্ঠায় দেখিয়া বলিল,– পিছল উঠান। বিষ্টির পরে সবে রোদ উঠ্‌ছে।

পাগল! পাগল! জ্ঞান চৌধুরীও মনে মনে বলিতে লাগিলেন! তাই, অব্ ওয়াণ্ড্রাস্ ভারচুজ্। লোকে বলিবে—অমিতা পাগল। লোকে সেই আশ্চর্য গুণ দেখিবে কোথা হইতে? কাহার এমন দৃষ্টি আছে? চোখ থাকা চাই—চোখ থাকিলেই বা কে বুঝিবে অমি'কে? হৈম'কে, কমলাকে?—তাহারা হয়ত অমি'র বাহিরের রূপ দেখিবে। হয়ত চাহিবে টাকা, বিষয়-বিত্ত। হয়ত বা বড় জোর অমরের মত খুঁজিবে—

বিন্তা আর সামাজিক পালিশ। সবই দেখিবে, অথচ দেখিবে না মূলবস্তু—'অব্ ওয়াণ্ড্রাস্ ভারচুজ্।'

অমিতা বই লইয়া আসিয়াছে। জ্ঞান চৌধুরী পড়িতে লাগিলেন।

ইংরেজ, ফরাসী, স্কচ, জার্মান—সকলের চরিত্র চিত্রণ:—ছাখো মজা সেক্‌স্‌পীয়রের। চমৎকার! চমৎকার!—

বাবা বুঝাইয়া দেন, অমিতা হাসিতে ভরিয়া উঠে—এত কৌতুক ছিল যে সেক্‌স্‌পীয়রে তাহা কে জানিত! বাবা এমন করিয়া না পড়িলে, না বুঝাইয়া দিলে সে ইহার সন্ধানও পাইত না। কিন্তু পড়িতে দমে কুলায় না যে বাবার। অসুস্থ শরীর, তাঁহার পক্ষে আর পড়া ঠিক কি?

তুমি থামো বাবা, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

এই দৃশ্যটা—এখনি শেষ হবে।

If I live to be as old as Sibylla, I will die as old as Diana unless I be obtained by the manner of my father's will.

সর্ব কালের সর্বদেশের কন্যারাই বুঝি এক রকম। পিতৃসত্য তাহারাই বুঝি পালন করিতে জানে। পুত্রেরা তাহা ভুলিয়া যায়, তাহারা নিজ নিজ সত্যকেই বড় করিয়া চিনে। অমর বলিবে না, হয়ত অশোকও বলিবে না;—কিন্তু ইহা বলিবে অমিতা ইন্দিরা—'আন্‌লেস্ আই বি অব্‌টেন্‌ড বাই দি ম্যানার অব্ মাই ফাদারস্ উইল।'

ভৃত্য জানাইল—মনোজ আসিয়াছে। অমি'র উঠিতে হইবে। জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন, তা হলে পড়ো তো এবার তোমার বই—ল্যাম্বস্ টেল্‌স্। মনোজ পড়া বলে দেবে তখন।

থাক্, কাল হবে।—মাষ্টারদের পড়ানো অমিতার ভালো লাগে না।

সে পালাইতে চায়। বলিল,—কিন্তু মনোজদা'র সঙ্গে আবার এখন গল্প তর্ক শুরু করে দিয়ো না। না, একটি কথাও বলতে পারবে না।

জ্ঞান হাসিয়া বলিলেন : একটি কথাও না?

না, একটি'ও না।—চলিতে চলিতে হাসিয়া আঙুল তুলিয়া চোখ বাঁকাইয়া শাসনের স্বরে কহিল অমিতা।

হাসি পায় জ্ঞান চৌধুরীর। কি কর্তৃত্ব না আজ কয় দিন যাবৎ তাঁহার উপরে খাটাইতেছে অমি'! পাগলী মেয়ে, কোনো কথা কি শুনিবে? সে বলিলে ঔষধ খাইতে হইবে। সে 'না' বলিলে আব স্নান করা চলিবে না। আরাম-কেদারায় বসিতে হইলে সে তাহাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া বসাইবে।—এমনি তাহার কাণ্ড। আসলে বাবার কাজ করিতে করিতে নিজেকে সে বড় কর্মী বলিয়া মনে করে, গর্বিতা হয়, নিজের কর্মপটুতায় রীতিমত তাই গম্ভীর হয় তাহার চঞ্চল মুখশ্রী। যেন সে কত বড় কাজ করিতেছে। অমিতার সেই গাম্ভীর্য কৌতুকাবহ। হৈম আপত্তি করে—চাদর লইয়া আবার কি করিতেছে অমি'? কিন্তু অমি উত্তর দেয় না। এই সব সামান্য কথায় সে কর্ণপাত করিবে কেন? সে এখন কাজ করিতেছে, কাজের লোক সে। কথা কাটাকাটি সে করিবে কেন? কিন্তু একা একা কি বিছানার চাদর পাতাই যায়?

একবার ধরতে পার না একটা দিক?—অমিতা হৈমকে বলে।

চাদর ধরতেও আবার আর একজন লোক দরকার হয় নাকি?—হৈম বলে।—চাদর তো আমরা একাই পাতি।

সত্যই অমি' জ্ঞানশঙ্করকে পাইয়া বসিয়াছে। যেন সে না হইলে আর জ্ঞানের চলিবে না। অমি'র এই আচরণ অবশ্য নূতন। কিন্তু জ্ঞানশঙ্কর জানেন, ইহার উৎস তো চিরদিনই ছিল ওইখানে—অমি'র ক্ষুদ্র

হৃদয়ের মধ্যে; এবং তাহারও পিছনে হৈম'র স্বচ্ছন্দ সহজ গৃহধর্মের মধ্যে।

জ্ঞান চৌধুরীর মন একটি মৃদু আনন্দে দোলা খাইতে লাগিল। কমলা নাই, শ্বশুর বাড়িতে সে তাহার স্বামী ও সংসার লইয়া তন্ময় থাকে। অমিতারও বিবাহ হইলে তাহাই হইত; পিতার নিকট হইতে সে-ও দূরে চলিয়া যাইত। একদিন সেও যাইবে—কিন্তু এখনো দেরী আছে। আজও সে অমিতা বাবার কাছাকাছি আছে বলিয়াই না জ্ঞান চৌধুরী তবু কথা বলিতে পারেন—একজন পড়িবার সঙ্গী পর্য্যন্ত পাইলেম। তাঁহার এমন সঙ্গী কমলাও হইতে পাবে নাই। সে জ্ঞানের নিকট বসিয়া পড়িতে পায় নাই সেক্‌স্‌পীয়রের গল্প। তাই তখন জ্ঞান চৌধুরীও পান নাই এই আনন্দের আভাস।

আজ জ্ঞান চৌধুবী বলিতে পারেন,—একটু কিছু পড়ে শোনাও তো, অমি'!

আর দুই দশ পংক্তি পড়িতে না পড়িতেই আবার জ্ঞান চৌধুরী উঠিয়া বসিবেন!—দাঁড়াও, দাঁড়াও সেই মুলের লাইনগুলি: Hath not a Jew eyes?...মুখস্থ তাঁহার সেই সব লাইন—অমি' বিস্মিত হয়। এই সব লাইন মুখস্থ থাকিবে না?...ক্লাশের এই কোণে গিয়া দাঁড়াইতেন অধ্যাপক হেন্‌স্‌লি। প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া তিনি হইয়াছেন আণ্টোনিও। লাফাইয়া নামিয়া এবার হইলেন শায়লক—Hath not a Jew eyes? প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার সেই অধ্যাপনা—অভিনয় করিয়া সেদিনে ক্লাশে সেক্‌স্‌পীয়ার অধ্যাপনা চলিত। তাহা না হইলে সেক্‌স্‌পীয়র বুঝা যায় নাকি? ম্যাক্‌বেথ হাতে লইয়া গিয়া তাঁহারা বিলাতী থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে বসিয়াছিলেন; পংক্তি মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিবেন।

তোমরা না থিয়েটারে যেতে না?—অমি' জিজ্ঞাসা করে।

এ বিলিতী থিয়েটর ; সেক্স্‌পীয়রের অভিনয়।

ওঃ,—বলিয়া অমিতা চুপ করিল।

জ্ঞান চৌধুরী গল্প করিয়া চলেন। কিন্তু হঠাৎ অমি বলিল : যদি দেখতে বাবা চার্লির 'কীড'! চমৎকার!

একবার নির্বাক হন জ্ঞান। তারপর মনে পড়ে—ওঃ, বায়স্কোপ। সেক্স্‌পীয়র আর চার্লি না কে? কি পাগল অমিতা!

অমিতা বলে : আমার কিন্তু ডগলাস ফেয়ারব্যাংক্‌সকে বেশি ভালো লাগে। থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'ও।

অমিতা কি জানিত উহাও একটা বইএর নাম? জ্ঞান বলিলেন : পড়ে ছাখো ডুমা। কিন্তু তাহা পড়িয়া আর কি হইবে, যখন সিনেমাতেই দেখা যায়? অত পড়িতে অমিতার ভালোও লাগে না।

কখন অমিতা উঠিয়া যায়। অভ্যাস বশে বইয়ের পাতা উল্টাইয়া চলেন জ্ঞান চৌধুরী। চোখে পড়ে চেনা পংক্তি—আর তাহা ছাড়িতে পারেন না! যেন কত দিনের পরিচিত বন্ধুর মুখ—যেন সেই দূরাগত দীপরেখা—

How far the little candle throws his beams!

So shines a good deed in a nauhgty world.

এমনি দীপ-রেখা সেক্স্‌পীয়রের বাণী,—অমিতার মমতা—এই হৈম'র সংসারে।

কে বলিল তবে এ পৃথিবী 'নটি'?—জটিল হইতে পারে, কুটিল হইবে কেন?

হৈম বলিল : নতুনদি'র পত্র এসেছে বাড়ি থেকে, ছাখো।

অমি' কলিকাতা যাইবার পূর্বে বইটা তুলিয়া রাখিয়া যায় নাই—পাগলীর কাণ্ডই এই রকম। সেই অবধি বইটা ওখানেই রহিয়া গিয়াছে।

জ্ঞানশঙ্কর বইটা তুলিয়া রাখিতে গিয়া পাতা উল্টাইতেছিলেন। আবার চোখে ঠেকিতেছিল সেই অপূর্ব কথা। আর আবার দেখিতে দেখিতে তাহাতে ডুবিয়া যাইতেছিলেন :

Look, how the floor of heaven
Is thick inlaid with patines of bright gold...

মহাশূন্যের তরঙ্গে তরঙ্গে মহাসঙ্গীত মন্দ্রিত। আর,

Such harmony is in immortal souls.
But while this muddy vesture of decay
Doth grossly close it in, we cannot hear it···

জ্ঞানশঙ্কর বই বন্ধ করিয়া হৈমকে বলিল : কই? দেখি চিঠি।

কাদম্বিনী হৈমবতীকে লিখিয়াছেন : "পূজা আসিতেছে। বর্ষায় এখানেও এবার নদী ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। পালেদের গোয়াল ঘর সেদিন হঠাৎ নদীতে পড়িয়া গিয়াছে ; একটা গরু আর পাওয়া গেল না। কুমোরেরা উঠিয়া গিয়াছে নীলখোলার পশ্চিমে"—

আশঙ্কার কথা এবার চিত্রসারের চৌধুরী বাড়ির পক্ষেও।—জ্ঞানশঙ্কর বুঝেন :

"নীলমাধবের মন্দিরে এবারও জল পড়িয়াছে। পুঁথিপত্র ভিজে নাই। মন্দির ও পূজামণ্ডপ পূজার পূর্বেই মেরামত করা প্রয়োজন। কিন্তু মেরামত করিবার মত মিস্ত্রি মজুর এবার কিরূপে পাইব, বুঝিতেছি না। ফৈজুমিস্ত্রিরা এখন শহরে গিয়াছে। তাহার উপর এখানে দেবালয়ে তাহারা কাজ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। মৌলবীরা তাহাদের এই সব কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছে। মিঞাবাড়িতে যে মক্তব আছে তাহার মৌলবী মধুখালি অঞ্চলের। সেখান হইতে একটা হিন্দু মেয়েকে নাকি সে নিকা করিয়া আনিয়াছে।..."

হয়ত সেই মেনকাসুন্দরী। কিংবা অন্য কেহ হইবে। কারণ, হিন্দু সমাজের এই পাপ তো এক আধটুকু নয়।

"হিন্দুরা তাহাতেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। মামুদমিঞা বাড়িতে নাই। তাঁহার ছেলেরা কোনো কথা কানে শুনিবে না। এই গোলমালে সেনেদের বাজার বয়কট করিয়া মিঞারা নিজেদের বাড়ির হাতায় নূতন বাজার বসাইয়াছে। সেনেদের ও পালেদের সঙ্গে মিঞাদের এই জন্য বিষম রেষারেষি বাধিয়াছে। মিঞাদের বাজার এখনো জমে নাই। সেই মৌলবীর প্ররোচনায় সেখানে অখাদ্যও বিক্রয় হয়। মুসলমান জেলেরা সেখানে বসে। কিন্তু হিন্দু জেলেরা পুরানো বাজারে ফিরিয়া আসিয়াছে। অশোক তাহাদের দুই দলের এই ঝগড়া মিটাইতে আসিয়াছিল। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু মিঞারাও এই জন্য আমাদের উপর বিরক্ত হইয়াছেন। সেনেরাও আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন। তাই, মুসলমান মজুর রাজমিস্ত্রি আমাদের বাড়ির কাজে এখন পাওয়া সহজ নয়।"

অশোক আবার চিত্রিসারে গোলমাল পাকাইতে গিয়াছে?—চিত্রিসারের চৌধুরী বংশের নাম, শান্তি স্বস্তি কিছুই সে কোথাও অক্ষুণ্ণ থাকিতে দিবে না।

"অশোকের সহিত ইন্দুমতীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। কলিকাতার এক বিধবা শিক্ষালয়ে সে পড়িবে শুনিবে, সম্মত হইয়াছে। অমর অনেকদিন যাবৎ এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিল—ইন্দু স্বাবলম্বী হইতে যত্ন করুক। তাহার নির্দেশ মতই অশোক কলিকাতায় ইন্দুমতীর সেইরূপ শিক্ষালাভের ব্যবস্থাও করিয়াছে।

ইন্দুমতীর এতদিন তাহাতে উৎসাহ ছিল না। তাহার ইচ্ছা ছিল হয় সে কোনো তীর্থে বা বিধবাশ্রমে পূজা আরাধনা, ধর্মকর্ম লইয়া

থাকে। আর না হয় চিত্রিসারে আমার নিকটেই বাস করে। কিন্তু তীর্থে বা বিধবাশ্রমে না জানিয়া না শুনিয়া তাহার বয়সের বিধবাকে আমি পাঠাই কি করিয়া? আমি অবশ্য নিজের মেয়ের মতই তাহার ভার লইয়াছি। কিন্তু চিত্রিসারের এই গৃহ ইন্দুর পক্ষে নিতান্ত আশ্রয় মাত্র, তাহার নিজ গৃহ নয়, উহার উপর কোনো দাবী তাহার নাই। সে এখানে চির'দিন থাকিবে কোন্ অধিকারে?"...

'অধিকার'...'দাবী'...সেই অমরের যুক্তি কাদম্বিনীকেও শেষে পাইয়া বসিয়াছে? অথচ সত্যই তো,—জ্ঞানশঙ্কর জানেন—বাস্তব অবস্থা ইহাই; ইন্দুমতীর দিক হইতে দেখিলে এই যুক্তির সত্যতা তাঁহাকে মানিতেই হইত। সত্যই তো, কাদম্বিনীর অবর্তমানে ইন্দুমতী এই চৌধুরী পরিবারে কি মর্য্যাদা লাভ করিবে? মর্য্যাদা থাকুক, পাইত কি অন্নবস্ত্র—সুরেশ্বর অতুলের নিকট? কিংবা—

কাদম্বিনী লিখিয়াছেন, "অমর তাহার শিক্ষাব্যয় বহন করিবে। অবশ্য বাড়িতে আর আমার কেহ সাহায্য করিবার রহিল না। উপায় কি? এই গৃহে আর ইন্দুমতীকে কি করিয়া রাখি? কিন্তু আপন বলিতে তাহার কেই বা আছে? কিই বা থাকিবে? কি লইয়া বাঁচিবে ইন্দু?"

কঠিন নির্মম প্রশ্ন। হৈমবতী কেন, জ্ঞানশঙ্করও ইহার উত্তর জানেন না।

"তুমি বুঝিবে—ঘর-দুয়ার, সংসার-স্বজন,—পুরুষের সাহায্য ছাড়া স্ত্রীলোকের চলে না। তাই ভাবিয়াছিলাম,—কমলার নিকট মনোজের অনেক কথা শুনিয়াছিলাম,—মনোজ কি আর সংসার করিবে না? কমলা আমাকে মোটেই ভরসা দিল না। তথাপি, একবার ইন্দুর নিকট কথাটার আভাস দিয়াছিলাম। সে তাহা বুঝিয়া মর্মাহত হয়; প্রায় গলায় দড়ি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। অবশ্য, আমি তাহাকে বলি নাই—'

একটা অন্ধকার গহ্বরের সম্মুখে গিয়া পড়িতেছেন কি জ্ঞানশঙ্কর?

"অমর বাগ্‌দত্ত, সে যদি সম্মত হইত তাহা হইলে আমি অন্তত ইন্দুমতীকে পুত্রবধূ করিতে চেষ্টা করিতে পারিতাম। কিন্তু অমরের নিকট সেইরূপ প্রস্তাব তুলিয়া কি লাভ? আমাদেরই মান-সম্ভ্রমের দায়ে সে নিজেকে অসুখী করিয়াছে; এখন আর অন্য কথা কেন? ধর্মাধর্ম সে বোঝে না,—আমিই বা কি বুঝি তাহার? তবু আমারই কর্মদোষে ইন্দুমতীকেও মর্মান্তিক জ্বালায় জ্বলিতে হইতেছে। শুভাশুভ, ন্যায়ান্যায়, ধর্মাধর্ম—কি তবে পালন করিতে পারিয়াছি আমি?"…

অন্ধকার গহ্বরটা দেখিতে পাইতেছেন জ্ঞানশঙ্কর। কিন্তু সে যে অতলস্পর্শী। শুধু আর অমর নয়, অশোক নয়, ধর্মাধর্মের বোধ আজ আর কাদম্বিনীরও সুস্থির নাই? অথচ ধর্মের প্রদীপ-রেখা নাকি পৃথিবীর এই কুটিল অন্ধকার ভেদ করিয়া বহুদূর পর্যন্ত যায়—

How far the little candle throws its beams!…

কাদম্বিনী সেই গৃহদীপের প্রশান্ত শিখাটির মতই এই দূরান্তরে জ্ঞানশঙ্করের নিকট এতদিন শুভ্র আশ্বাসের রূপে জ্বলিতেছিলেন।

পত্র কখন শেষ হইয়াছে। কাদম্বিনী লিখিয়াছেন—পূজায় এবার সকলের আসা চাই;—চৌধুরীদের ভদ্রাসন যে না হইলে কেমন ম্রিয়মান হইয়া থাকে। জ্ঞানশঙ্কর ভাবিতেছিলেন—কিন্তু সেই শান্তস্নিগ্ধ গৃহতলের একান্ত গৃহদীপটিও কি এবার তৈলহীন হইয়া আসিতেছে?

হৈমর সমস্ত প্রতিরোধ ভাঙিয়া অবশেষে সেই কঠিন আঘাত আসিয়া পড়িল জ্ঞান চৌধুরীর বক্ষে। সরযূ আর পারে নাই, সে বিষ খাইয়া বসিয়াছে। কিছুই তাই জ্ঞান চৌধুরীর নিকট গোপন রাখা চলিল না।

এত সাধের স্বপ্ন তাঁহার—তাঁহার সংসার তাঁহার পরিবার, তাঁহার

সমাজ,—কত আশাভঙ্গই তাঁহার ঘটিতেছে এই সম্পর্কে প্রতিদিন। কিন্তু সমস্ত আশাভঙ্গের মধ্যেও জ্ঞানশঙ্কর অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এমন আঘাত আর পান নাই। কতবার নিরাশা মনে জাগিয়াছে,—কি করিল অশোক, কি করিল অমর? অরুণের আচরণে অপমান বোধও করিয়াছেন। কিন্তু তখনো জানিতেন—তাঁহার জীবনের আঙিনায় কদর্যতা জমিতে পারিবে না, তাঁহার পরিবার পরিবেশে একটা সহজ নির্মলতাই সঞ্চারিত হয়। সেই সুস্থ জীবনযাত্রা ও জীবনাদর্শের সুগভীর আস্থাই তাঁহাকে সমস্ত নিরাশায় সুস্থির রাখিয়াছে, আপন আস্থায় গর্বিত চিত্তে চলিবার প্রেরণা দিয়াছে—সংসারে তাঁহার অভাব ও ব্যর্থতা ফুটিলেও কোথাও এই চৌধুরী সংসারে কদর্যতা নাই, ক্লেদ নাই তাঁহার পরিবেশের কোনো কোণেও—এমনি একটা বিশ্বাস তাঁহার মনে স্থির হইয়া জাগিতেছিল। আজ সেই আস্থা, সেই গর্ব্ব যেন চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল।

নৃপেনের জন্য পূর্বেও জ্ঞান চৌধুরীকে মাথা হেঁট করিতে হইয়াছে; না হইলে নৃপেনের এই চাকরিটি হইত না, তাহার জামিনও জুটিত না। কিন্তু উপায় কি? সে যে তাঁহার সরযূর বর, তাঁহার বড় আদরের 'দাদাভাইদের' বাবা,—আর বাবুর হাটের গাঙুলী বংশের ছেলে। কিন্তু সেই নৃপেন—সেই বংশের ছেলে হইয়া একটা খ্রীষ্টান ধাত্রী মেয়েকে লইয়া এমন কেলেঙ্কারী বাধাইল? হৈম কেন তাঁহাকে এই কথা পূর্বে বলে নাই, সরযূ কেন আগে জানায় নাই? বিজয়ইবা এত দিন তাহা গোপন রাখিয়াছে কেন? ব্যাহত স্থির চিত্তে জ্ঞান শঙ্কর সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন—সরযূকে বাঁচাইতে হইবে, কথাটা সকলের নিকট গোপন রাখিতে হইবে, পুলিশের হাঙ্গামার পথও বন্ধ করিতে হইবে। তারপর বারাহীপুরের কাজ হইতে নৃপেনকে বিদায় দিয়া পাঠাইতে হইবে ঢাকায়—অমরের মাতুল রজনীকে বলিলে সে নৃপেন্‌কে তাহার ব্যবসায়ে গ্রহণ করিবে।

সব যথানিয়মে নির্বাহ করিয়া গেলেন জ্ঞানশঙ্কর।

কিন্তু নৃপেন জানাইল—সে ঢাকা যাইবে না।

অগ্নিগর্ভ পর্বতের মত জ্ঞানশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন :—কেন?

নৃপেন ভয় পাইল, শ্বশুরের এই মূর্তি সে দেখে নাই। ইতস্তত করিয়া বলিল : আমি বিজ্‌নেস্‌ জানি না। এখানকার চাকরিটা তাই ছাড়া ঠিক হবে না।

আরও গম্ভীর আরও কঠিন স্বরে জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন : বেশ, রাজারা যাতে তোমাকে ছাড়িয়ে দেন, সে ব্যবস্থাই করতে হবে।

নৃপেন হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর সেই চোখ দেখিয়া মাথা নীচু করিল। পালাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই জ্ঞানশঙ্কর বলিলেন : যাও, সেখানে আমার বাড়িতেই থাকবে। আর, সাত দিনের মধ্যেই এখান থেকে যেতে হবে।

নৃপেন চলিয়া গেল। কিন্তু জ্ঞানশঙ্করের অন্তর-মধ্যে অগ্নিরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর সম্মুখে জ্ঞানশঙ্কর যেন আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না। কাদম্বিনীকেও বুঝি জ্ঞানশঙ্কর আজ মুখ তুলিয়া বলিতে পারিবেন না—ধর্ম নিজেই নিজের প্রমাণ। কি করিয়া তাহা বলিবেন? সে আত্মপ্রত্যয় কি ইহার পরেও অক্ষুণ্ণ আছে জ্ঞানশঙ্করের। আজ যদি অমর আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায়—অশোকের মত পরিষ্কার কণ্ঠে সে-ও যদি জিজ্ঞাসা করে—মানুষের ধর্মকে যাহারা দলিত অপমানিত করে তাহাদের কি জ্ঞানশঙ্কর অস্বীকার করিতে পারিয়াছেন? তাহা যদি না পারিয়া থাকেন তাহা হইলে যে অমর আপন কর্তব্য পালনের দ্বারা সংসারে আপনার অধিকার দৃঢ়ভাবে অর্জন করিয়াছে জ্ঞান চৌধুরী আজ কোন সত্যবলে তাহাকে সঙ্কুচিত ব্যাহত করিতেছেন?

মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল।

বিধাতা, বিধাতা কেন তুমি জ্ঞানশঙ্করকে এমন করিয়া পরীক্ষা করিতেছ? যে সামাজিক পারিবারিক শুচিতা ও সংযমকে জ্ঞানশঙ্কর ধর্ম বলিয়া জানিয়াছেন তাহা কি শুধুই কতকগুলি সংস্কার? এই বহু শতাব্দীর আবিষ্কৃত জীবন-চর্যা, ইহা কি শুধুই কতকগুলি প্রথা-নিয়ম? এত নিষ্প্রাণ, এত মিথ্যা? My God, My God, why hast thou forsaken me?

সে রাত্রিতে জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী প্রথম 'ষ্ট্রোক্'টার ধাক্কা সামলাইয়া উঠিলেন।

১৫

শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই—তবে ব্লাড প্রেসারটা নামিয়াছে। কোনো উদ্বেগ উত্তেজনা আর মনে স্থান দিবেন না জ্ঞানশঙ্কর। আশ্বিনের নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে—তাঁহারই গৃহের পার্শ্বে এখন সে নদী। তাঁহার প্রবাসের এই বহুপরিচিত মাটি নদীগর্ভে ধ্বসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু জ্ঞানশঙ্কর বিচলিত হইতেছেন না। সকাল বেলায় এক অচেনা বাউল গানটা গাহিয়া গিয়াছে, তাহার পর হইতে জ্ঞানশঙ্কর যেন কেমন আপনার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আছেন—বড় মিষ্ট বড় স্নিগ্ধ আশ্বিনের এই প্রভাত বেলাটি।

পরান আমার সোতের দীয়া।
(আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে)
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার
আন্ধার নিশুইত ঢালা,—
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে
লহরের মালা গো।
…কোথায় সেই 'দরিয়ার সাগর অকূলের কূল, সথা?'

হৈমবতী মানস করিয়াছিলেন—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবেন, সাত পুকুরের জগদীশ বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরকে চাই। বহু যত্নে জ্ঞানশঙ্কর তাঁহাকে আনাইয়াছেন—সমস্ত ক্রিয়াকর্ম যথানিয়মে সুনির্বাহিত হইয়াছে। বৃদ্ধ বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর হৈমকে বলিয়াছেন, 'মা, আমার দিন শেষ হচ্ছে। আর যে আসতে পারব, তা ভাবি না। কাজ থাকলে এবারই চুকিয়ে নাও।'

হৈমবতী কথাটা বুঝিল, বলিল: আমাকে দীক্ষা দিয়ে যান তবে।

হৈম জ্ঞানশঙ্করকে আসিয়া বলিল—সে দীক্ষা গ্রহণ করিতে চায়।

জ্ঞানশঙ্কর আপত্তি দেখিলেন না।

প্রসিদ্ধ সাধক বংশ সাতপুকুরের ঠাকুরেরা। বিদ্যালঙ্কারও সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। অন্তত ইহাতে ভুল নাই—তিনি উঁচু দরের মানুষ। তাঁহার আচরণে তান্ত্রিক সিদ্ধার উৎকটতা নাই, কোনরূপ অসামাজিকতা নাই। নিজে সদাচারী, নিয়ম-পরায়ণ, আহারে, আচারে বিচারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাত্ত্বিক নিয়মই পালন করিয়া চলেন;—অথচ সেই সংকীর্ণতাও তাঁহার নাই। নিম্নজাতিদের তিনি তান্ত্রিক দীক্ষায় অনধিকারী বিবেচনা করেন না, বিলাত প্রত্যাগতদের গৃহেও আপনার সাত্ত্বিক আহারে তিনি আপত্তি দেখেন না। জ্ঞানশঙ্কর ভাবিয়া পান না—কোথা হইতে আসে এই সুস্থ উদারতা? ইহা তো ইংরেজি পড়া পাত্রী-উদারতা নয়; তদপেক্ষা অনেক বেশি গভীর ও আত্মস্থ। বিদ্যালঙ্কার এ কালের সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সাধকও নহেন—পূর্বাপর গৃহস্থ, সংসারের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার প্রয়োজনও বোধ করেন নাই; তন্ত্রমতে উহার প্রয়োজন নাইও।

জ্ঞানশঙ্কর, ইস্কুল কলেজের শিক্ষার মধ্য দিয়া তন্ত্র ও রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রতি একটা অবিশ্বাস ও অবজ্ঞাই পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সত্যই সেই যুগ ছিল ব্রাহ্ম যুগ। জ্ঞানশঙ্কর অবশ্য তখনকার

দিনের নূতন হিন্দুত্বের ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই নূতন হিন্দুত্ব আসলে আচারে-বিচারে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মত্ব। তাই তাঁহারা বেদান্ত ও গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং খ্রীষ্টের বৈরাগ্যধর্মী ভক্তিবাদে শ্রদ্ধাশীল হন।

'স্বদেশী যুগের' উত্তেজনা শেষে বিভূতিশঙ্কর থিয়োসফি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যে গিয়া ঠেকিলেন,—সনাতন চৌধুরীর প্রবল ভক্তিধারা তাঁহার জীবনে যেন উৎসমুখ পাইল। জ্ঞানশঙ্করের মনও স্বভাবতই অগ্রজের চিন্তা-ভাবনার প্রতি আস্থাশীল ছিল। যুগ-পরিণতি যতই তাঁহাদের বংশের নূতন বংশধরদের ঠেলিয়া লইয়া চলিল বিদ্রোহ ও উপপ্লবের দিকে, ততই জ্ঞানশঙ্করের চিত্ত বয়োধর্মে আরও বেশি করিয়া আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল সনাতন ধর্ম ও জীবন-যাত্রার মধ্যে। অথচ একটা সুস্থ চেতনা তাঁহার আছে; ধর্ম, সমাজ, আচার, অনুষ্ঠান কোন জিনিসেই উৎকটতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অশুচিতা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। এই জন্যই হয়ত তান্ত্রিক সাধনা বা বৈষ্ণব ভাব-বিহ্বলতাকেও তিনি ভয় করিতেন; সাধু-সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা করিলেও গুরুকরণের তিনি অর্থ খুঁজিয়া পাইতেন না। কিন্তু এখন মনে হইতেছে, তন্ত্র তো আসলে ভয়াবহ ব্যাপার নয়। বরং সাধারণ মানুষের জন্যই এই পথ। গীতার নিষ্কাম কর্ম সাধারণ মানুষ কি করিয়া আচরণ করিবে? বরং তন্ত্রের সকাম ভক্তিই তাহারা বোঝে, চাহে,—আর, সত্য-সত্যই দুই-এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্যও কি করা যায় না? তাহাই কি করেন নাই এই বৃদ্ধ সাধক? সন্তান-সন্ততি, পুত্র পৌত্র, ব্রহ্মোত্র গুরুদক্ষিণা,—তিনি তো সংসারের রীতিনীতি কিছুই বর্জন করেন নাই; অথচ ইহার মধ্যেও তিনি সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত। মানুষ তিনি, মানুষকে পথ দেখাইয়া

দিতেছেন আপনার জীবন-যাত্রার দ্বারা—ইহাই তো আসলে তাঁহার প্রকৃত দীক্ষাদান, তাঁহার বীজমন্ত্র।

তাই ব'লে দীক্ষা না নিলে চলে নাকি?—বলিল হৈমবতী।

সত্যই বলিয়াছে হৈম। জ্ঞান এখন বুঝিতে পারেন—গুরুকরণেরও প্রয়োজন আছে। ইহাই তাঁহাদের সামাজিক নিয়ম, পারিবারিকপ্রথা, আর, এখন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রয়োজনও। কি জানেন তিনি ধর্মতত্ত্বের; কিংবা তাহার সাধনপদ্ধতির? হৈম ঠিকই বলিয়াছে—'মহাপ্রভুকেও দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল।'

জ্ঞানশঙ্কর ও মনোজকে বলেন: যীশু ও যোহানের নিকট দীক্ষা নিয়েছিল: "Suffer it to be so now; for thus it becometh us to fulfil all righteousness." তোমরা গুরুবংশের ছেলে মনোজ, একথাটা তুমি কেন বুঝছ না?

মনোজ তথাপি তর্ক করে, —এ শুধু একটা অনুষ্ঠান।

জ্ঞান বুঝান, অনুষ্ঠান বটে, কিন্তু শুধু অনুষ্ঠান নয়। একটা অভিজ্ঞতা—মিষ্টিক্যাল একস্‌পীরিয়ান্‌স্‌—ক্যাথোলিক চার্চের ক্রিয়াকলাপের মত। এরও প্রয়োজন আছে। গ্র্যাণ্ড ম্যাস্‌ ও ইউক্যারিষ্টের মতই, আরত্রিক পূজা অর্চনার মতই— প্রয়োজন আছে দীক্ষারও।

মনোজ আর তর্ক করিল না; কিন্তু কথাটা সে মানিলও না, তাহা জ্ঞান চৌধুরী বুঝিলেন। মনোজ তত্ত্ব খোঁজে।

কিন্তু তত্ত্ব শুধু জানিলেই হয় না। অন্তরে তাহা সত্য-রূপে লাভ করিতে হয়। আর সত্য মানুষের অন্তর হইতেই মানুষের অন্তর গ্রহণ করিতে পারে, না হইলে তাহা জানা হয় না। না হইলে মানাও হয় না সমাজকে, পরিবারকে, সনাতন নীতি-নিয়মকে, ধর্মাধর্মকে।

জ্ঞান চৌধুরীর বয়স হইয়াছে—হাঁ, মিথ্যা নয় তিনি বুড়া হইতেছেন।

এই তো প্রথম ষ্ট্রোক্ তাঁহাকে জানাইয়া দিল—বয়সকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আর তিনি দেরী করিতেছেন কেন? তাঁহার মনে কোনো খানে দ্বিধা জাগিয়া বসিয়া আছে নাকি—সত্যাসত্য সম্বন্ধে, ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে?—ইহারও পরে আর দ্বিধা করিবার সময় আছে? Lead, kindly Light, lead me on.

জ্ঞান চৌধুরী দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। চৌধুরীবংশের সন্তানেরা চিরদিন যেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মন্ত্রে সেইরূপ কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন সস্ত্রীক জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী।

বিজয় বলিল: আপনিও শেষে গুরুটুরু করতে গেলেন?

জ্ঞান বলিলেন: বুড়ো হলাম যে।

বিজয়ের মনে পড়িল, বলিল: অমি'র কথাটা এখনো ভুলতে পারলেন না।

জ্ঞান চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন: পাগল হ'লে নাকি?—অমি'র কথা মনে করে বসে থাক্‌ব? বরং নিজের কথাই মনে করে দীক্ষা নিলাম। দীক্ষা নিতেই হয় আমাদের, জানোই তো, বিজয়। আর, প্রয়োজনও আছে তার।

জ্ঞানশঙ্কর বুঝাইয়া বলিতে চাহিলেন; দীক্ষা একটা অভিজ্ঞতা।

মনোজ শুনিয়াছিল, কিন্তু মানে নাই। বিজয় শুনিল না, কিন্তু বুঝিল।—বুঝিল জ্ঞান চৌধুরী দীক্ষাই শুধু গ্রহণ করেন নাই, জানাইয়া দিতে চাহিয়াছেন আপন কালের, আপন জীবন-ধর্মের প্রতি অপরিবর্তনীয় আস্থা,—অনাস্থা নৃপেনের কালের প্রতি;—অবিশ্বাস তাই বিজয়দের কালের প্রতি, অবিশ্বাস সকল পরিবর্তনের উপর। জ্ঞান চৌধুরী বিশ্বাস করেন সনাতন সমাজ-নিয়মে।

সেই রাত্রিতে জ্ঞান চৌধুরী পত্র লিখিতেছিলেন, ঘরের কোণে

পিতলের পিলসুজে পিদিম জ্বলিতেছে ;—কতদূর যায় সেই রশ্মিরেখা, এক-একবার কি তাহা দেখিতেছিলেন ?

"অশোক, বিজয় বলিল তুমি সম্ভবত ব্যস্ত, একটা ধর্মঘটে জড়াইয়া পড়িতেছ। না হইলে বারাহীপুরের প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ নূতন প্রকাশ পাইতেছে, নিশ্চয়ই তাহাতে আসিতে। যাহাই হউক, সামান্য দুই একটি কথা তোমাকে লিখিতেছি।

আজ আমরা কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। যথা সময়ে মন্ত্র গ্রহণ আমাদের নিয়ম, যথানিয়মে তাহা পালন করা কর্তব্য। তুমি অবশ্য তাহা স্বীকার করিবে না। কিন্তু তোমাদের সম্মুখে, পৃথিবীর সম্মুখে, এই সত্যও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে—আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের মেয়েরা যেমন নদীর অকূল স্রোতের উপর সন্ধ্যার দীপটি ভাসাইয়া দেয় তেমনি করিয়া এই যুগ সন্ধ্যায় আমরাও ভাসিয়া চলিয়াছি। উপরে আকাশ আছে নক্ষত্র আছে, সূর্য্য আছে চন্দ্র আছে, শত ভাঙনের মধ্য দিয়াও নিয়কার পৃথিবী ফলবতী, শস্যবতী, মধুমতী। আর এই দুই সত্যের মধ্যখানে রাশি রাশি অন্ধকার ভোগবতীর স্রোতের মত উথলাইয়া উঠিতেছে। তাহারই মধ্যে আমরা দীপ জ্বালিয়া দিই সম্মুখের দিকে মুখ করিয়া,—চরাচরের যাত্রীকে অভয় দিয়া, অন্ধকারের সমস্ত প্লাবনকে এই আলোক রেখায় বিদীর্ণ করিয়া। সমস্ত অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের মেয়েরা এই দীপ ভাসাইতে ভাসাইতে জানায়, তাহারা বিশ্বাস করে—তাহারা আলোকে বিশ্বাস করে। যুগসন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকারকে জানিয়াও আমরা বলি—আমরা বিশ্বাস করি—ধর্মে বিশ্বাস করি, কর্মে বিশ্বাস করি ; বিশ্বাস করি আপন আত্মায়, বিশ্বাস করি বিশ্বসত্তায়, বিশ্বাস করি ইহকালে, বিশ্বাস করি পরকালে।

তাই, তোমার মাতা ও আমি দীক্ষা গ্রহণ করিলাম।

তুমি গতির যুগের মানুষ—হয়ত আমাদের কোন কথাই মানিবে না। কিন্তু আমরা স্বস্তিতে, ভদ্র জীবন-যাত্রায় বিশ্বাসী। সংসারে তোমরা সুস্থ, ভদ্রভাবে বাঁচিয়া থাক, তাহাও চাই। কিন্তু তোমরা যে কে কি করিবে তাহা জানি না। অবশ্য, তোমরা নিজেরাও জানো না। তোমাদের গতিই আছে; গন্তব্য যে নাই, হয়ত তাহাও জানো না। তুমি সাহিত্য রচনা করিবে বলিয়া এক সময়ে মনোজ অমর মনে করিত। উহাই অবশ্য তোমার স্বধর্ম। সে জীবন দারিদ্র্যের জীবন, কিন্তু তাহাতে মর্য্যাদা আছে। অবশ্য কঠিন আত্মসংস্কার বলেই সাহিত্য-ধর্ম আয়ত্ত হয়। তোমার পক্ষে সেই সাধনা অসম্ভব হইত না; কিন্তু তুমি রাজনৈতিক কর্মী, আবার সাংবাদিকও। আমি জানি—A subject people has no politics; আর পরাধীন জাতির জর্নালিজম্‌ও থাকে না। তথাপি তোমার সেই প্রয়াস সার্থক করিবার জন্য যতটুকু সাহায্য সম্ভব তাহাও আমরা করিতে চাহি। ছাত্র বা ছাত্রী পড়াইয়া কিই বা তোমার আয় বৃদ্ধি হয়? নানা কার্যে সময় নষ্ট করিলে তোমার সংবাদপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা বোধ হয় নিজেই বুঝিতেছ। আর ইহাও বোধহয় বুঝিতেছ তোমার কমিউনিজম্‌ অপেক্ষাও এদেশের লোকে পাগল হইতেছে কমিউনালিজমে।

অরুণের কথা লেখা বিপদ। সে বি, এ, ক্লাশে ভরতি হইয়া কলেজ ও বিষয় পরিবর্তনেই ব্যস্ত। শুনিয়াছি খেলার জন্যই তাহার এই আদর। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলের শিক্ষা-দীক্ষা না হইলে লজ্জার শেষ নাই। তাহার উপরে দুর্দিন আসিতেছে। শিক্ষা-দীক্ষা থাকিলেও ভদ্রলোকের পক্ষে আজ জীবিকার্জন দুর্ঘট। অতএব তাহাকে একটা কার্য্যকরী শিক্ষায় সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে তুমিই তাহাকে সাহায্য করিতে পার।

নৃপেন—"

লিখিতে গিয়া এবার জ্ঞানশঙ্কর থামিলেন। না; নামটি কাটিয়া আবার জ্ঞান চৌধুরী লিখেতে আরম্ভ করিলেন।

"অমি' ইন্দিরার সঙ্গে কি দেখাশুনার সময় পাও? তাহারা সংসারকে সুখী করুক। বহু জটিলতাময় সংসার তাহাদের সম্মুখে—সেখানে তাহারাই তবু আজ দীপশিখা দেখাইবে। তাহাদের শিক্ষা সার্থক হউক!

অমরের থীসিস্ সম্পূর্ণ হইয়াছে। একখণ্ড পাইয়াছি—পার্সোনালিটি ইন্ সোশ্যাল ট্রানজিশান্; তাহা দেখিতেছি। আশা করি, সেও জীবনে এবং চিন্তায় সুনিশ্চিত ও স্বচ্ছন্দ হইবে। ভগবান তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। ইতি

শুভাশীর্বাদক

শ্রীজ্ঞানশঙ্কর"

একবার কলম তুলিলেন জ্ঞানশঙ্কর। তারপর আবার আর একখানা পত্র লিখিয়া চলিলেন। মাঝখানে একবার থামিলেন এক মুহূর্ত, বাধা যেন ঠেলিয়া কাটাইতেছেন। তারপর দৃঢ়হস্তে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন:

কল্যাণীয়েষু—

অমর, অনেকদিন অনেক বিবেচনা করিয়া তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি।

আজ আমরা কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। হয়ত শুনিয়া তুমি হাসিবে না, কারণ তুমি অশোক নও। কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণ বুঝিবেও না; মনোজ, বিজয়ও বুঝিতে চাহে নাই, তাহারা আশ্চর্য্য হইয়াছে—আমিও শুরু করি!

তোমার থীসিসের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া ফেলিয়াছি। আমার বিশ্বাস, তাহা গৃহীত হইবে। তোমার বুদ্ধি ও যুক্তিকে অস্বীকার করিবে কে?

কিন্তু আমরা তো শুধু বুদ্ধি দিয়া সত্তার স্বরূপকে বুঝি না; তাহা বুঝি বুদ্ধির অতীত বিশ্বাস দিয়া, অন্তশ্চেতনা দিয়া। সেখান হইতে দেখিলে হয়ত এই পরিবর্তমান কালের মধ্যে মানুষের সত্তাকে এমন ঘূর্ণ্যাবর্তে নিমজ্জমান বলিয়া মনে হইবে না,—স্রোতের দীপের মত সে ভাসিয়া গিয়াও আলোক রেখায় আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়া যায়।

এবার বোধ হয় তুমি ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করিতেছ। আমি সাতান্ন উত্তীর্ণ হইতেছি। দিন কয় পরেই তোমার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন। কোনো দিন আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই, কোনো দিন আমি তাহা লইয়া তোমাকে পীড়াপীড়িও করি নাই। তবু এইবার এত বৎসর পরে বড় বেশি করিয়া দিনটিকে স্মরণ করিতেছি। আর অনেক ভাবিয়া তোমাকে আমি জানাইতেছি—তোমাকে আমরা এইবার সংসারী দেখিতে চাই।

না, ভুল করিও না।—তোমাদের জীবন, তোমাদের সংসার তোমরাই স্বহস্তে সৃষ্টি করিবে—তুমি ও শান্তা—"

সহজ দৃঢ় অঙ্গুলিতে নামটি লিখিলেন জ্ঞানশঙ্কর—'শান্তা' ;—যেন বাধা অপসারিত করিয়া দিতেছেন।

—"আমি তাহা জানি। বিধাতার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

তোমাদের সংসারে আজ এই শতাব্দীতে আমরা সম্ভবত নিষ্প্রয়োজন, তোমরাই যথেষ্ট। আমাদের সংসারেও আজ আর তোমরা স্বচ্ছন্দ নও। বহু বহু শতাব্দীর চাপে, পেষণে, বাধায় তোমরা সেইখানে আপনাদের প্রপীড়িত বোধ কর। কিন্তু জানো কি, যে বিধাতা তোমাদের মধ্য দিয়া পূর্ণকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতে চাহেন, তিনিই আমাদের মধ্য দিয়া অতীতকে ভাবীকালে, মৃতকে অমৃতে উত্তীর্ণ করিয়া রাখিয়া যান? তাঁহার সেই ইচ্ছাকে আমরা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি—

আমরা শুধু বর্তমানে বাঁচি না, ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করি। আমরা বিশ্বাস করি আপন সত্তাকে, বিশ্বাস করি বিশ্বসত্তাকে; বিশ্বাস করি কালকে, বিশ্বাস করি মহাকালকে।

তোমরা সংশয়ী যুগের মনুষ। এ শতাব্দীর প্রলয়োদ্ভাসিত বামমুখ দেখিবার স্পর্ধা লইয়া আসিয়াছে—অথচ তাহা দেখিয়াও তাহাতে আস্থা পাও না। আমরা স্বস্তির যুগের মানুষ। পূর্ব পূর্ব শতাব্দীর মত আজও প্রার্থনা করি—রুদ্র, তোমার দক্ষিণ মুখ আমাদের দিকে ফিরাও। আমাদের রক্ষা করো, রক্ষা করো।

তোমরা নিশ্চিত হও, সত্য হও। আমাদের ধর্মের যেন আমরা শরণ লই। ইতি

শুভাশীর্বাদক

শ্রীজ্ঞানশঙ্কর—"

আবার এক মুহূর্ত থামিলেন। দৃঢ়হস্তে তারপর জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী স্বাক্ষর শেষ করিলেন।—এই প্রথম লিখিলেন

"শ্রীজ্ঞানশঙ্কর শর্মা"

শেষ